কৃষি

'কৃষির্ধন্যা, কৃষির্মে

অতি প্রাচীন কাল
সিতেছে। ভারতের
তর মৃত্তিকায় ধর্ম, ভাব
গর্ভ।

[illegible]

র শাস্ত্রাদিতে [illegible]

াক্তি, সেই সৌভাগ্য, সেই ধর্ম্ম, সেই
হিত তুলনা করিলে এ ভারত সুখবিহীন,
ধীনতা বিষে জর্জ্জরিত, সামান্য উদ-
া এ ভারতকে আর্য্যজাতির ভারত
ক আর্য্য বংশীয় বলিতে ঘৃণা জন্মে,
হয়, ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য মনে
আইসে, ভারতের ধর্ম্মের বিষয়
র অন্নের কথা ভাবিলে শরীর
ীমা নাই, ভারত অন্তঃসার
ভারতের অন্নকষ্ট, ভার-
। ভারত কাননকে দগ্ধ
য ভারতে অন্নকষ্ট হইত
হাকার ধ্বনি

য়েছে, এখনও তোমাদের ধমনিতে আর্য্য শোণিত প্রধাবিত হইতেছে, এখনও আর্য্য শুক্রে তোমাদের অস্থি গঠিত হইতেছে, এখনও আর্য্য বংশীয় বলিয়া তোমাদের নাম সংসারে ঘোষিত হইতেছে, এখনও স্বর্ণ ভূমি ভারত ভূমি তোমাদের বাস স্থান বলিয়া অভিহিত হইতেছে, তবে কেন মুষ্টি ভিক্ষার জন্য, এত যন্ত্রণা এত পদাঘাত সহ্য করিতেছ। ঐ দেখ তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদের বক্ষঃস্থল কর্ষণ করত নীলকর চাকরেরা রত্নরাজী লইয়া ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, তোমাদের ভারতের শস্যাদি লইয়া কত নগর মহানগর রূপে পরিণত হইতেছে, তোমাদের হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া কত পিশাচ, কত দানব মহাদম্ভ প্রকাশ করিতেছে, আর তোমরা শকট-বাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া তাহাদের পদে জীবন বিক্রয় করিতেছ। অতএব তোমরা আবার আর্য্যগণের ন্যায় "কৃষির্ধন্যা, কৃষির্মেধ্যা, জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বাধীন কৃষিতে প্রবৃত্ত হও।

বীজ।

অধিকাংশ উদ্ভিদই প্রায় বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিদ্ শাখা, পত্র, কিম্বা মূল (শিকড়) হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহাদের সেই সেই অংশে বীজের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ আছে, তজ্জন্যই ঐ সকল অংশ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা যায়। বীজ যত পরিপক্ব, ত তেজস্কর হয়, তজ্জাত বৃক্ষাদিও সেইরূপ সতেজ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের ন্যায় উদ্ভিদ্দিগেরও প্রজনন ক্রিয়া একরূপ। হীন-বীর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান যেমন দুর্ব্বল হীন পরমায়ু হয়, সেইরূপ অপুষ্ট কিম্বা হীনতেজ বিশিষ্ট কোন উদ্ভিদ্ বীজ রোপণ করিলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষাদিও প্রায় সেইরূপ হইতে দেখা যায়। এজন্য উদ্ভিদ্ জগতের উন্নতি করিতে হইলে, বীজের প্রতি বিশেষ রূপ মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। সতেজ উদ্ভিদের পরিণত ফলই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য! অনে-

কেহ বীজের দোষে বিফল যত্ন হইয়া থাকেন। অতএব কৃষক ও মালদিগের বীজ নির্ব্বাচন, ও রক্ষা করিবার নিয়ম জ্ঞাত হওয়া প্রধান কার্য্য। বৃক্ষের সকল বীজেই যে সমান অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে, এরূপ নহে। মৃত্তিকা, জল বায়ু ও উত্তাপ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া থাকে। আবার দীর্ঘকাল পরেও অনেক পুরাতন বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে যে সকল উদ্ভিদেব বীজ অঙ্কুরিত হয় শীতকালে সেই সকল বীজ বপণ কবিলে কোন ফল দর্শে না। *প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল উদ্ভিদের বীজ পাতলা ছালে আবৃত, সেই সকল বীজ শীত ঋতুতে বপণ করিলে শীঘ্র চারা জন্মিয়া থাকে। কারণ শীতকালে যে শিশির পাত হয় তদ্বারা উক্ত বীজেব আচ্ছাদন ভিজিয়া কোমল হইলে, অঙ্কুর সকল অনায়াসে তাহা উদ্ভিন্ন কবিয়া নির্গত হইতে পারে। বর্ষাকালে ঐ সকল বীজ বপণ করিলে অতিরিক্ত জল সংযোগে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য সর্ষপ তিসি, প্রভৃতি রবি শস্য শীতকালে চাস করিয়া থাকে। স্থলজ উদ্ভিদের বীজ জলে কিম্বা কোন জলজ উদ্ভিদের বীজ স্থলে রোপিত হইলে কোন ফল দর্শে না। স্থলজদিগের মধ্যে যে সকল উদ্ভিদের ফলে অধিক জল বা রস থাকে, তাহাদিগের বীজ রোপণ পক্ষে হালকা বালুকা যুক্ত মৃত্তিকাই উত্তম। এজন্য প্রস্তরময় কঙ্কর বিশিষ্ট ভূমি কিম্বা এটেল মৃত্তিকায় তরমুজ ফুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ রোপণ কবিলে কোন উপকার হয় না। ওষধি অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়, তাহাদিগের বীজ হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহাদিগের শিকড় অধিক দূর সঞ্চারিত হয় না, সুতরাং রসগ্রহণ অভাবে মবিবাব সম্ভব, এজন্য সরস মৃত্তিকায় ঐ সকল উদ্ভিদের বীজ বপণ করা আবশ্যক। বর্ষার বিগমে যখন মৃত্তিকা রসাল থাকে, সেই সময় রবি শস্য বপণ করা উচিত। নতুবা সময় অতীত করিয়া বপণ করিলে, ক্ষেতে জল সিঞ্চন প্রভৃতি নানা কারণে ব্যয় অধিক পড়িয়া যায় এবং সময় অতীত নিবন্ধন ভালরূপ শস্য জন্মে না। বহুপ

বিশিষ্ট আম্র, লিচু জাম প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ শুষ্ক কঠিন মৃত্তিকায় রোপণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। যে সকল উদ্ভিদের বীজাবরণ ভেদ করিয়া অঙ্কুর নির্গত হইতে বিলম্ব হয়; সেই সকল বীজ ভিজাইয়া বপণ করা ভাল, অর্থাৎ পালঙ, লাউ, সসা প্রভৃতির বীজ ভিজাইয়া রোপণ করিলে শীঘ্র চারা বাহির হইয়া থাকে। তরমুজ ফুটি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ঈষদুষ্ণ জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে বীজের গাত্রত্বচ অবিলম্বে বিদীর্ণ হয়, এবং বীজ কোষে বায়ু প্রবেশ করিয়া অঙ্কুরোদ্গমের সহায়তা করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋতু-ভেদে উদ্ভিদদিগের বীজ রোপণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বীজের স্বভাবের সহিত জল বায়ু উত্তাপের কতদূর সম্বন্ধ অর্থাৎ কোন্ বীজ অধিক পরিমাণে জল না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না, এবং উদ্ভিদ মূলে জল সঞ্চিত না থাকিলে তাহা পরিবর্দ্ধিত এবং ফল পুষ্প প্রসবে অসমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এদেশে যে সকল উদ্ভিদের বীজ অধিক পরিমাণে জল বায়ু এবং উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে সেই সকল বীজ বপণ করিলে ভাল হয়। শীত প্রধান দেশীয় উদ্ভিদের বীজ বপণ করিতে হইলে শীতের প্রারম্ভে তাহা বপণ করা উচিত। কারণ অল্প শীতের সময় তাহা বপণ করিলে উত্তরোত্তর শীতবৃদ্ধি, শিশির পাত, শীতল বায়ু সঞ্চারণ এবং উত্তাপ হ্রাসতা সহকারে উদ্ভিদগণও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে পারে। এজন্য কফি, সাল—গাম, ফরাস বিন, বিট প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ বর্ষা শেষে বপণ করিতে হয়। শীত বিগমে ঐ সকল উদ্ভিদের বীজ বপণ করিলে অতিরিক্ত উত্তাপ, উষ্ণ বায়ু এবং বর্ষার জলের আধিক্য বশতঃ প্রায় বীজ নষ্ট হইয়া যায়। যদিও কোন কোন বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হীন তেজ ও হতশ্রী হইয়া ফল শস্য প্রদানে অশক্ত হইতে দেখা যায়।

কোন কোন উদ্ভিদের বীজ অধিক মৃত্তিকার নিম্নে ও কোন কোন বীজ অপেক্ষাকৃত অল্প নিম্নে এবং কোন কোন বীজ মৃত্তিকার উপরিভাগে বপণ করিতে হয়। যে সকল উদ্ভিদের বীজ অতি ক্ষুদ্র, এবং শিকড়

সকল সামান্য মৃত্তিকার মধ্যে বিস্তারিত থাকে, সেই সকল উদ্ভিদের বীজ অধিক মৃত্তিকার নীচে পড়িলে বীজের উপরিস্থ মৃত্তিকা উদ্ভিন্ন করিয়া অঙ্কুর নির্গত হইতে পারে না। সুতরাং সমুদায় বীজ বৃথা হইয়া যায়। এজন্য জেড়ুয়া ফুল, শাক প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ অধিক মৃত্তিকার নীচে বপণকরা উচিত নহে।

বীজ রাখার দোষেও অনেক স্থলে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এবিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ বীজ মধ্যে যখন উদ্ভিদের জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন বীজ যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কীটাদি বীজের পরম শত্রু। এজন্য বীজ মধ্যে যাহাতে কীটাদি প্রবেশ করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। অপক্কাবস্থায় বৃক্ষাদি হইতে বীজ তুলিলে সেই বীজে ভাল গাছ হয় না। বীজ রৌদ্রে উত্তম শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা বীজাভ্যন্তরস্থ রসে তাহা পচিয়া যাইতে পারে। শাক শবজী ফুলাদির বীজ শুষ্ক করিয়া কাচের ছিপিযুক্ত বোতল মধ্যে রাখিলে সুন্দররূপ থাকিতে পারে। বীজ সংগ্রহ করিবার সময় এক এক জাতীয় বীজ পৃথক পৃথক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নানা জাতীয় বীজ একত্রে মিশ্রিত হইলে ক্ষেত্র হইতে অনাবশ্যক গাছগুলি নষ্ট করিতে বহুব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হয়। সকল বীজ এক নিয়মে রাখা উচিত নহে। বীজের প্রকৃতি অনুসারে উহা ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে রাখা আবশ্যক। আর্দ্র স্থানে বীজ রাখিলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে সকল বীজের আকারগত কোন সৌসাদৃশ্য স্থির করিতে সন্দেহ জন্মে বোতলে সেই সকল বীজের নাম লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। বিদেশীয় বীজের প্রকৃতি না জানিলে সফল-যত্ন হওয়া যায় না। এজন্য তাহার রোপণ প্রণালী অবগত হইয়া চাসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল বীজ এক নিয়মে বপণ করিলে চাসের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। কোন কোন বীজ ঘন ও কোন কোন বীজ পাতলা করিয়া বপণ করিতে হয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কৃষি কার্য্যে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। বাঁধা কফি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের বীজ এদেশে উৎপন্ন হয় না। জল বায়ুর দোষে

যে ঐ সকল বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না তাহা সম্পূর্ণ স্থির হইয়াছে। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে উৎকৃষ্ট বীজ মৃত্তিকার দোষে অঙ্কুরিত হয় না। অতএব বীজের স্বভাব ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানিয়া কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বীজ পরীক্ষা কৃষি কার্য্যের প্রধান অঙ্গ; কেন না বীজের মধ্যেই কৃষকের আশা ভরসা পরিশ্রমের পুরস্কার প্রভৃতি সমুদায় নিহিত থাকে। প্রাচীন ভারতে বীজ রক্ষা ও বপন বা রোপণ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অম্বুবাচীর সময় হিন্দুজাতির মধ্যে ভূমি খনন ও বীজ বপণ অত্যন্ত নিষিদ্ধ; এই নিষেধের কারণ সহজেই অনুভূত হইতে পারে ঐ সময়ে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত দ্বারা ভূমি সিক্ত এবং প্লাবিত থাকে। সুতরাং সেই সময় বীজ বপন করিলে অতিরিক্ত জলে উহা পচিয়া যাইতে পারে। মহামুনি পরাশর কৃত কৃষি বিষয়ক গ্রন্থে বীজ রক্ষা বিষয়ে কতিপয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যে অর্থাৎ বীজ রক্ষাদি বিষয়ে যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে অতি পবিত্রভাবে ও উৎকৃষ্ট স্থানে বীজ রক্ষিত হইত, রজস্বলা কিম্বা নবপ্রসূতি প্রভৃতি অশুচি ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বীজ স্পর্শ করা নিষেধ। রন্ধন শালায় বীজ রাখিলে অগ্নির উত্তাপাদি নানা কারণে তাহা বিকৃত হইতে পারে তজ্জন্য রন্ধন গৃহে সূতিকাগারে বীজ রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এখন পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় তুত আবাদকারী কৃষকগণ অতি শুদ্ধ ভাবে তুতের চাস করিয়া থাকে। শুদ্ধ ভাবে রাখিতে হইলেই সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। মলিন কদর্য্যভাবে থাকিলে মনুষ্যাদি প্রাণি-দিগের স্বাস্থ্যের যেমন হানি হইয়া থাকে, বীজাদির পক্ষেও সেইরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এজন্য পরিষ্কৃত স্থানে বীজ রাখাই ব্যবস্থা।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পুরাতন অবস্থায়ও অনেক বীজের অঙ্কুরোৎ-পাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায় না। পলাণ্ডু প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভি-দের বীজ বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া থাকে। সচরাচর মূল, সিম প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ বীজ দুই তিন বৎসর এবং শসা ও কুটির বীজ দশ বার বৎসরের পুরাতন হইলেও

তাহাদিগের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। পুরাতন বীজ রোপণ করিতে হইলে চুণের জলে উত্তম করিয়া ভিজাইয়া তাহাতে ঘুঁটের ছাই মাখাইয়া রোপণ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে। ভূমি সুন্দর রূপ কর্ষণ সার দেওয়া প্রভৃতি পাইটের অভাবেও অনেক স্থলে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। অতএব বীজ বপণ করিবার পুর্ব্বে উত্তমরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইলেই যে চাসের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল এরূপ নহে। নব প্রসূত শিশু যেমন বহুযত্নে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অঙ্কুরোৎপত্তির সময় হইতে উদ্ভিদ্‌দিগের প্রতি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না।

কোন কোন বীজ ভূমিতে বপণ না করিয়া গামলা বা টবে বপণ করা ভাল। গামলায় চারা প্রস্তুত হইলে উহা তুলিয়া উদ্যানে রোপণ করিলে চলিতে পারে। এরূপ করিবার কারণ এই যে অনেক বীজ অধিক রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং সেই সকল বীজ ভূমিতে বপণ করিলে অতিরিক্ত উত্তাপ নিবন্ধন চারা মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদিও কোন আচ্ছাদন দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করা যায়। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি উত্তপ্ত হইলে নিকটস্থ ছায়াযুক্ত স্থানের সরস মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া প্রভূত অনিষ্ট করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বীজ বপণের পরে যদি সহসা বৃষ্টি হয়, তবে জলে বীজ ভাসাইয়া অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারে, কিম্বা অনাবশ্যক জল লাগিয়া অঙ্কুরোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতেও পারে, অথবা বৃষ্টির পর রৌদ্র দ্বারা মৃত্তিকা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া অঙ্কুর নির্গমের অন্তরায় হইতে পারে। কিন্তু গামলায় বীজ বপণ করিলে ঐ সকল অত্যাচারে বীজের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় ইচ্ছামত গামলা স্থানান্তরে সরাইয়া রাখিলে কোন অপকারের সম্ভাবনা থাকে না।

খরমুজ।

কুটীর ন্যায় খরমুজও অতি সুখাদ্য ফল। উহার সুঘ্রাণ ও সুমিষ্টতা জন্য সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর খরমুজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। খরমুজের চাসে লাভ নিতান্ত কম নহে। আমাদের দেশে ফুটী ও তরমুজের যেরূপ চাস হইয়া থাকে, খরমুজ চাসও প্রায় সেইরূপ। সামান্য যত্ন করিলেই এই উপাদেয় ফল এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আফগান স্থান ও আকায়েবের তরমুজ যেমন বৃহৎ, বুখারা দেশের খরমুজও সেইরূপ বড় হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট আলেক জেণ্ডার বর্ণস সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের খরমুজ দেখিয়া তুরস্ক দেশজাত খরমুজের সুস্বাদুতার বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। যত প্রকার খরমুজ আছে তন্মধ্যে বুখারা দেশীয় খরমুজের ন্যায় বৃহৎ খরমুজ পৃথিবীর আর কোন দেশে উৎপন্ন হয় না। সচরাচর এক একটী খরমুজের পরিধি আড়াই হইতে তিন ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শীতকালে যাহা জন্মিয়া থাকে, তাহা অন্যান্য সময়ের খরমুজ অপেক্ষা অতি বৃহৎ। এমন কি দুইটা খরমুজে এক গর্দ্দভের বোঝাই হইতে পারে। অনেকে অনুমান করেন, ফল বড় হইলে আস্বাদন ভাল হয় না। কিন্তু এই খরমুজ যেমন বৃহৎ সেইরূপ সুস্বাদু। ইহার আস্বাদনের সহিত তুলনা করিলে আর কোন স্থানের খরমুজ উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য এবং ইস্পাহান দেশেও উত্তম উত্তম খরমুজ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল খরমুজ আকারে এবং মিষ্টতায় বুখরার খরমুজের সমতুল্য নহে। এই খরমুজের শস্য আড়াই বুরুল মোটা এবং খোসা পর্য্যন্ত সুগন্ধ হইয়া থাকে। বুখরাবাসী লোকেরা আঘ্রাণ লইয়া ফলের উত্তমতা নির্ণয় করিয়া থাকে।

বুখরার যে কয়েক জাতী খরমুজ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ককিচের ও আখনবাৎ এই দুই জাতিই প্রধান। প্রথমোক্ত বীজের ফল দেখিতে কিঞ্চিৎ সবুজ ও পীত মিশ্রিত। আখনবাতের ফল পীতবর্ণ ও

শুভ্র চিনির ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অপর নানা জাতি খরমুজ হইয়া থাকে। ঐ সকল খরমুজের আকার এতদ্দেশীয় তরমুজের ন্যায়।

পর্ব্বোক্ত খরমুজ সাত মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে থাকিয়া আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পাকিয়া উঠে। ক্ষেত্রে সর্ব্বদা জল সেচন করিতে হয়। নদীর চর ভূমিতে উত্তম খরমুজ জন্মিয়া থাকে। বুখরার খরমুজে এত শর্করা জনক বস্তু থাকে যে তাহা হইতে অনায়াসেই গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কঁকিচের ও আখনবাৎ খরমুজ এত উৎকৃষ্ট যে তাহাদিগের মধুরতা নিবন্ধন সকলেই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। আরস্কিন সাহেবের পুস্তকে লিখিত আছে, বাবরশা বুখরা হইতে বহুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়া পুনরায় দেশে প্রত্যাগত হইলে, ঐ খরমুজ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট খরমুজ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আকারে ও মিষ্টতায় বুখরাজাত খরমুজের সমকক্ষ নহে। বিহার প্রদেশ পাটনা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট খরমুজের চাস হইয়া থাকে। এরূপ প্রবাদ আছে রাজা সেতাব রায় কর্ত্তৃক প্রথমে পাটনায় খরমুজের চাস হইয়াছিল। এক্ষণে বিহারের অনেক স্থানে খরমুজের চাস দেখিতে পাওয়া যায়।

মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ইহার বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর কেবল ইংলণ্ডে ৭৫০০০ মোণ মঞ্জিষ্ঠা বিক্রীত হইয়াছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে উহার ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে গুঁড়া, ছাকা ও শুষ্ক তিন আকারে মঞ্জিষ্ঠা বিক্রয় হইয়া থাকে। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, যখন একমাত্র ইংলণ্ডে এত অধিক পরিমাণে উহার ব্যবহার তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যশাস্ত্রে উহার বিশেষ গুণ বর্ণনা আছে। অনেক ঔষধে মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার চাস অধিক ব্যয়সাধ্য নহে। আমরা আশা করি দেশ মধ্যে মঞ্জিষ্ঠার চাস আরম্ভ হইলে, ধনোপার্জ্জনের একটী নূতন পথ প্রকাশিত হইবে। দেশে নূতন নূতন শস্যাদির চাস অনুষ্ঠিত না হইলে কৃষির উন্নতি হয় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে প্রায় অধিকাংশ দেশের শস্যাদি এখানে উৎপাদন করা যাইতে পারে। জীবনোপায়ের গুপ্ত ভাণ্ডার যে মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত আছে, তাহা সকলেরই জানা উচিত।

অত্যন্ত আর্দ্র ভূমিতে মঞ্জিষ্ঠা ভাল জন্মে না। এজন্য জলা ক্ষেত্রে উহার চাস করা উচিত নহে। মার্চ মাসে ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা ৮।১০ বুরুল খনন করিতে হয়। এবং জুলাই ও আগষ্ট মাসে পুনর্ব্বার কোদলাইয়া ভূমির যাবতীয় ঘাস উলটাইয়া ফেলিতে হয়। ঘাস সকল মাটি চাপা পড়িয়া কিছু দিনের মধ্যে পচিয়া উঠে, এবং তদ্বারা সারের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে ভূমি প্রস্তুত হইলে মার্চ মাসে ধান্যের বীজ বপণের ন্যায় মঞ্জিষ্ঠারও বীজ বপণ করিতে হয়। মে মাসের মধ্যেই প্রায় চারা হইয়া থাকে। এই সময় ক্ষেত্র একবার নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। জুলাই মাসে গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং অক্টোবর মাসে তেজস্কর হইয়া উঠে। এই সময় গাছের চারিদিক খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জুন মাসে গাছে বীজ জন্মে, এই সময় ধান্যের ন্যায় গাছ কাটিতে হয়। তৃতীয় বৎসরে ভূমি হইতে শিকড় তোলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সময়ে শিকড় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু আর কিছুকাল উহা ক্ষেত্রে রাখিলে অপেক্ষাকৃত বড় হইতে পারে।

দশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে গাছ থাকে। কিন্তু বৎসর বৎসর অতি সাবধানতার সহিত মাটি উল্টাইয়া ও নিড়াইয়া দিতে হয়। শিকড় তুলিয়া উহা রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত। শুষ্ক শিকড়ে লাঠির আঘাত করিলে, গাত্রস্থ মাটি ঝরিয়া পড়ে। তখন উহা বস্তাবন্দি করিয়া বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করিতে হয়। ফ্রান্স দেশজাত মঞ্জিষ্ঠার বীজোৎপন্ন গাছে

১৮ মাসের মধ্যে শিকড় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার আকার ক্ষুদ্র হয় বটে গুণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। মকলক সাহেবের বাণিজ্য বিষয়ক অভিধানের ৭৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ক্ষারযুক্ত মৃত্তিকায় মঞ্জিষ্ঠা রোপিত হইলে, তাহার শিকড় রক্তবর্ণ হয়, ফরাসিরা লোহিত বর্ণ শিকড়ের আদর করিয়া থাকে। অন্যান্য মৃত্তিকায় যে মঞ্জিষ্ঠার আবাদ হয়, তাহাতে পীতবর্ণ শিকড় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে পীতবর্ণ শিকড়ের অত্যন্ত গৌরব।

সপেটা।

সপেটা একটী সুখাদ্য ফল। এক একটী ফল অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফলের মধ্যে আতার ন্যায় বীচি থাকে, শাঁস বালির মত, আস্বাদন মিষ্ট-রস বিশিষ্ট। সপেটা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধরিতে আরম্ভ হয়, মাঘের শেষ ফাল্গুন মাসে ফল পাকিয়া থাকে। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী অনেক বাগানে প্রচুর সপেটা দেখিতে পাওয়া যায়।

দো আঁশ মৃত্তিকায় সপেটার গাছ রোপণ করিলে ভাল হয। বেলে মাটিতে গাছ রোপিত হইলে যথেষ্ঠ ফল ধরিয়া থাকে এবং ফলের আস্বা-দও সুমিষ্ঠ কিন্তু গাছ বড় হইয়া ফল ধরিতে বিলম্ব হয়। এটেঁল মাটিতে গাছ পুঁতিলে গাছ বড়, পাতা বড়, ফল বড় হয়, কিন্তু ফলের মিষ্টতা তত ভাল হয় না। এজন্য দো আঁশ মৃত্তিকায় উহা রোপণ করা উচিত। সপেটার গাছ অন্যূন ৩০।৩২ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। ভালরূপ পাইট করিলে দুই তিন বৎসরে গাছে ফল ধরিতে পারে। বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছে শীঘ্র ফল ধরিতে থাকে এবং ফল উত্তম হয়। বীজে গাছ করিতে হইলে বৈশাখ মাসে হাপোরে বীজ ফেলিতে হয়, হাপোরে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া উচিত। চারা বড় হইলে হাপোর হইতে উহা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিতে হয়। মাঠের মধ্যে সপেটার গাছ পুঁতিলে গাছ ভাল হয় না। প্রখর রৌদ্রে তাহার অপকার করিয়া থাকে। অন্যান্য

গাছের বাগানের মধ্যে সপেটার গাছ রোপিত হইলে তাহার শ্রী ভাল থাকে এবং ফল ভাল হয়।•

কলমের গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে আষাঢ় মাসে কলম বাঁধা কর্ত্তব্য। জোড় কলমেই চারা ভাল হইয়া থাকে। অন্যান্য গাছের যে নিয়মে কলম বাঁধিতে হয়, ইহারও কলম সেই প্রণালীতে বাঁধা উচিত। ক্ষীরনীর চারার সহিত সপেটার কলম বাঁধিলে ভাল হয়। তিন চারি মাস পরে কলম কাটিয়া চারা, বাগানে রোপণ করিলে চলিতে পারে। বীজের চারা রোপণ সম্বন্ধে যেরূপ স্থান ও মৃত্তিকা এবং নিয়মাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কলমের চারা রোপণেও সেই সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়।

আম্র।

সিলেট হইতে প্রাপ্ত।

এদেশে অতি অল্প লোকেই প্রণালী অনুসারে আম্র রোপণ করিয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় লোকে বিশেষ যত্ন না করিয়া কোন স্থানে বীজ ফেলিয়া রাখে এবং সেই বীজ হইতে ৮।১০ সৎসরে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল ধরিয়া থাকে। যে জাতীয় বীজের বৃক্ষ রোপিত হয় ফল প্রায় তদনুরূপ হইতে দেখা যায় না।

কলমের বৃক্ষে যেমন তিন চারি বৎসরের মধ্যে ফল ধরিয়া থাকে; যত্ন পূর্ব্বক প্রণালী অনুসারে রোপণ করিলে বীজোৎপন্ন বৃক্ষ হইতেও ঐরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ফল ধরিতে পারে।

জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসে আমের আঁঠি সকল ক্ষেত্রে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া রোপণ করিতে হয়। এই সময় বিশেষ যত্ন না করিলেও চারা সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। ভাদ্র কিম্বা আশ্বিন মাস উপস্থিত হইলে চারা সকল ঐ স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিতে

হয়। দ্বিতীয় বৎসর আষাঢ় মাসে চারা সকল উক্ত স্থান হইতে তুলিয়া অপর স্থানে রোপণ করা উচিত। বারম্বার এইরূপ উত্তোলন ও রোপণ অতি সাবধানতার সহিত করিতে হইবে। চারার চতুর্দ্দিকের ছোট ছোট শিকড সমূহ যেন কাটিয়া কিম্বা ছিঁড়িয়া অথবা শিকড়ের অগ্রভাগ নষ্ট হইয়া না যায়। বাগানের যে স্থানে গাছ স্থায়ীরূপে রোপিত হইবে, তৃতীয় বৎসরে চারা সকল তুলিয়া উক্ত স্থানে রোপণ করা উচিত। এই সময় চারা তুলিয়া তাহার মূল শিকড়ের অগ্রভাগের কোমল অংশ তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া দিতে হইবে। শিকড় কাটিবার সময় যেন গাছে ঝাঁকি না লাগে। সুতীক্ষ্ণ কাঁচি দ্বারা শিকড় কাটিলেই ভাল হয়। অধিকাংশ বৃক্ষে তিন বৎসরেই ফল ধরিয়া থাকে, কিন্তু এই সময় হইতে গাছে ফল ধরিতে দিলে অল্পদিনের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে ফল ছোট হয় এবং বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয় না। এজন্য মুকুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

আম্র গাছের মূল শিকড় যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে, ততদিন গাছে ফল ধরে না। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ পচিয়া গিয়া নিম্নে গমন করা রহিত হইলে বৃক্ষে ফল ধরে। কলমের গাছে যে সত্বর ফল ধরে বোধহয় মূল শিকড় না থাকায় তাহার প্রধান কারণ। আমরা যে প্রণালীক্রমে চারা রোপণ করিবার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে পুনঃপুনঃ চারা নাড়িয়া পোঁতা এবং মূল শিকড় কাটায় তাহার অগ্রভাগ বৃদ্ধি হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্য অল্প দিন মধ্যে গাছে ফল ধরিয়া থাকে।

চারা রোপণ করিলেই যে গাছের কাজ শেষ হইল এরূপ নহে। সর্ব্বদা তাহার পাইট করা আবশ্যক। গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা, গোড়ার মাটি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া, এবং বৎসর মধ্যে অন্যূন দুইবার কতক স্থান ব্যাপিয়া মাটি উল্‌টাইয়া দেওয়া উচিত। মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছের গোড়ায় চারিদিকে মাটি বেড়িয়া দেওয়া এবং মধ্যে মধ্য তাহাতে জল দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

"ধান্য—কুশলং বদ।"

—০:০—

কাল মাহাত্ম্যে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রাচীন আচার ব্যবহারের মধ্যে বিজাতীয় প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির জীবনী শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। ধর্ম্ম বন্ধন, সমাজ বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া এই ভারতের যারপর নাই শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। যে ভারতাকাশ স্বাধীনতা সূর্য্যে সমুজ্বল ছিল, সেই ভারত এখন অধীনতা মেঘে সমাচ্ছন্ন, যে ভারত বক্ষঃ এক সময়ে শৌর্য্যবীর্য্যের জীবন্ত গৌরবস্থল ছিল, সেই ভারত বক্ষঃ এখন দাসত্বের পদাঘাতে বিদলিত, যে ভারত ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, নানা বিদ্যার শিক্ষা গুরু ছিল, সেই ভারত এখন পরমুখাপেক্ষী মূর্খতার জন্ম ভূমি! ভারতের এ দুর্দ্দশার কারণ কি? বহু শতাব্দী হইতে ভারত অধীনতা চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া উহার পূর্ব্ব গৌরব সকল ক্রমে ক্রমে চূর্ণীকৃত হইয়া আসিতেছে! ভারত সন্তানগণ স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ব্যবসা, স্বাধীন কার্য্য হইতে বিরত হইয়া পরপদ সেবা, উঞ্ছবৃত্তিকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞানে তাহাতেই দেহ মন ঢালিয়া দিতেছেন। দিগ্‌বিজয়ী আর্য্য শুক্র শোণিতে যাহাদিগের জন্ম, স্বর্ণ ভূমি ভারত ভূমি যাহাদিগের জন্মক্ষেত্র, বেদ, উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্রাদি যাহাদিগের ক্রীড়াস্থল, রামায়ণ মহাভারত যাহাদিগের বংশাবলীর গুণ বর্ণন, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন যাহাদিগের বীজমন্ত্র, সমস্ত জগৎ যাহাদিগের অন্নে প্রতিপালিত সেই ভারত সন্তান এখন সামান্য উদরান্নের জন্য লালায়িত, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালনে অক্ষম, মান সম্ভ্রম পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পালিত পশুর ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যে ভারত সন্তান পর্ব্বতগুহাবাসী উলঙ্গ প্রাচ্য অসভ্য জাতি দিগকে অন্নের আস্বাদন ও বস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই ভারত সন্তান আজ কি না অন্নের জন্য দাসত্বের পাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া বৈদেশিক বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতেছেন! অভ্যাগত শত্রুব্যক্তি অতিথি হইলেও তাহাকে

দৈবজ্ঞানে সেবা করিবার ব্যবস্থা যে জাতির হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল, প্রত্যেক গৃহই যে জাতির সদাব্রত শালা ছিল সেই জাতি এখন অতিথি সেবা দূরে থাকুক, স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালনও মহাভার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভারতে এখন হা অন্ন যো অন্ন হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ভারত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে! হিন্দু-জাতির গৃহে অতিথিশালার যে দ্বার চির উন্মুক্ত ছিল, তাহা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইতেছে! আত্মীয় স্বজনের অন্ন কষ্টের ভীষণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ভারতবাসীদিগের লৌহময় হৃদয় কবাট ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছে না! ফলতঃ ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আক্ষেপ আর কি আছে!!

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তঃসার শূন্য সভ্যতায় ভারত জর্জ্জরিত সুতরাং এখন কৃষির কথা ভারত সন্তান দিগের কর্ণে বিষবৎ বোধ হইবে। কিন্তু ভারত যখন প্রকৃতিস্থ ছিল, তখন কৃষিকার্য্য এত ঘৃণিত, কৃষির পরিচয় এত তুচ্ছ এবং কৃষক এত হেয় ছিল না। রঘুকুল সূর্য্য অযোধ্যা ভূষণ শ্রীরাম চন্দ্রের সহিত ভরত যখন চিত্রকুট পর্ব্বতে সাক্ষাৎ করেন, তখন রঘুপতি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ধান্য কুশলং বদ", বৎস ধান্যাদি শস্যের কুশল বল। সংসারে বহুবিধ পদার্থ থাকিতে রাম-চন্দ্র কৃষির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন কেন? কৃষি ব্যতীত যে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, কৃষির উপর যে দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, কৃষিই যে জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ, তাহা পূর্ব্বতন ভূপালগণ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। প্রাচীন ভারতে কৃষির যারপরনাই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এবং কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ দ্বারা ভারত ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। ভারত কস্মিনকালেও ধান্যাদি শস্যের জন্য কোন দেশের নিকট এক মুষ্টি ভিক্ষাও গ্রহণ করে নাই। বরং চিরকাল ভারত মুক্ত হস্তে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে কৃষিজাত দ্রব্য বিতরণ করিয়া আসি-তেছে। কৃষির উন্নতি সাধনে আর্য্যগণ যে সম্যক যত্নশীল ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিকার্য্য ভারতবাসীদিগের অতি আদরের ধন ছিল বলিয়াই ভারতে কখন অন্নকষ্ট হইত না। ভারতের অন্নে বহুকাল হইতে ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ বাণিজ্যার্থে ইয়ুরোপে গৃহীত হইত। "ভারতের মৃত্তিকায় স্বর্ণ ও বৃক্ষে বস্ত্র উৎপন্ন হয়" এ সুখ্যাতি ইয়ুরোপে প্রচারিত হওয়ায় ইয়ুরোপবাসীরা ভারত ভাণ্ডারে আসিবার জন্য সহজ পথ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রধান বাণিজ্যস্থান, অত্রস্থ বাণিজ্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রাচীন রোম ও গ্রীকজাতি এখান হইতে নানা বিধ শস্য লইয়া যাইত। ভারতের বাণিজ্যে পৃথিবীর কত লোক ধনকুবের হইয়াছেন তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভারতে কৃষির বিশেষ উন্নতি না থাকিলে কখনই বাণিজ্যোপযোগী ঐ সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইত না। কালের কেমন বিচিত্র গতি যে ভারতের রত্নরাজী লইয়া নির্ধন ধনী হইয়াছে, যে ভারতের কৃষিজাত কার্পাসে অসভ্যজাতি সমূহ বস্ত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে শিখিয়াছে, যে ভারতের অন্নে শরীর পোষণ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, সেই ভারত আজ কি না দাসত্বের পদে বিলুণ্ঠিত, আজ কি না ভারত সন্তান আর্য্যজাতির বিশুদ্ধ শোণিত দাসত্বোপার্জ্জিত অন্নে অপবিত্র করিতেছে, আজ কি না ভারত ললনা অন্নপূর্ণার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অভ্যাগত অতিথিকে অন্নদানে অসমর্থা হইয়া পূত ভারতাশ্রমকে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণ অন্ন দানকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন *। ভারতবাসী অন্নদানে কখনই বিমুখ ছিলেন না। ভারতের গৌরীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেব পত্নী স্বয়ং ভগবতী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতেন। কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে ধান্য দুর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদের প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বার যেমন দীর্ঘজীবন, সহজে নষ্ট হয় না সেইরূপ দুর্ব্বার ন্যায় দীর্ঘজীবী হইয়া জীবন উপায় স্বরূপ যে ধান্য তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর, এই আশীর্ব্বাদ প্রথার মধ্যেও ধান্যের

* অন্নে প্রতিষ্ঠিতালোকা অন্নমায়ুঃপশবঃ।

সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে ধান্যের উপকারিতা ও সদ্‌-ব্যবহার হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কৃষি যে অতি নির্ম্মল, অতি পবিত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ধান্যাদি কৃষিকার্য্যে যেরূপ উদার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্ন মন্নং সর্ব্বার্থসাধকং।
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপ জীবিনঃ॥
অন্নন্তু ধান্য সম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যাবিনা নচ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পবিত্যজ্য কৃষি যত্নেন কারয়েৎ॥
কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদি দোষ যুক্তোপি মুচ্যতেঽতিথি পূজনাৎ॥"

ভারতবাসীদিগের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, শাস্ত্রানুমোদিত এরূপ লাভজনক, কৃষিকার্য্যের যে নির্ম্মল সুখ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হীন দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন ও মান সম্ভ্রম আত্মাদর প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া অধীনতা খতে জীবন বিক্রয় করিবেন, পরপদসেবা তুষানলে আত্মা অহর্নিশি বিদগ্ধ করিবেন তাহাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ তত্রাপি ভারত সন্তান কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন, না। এত অন্ন কষ্ট, এত অপমানের পদাঘাত সহ্য করিয়াও ভারতবাসী-দিগের চৈতন্য হইবে না। ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত সন্তানগণ অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা অপেক্ষা পরি-তাপের ও মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে!!

বৃষ্টি।

"ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥"

শস্যাদি উদ্ভিদের জীবন জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। জল ব্যতীত উহারা জীবিত থাকিতে পারে না। প্রাণি দিগের মধ্যে যেমন কোন কোন জাতি স্থলে থাকে, অন্য কতকগুলি জলে অবস্থিতি করে। সেই রূপ উদ্ভিদ দিগের মধ্যে কতক জলজ, তাহারা জলে উৎপন্ন হয় এবং জলেতেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ সকল উদ্ভিদ্ স্থলে রোপণ করিলে তাহারা কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন স্থলে রাখিলে অনতি বিলম্বে মরিয়া যায়, সেইরূপ পদ্ম, শৈবাল প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদগণকে স্থলে রোপণ করিলে তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে না। জলজ দিগের পক্ষে জল যেমন আবশ্যকীয়, সেইরূপ স্থলজদিগকেও আবার জলে রোপণ করিলে তাহারা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ উদ্ভিদ্ দিগের প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে রোপণ করা উচিত।

কি জলজ কি স্থলজ সকল প্রকার উদ্ভিদ্ যে কিয়ৎ পরিমাণে জল না পাইলে জীবন ধারণ করিতে পারে না তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদগণ জীবিত থাকে, তাহাদিগের জল প্রধান একটী প্রধান উপকরণ। বৃষ্টিপাত, শিশির সঞ্চার, বায়ুর জলীয় ভাগ গ্রহণ, এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক জল সিঞ্চন এই সকল উপায়ে উদ্ভিদ্ সমূহ বাঁচিয়া থাকে। সকল উদ্ভিদে সমানরূপ জলের আবশ্যকতা করে না। এবং উপরিউক্ত চতুর্বিধ উপায়ে জল দান সকল উদ্ভিদের পক্ষে সমান উপকারী নহে। উহাদিগের স্বভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জল দিলে তাহাদিগের স্বাস্থ্য বর্দ্ধক হয় অর্থাৎ কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে বৃষ্টির জল অত্যন্ত উপকারী, কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে শিশির পাত একান্ত প্রয়োজনীয়,

কাহার কাহার পক্ষে জলসিঞ্চন নিতান্ত আবশ্যক, ধান্যাদি শস্যের পক্ষে বৃষ্টির জল যে পরিমাণে আবশ্যকীয় রবি শস্য, কফি, জেড়ুগা ফুল প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্ষে বৃষ্টির তত আবশ্যকতা করে না। প্রাণি-দিগের আহার গ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম, অর্থাৎ অবস্থা ভেদে যেমন তাহাদিগের খাদ্যের পরিমাণ ন্যূনাধিক ব্যবস্থা করিতে হয়, উদ্ভিদিগেরও অবস্থাভেদে আবার জলের পরিমাণ সেইরূপ ন্যূনাতিরেক করা উচিত। কোন কোন উদ্ভিদ চারার অবস্থায় অধিক জল পাইলে পচিয়া যায়, কোন কোন উদ্ভিদ বীজ অধিক জল না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না, আবার কোন কোন উদ্ভিদ অধিক জল পাইলে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, কোন কোন উদ্ভিদ আবার ফল শস্য প্রসবের সময় অধিক জল পাইলে শস্যের অপকার হইয়া থাকে। আম্র প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিদ্ মুকুলিতাবস্থায় বৃষ্টির জল পাইলে মুকুল হইতে ফলজনন পদার্থ ধৌত হইয়া যাওয়াতে ফল জন্মিতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন পৌষ ও মাঘ মাসের প্রথমে যে কুজ্ঝটিকা হয় তদ্দ্বারা আম্র বৃক্ষ সকল মুকুলিত হয়, কিন্তু মুকুল প্রসবের পর আবার কুজ্ঝটিকা দ্বারা মুকুল সমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। শর্ষপ প্রভৃতি রবি শস্যে প্রথমাবস্থায় বৃষ্টি জলে যে রূপ উপকার করে, পুষ্পোদ্গম হইলে বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাদিগের আবার সেই রূপ অপকার সাধন করিয়া থাকে। শর্ষপাদির ফুলের অবস্থায় এবং কফি প্রভৃতি সাক সবজীতে বৃষ্টির জল বর্ষিত হইলে পোকা ধরিয়া বিস্তর অনিষ্ট সাধন করে। আশুধান্য পাকিবার সময় অল্প পরিমাণে সর্ব্বদা বৃষ্টির জল পাইলে বিশেষ উপকার হয়। করুণাময় পরমেশ্বরের বি[illegible] মহিমা, তিনি শস্যাদির প্রকৃতি অনুসারে বৃষ্টিপাত শিশির সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যে কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষ দেব মাতৃক দেশ এজন্য এখানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এবং এদেশে বৃষ্টির আধিক্য নিবন্ধন ধান্যাদি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর শস্যাদি সম্বন্ধে ভারতকে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন। ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে গমনাগমন করাতে ভারতে নানা দেশীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। শীত ঋতু উপস্থিত হইলে, শিশির সঞ্চার দ্বারা শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদ্ অর্থাৎ রবিশস্যাদি উৎপন্ন হইবার অনুকূলতা করিয়া থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে কি গ্রীষ্ম দেশীয় কি শীত দেশীয় সকল দেশের উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে।

মিসর নদী মাতৃক দেশ তথায় নীল নদের জলোচ্ছ্বাসে ভূমি প্লাবিত হইয়া যখন সেই জল শুষ্ক হইতে থাকে, সেই সময়ে জল প্লাবিত স্থান সমূহে পলি সঞ্চিত হয়, সেই পললময় ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে। মিসরের ন্যায় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় পদ্মা প্রভৃতি নদীর চর ভূমিতে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ শস্যই বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে। যে বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টি হয় সেই বৎসর শস্যাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেব মাতৃক দেশ সমূহে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি উভয়ই শস্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট কারক। যখন জলের উপর শস্যের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন যাহাতে শস্যক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল সঞ্চারিত হয় তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। মিসরদেশ বাসিরা নীল নদ হইতে বিস্তর কৃত্রিম খাল কাটাইয়া দেশমধ্যে জলের সুবিধা করিয়া লইয়াছে, এদেশেও ঐ রূপ প্রচুর খাল কাটাইলে চাসের পক্ষে প্রভূত উপকার হইতে পারে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উড়িষ্যা প্রদেশে এইরূপ খাল হওয়াতে, তৎতদ প্রদেশে বাণিজ্যের সুবিধা এবং খালের জল সিঞ্চন দ্বারা শস্য ক্ষেত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় ভারতের শস্যাদি দেশমধ্যে বদ্ধ থাকে না। উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশই বাণিজ্যার্থে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এত অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে বিদেশে রপ্তানি না হইলে দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কিম্বা অতি বৃষ্টি হইলেও ভারতে অন্নকষ্ট হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইলেও দেশে অন্নকষ্ট হইত না তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল দেশ মধ্যে শস্য সঞ্চিত থাকিত। এদেশে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় আট মণ তণ্ডুল বিক্রয় হইয়াছিল। যে দেশে এত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে

সেই দেশে এখন যে বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ, গৃহে গৃহে অন্নের জন্য হাহাকার, যাহাদিগের কোন পুরুষে চাকুরীর দাসত্ব স্বপ্নেও জানিত না তাহারা যে সামান্য উদরান্নের জন্য জীবন বিক্রয় করিতেছে তাহার কারণ দেশমধ্যে কৃষিতে অমনোযোগ, এবং উৎপাদিত শস্যের অধিকাংশই বিদেশে প্রেরিত হওয়ায় শস্যের অভাব। যখন এই বাণিজ্য রোধ করিবার কোন উপায় নাই, তখন সমধিক যত্নের সহিত কৃষির উন্নতি ব্যতীত এই অভাব বিমোচিত হইবার অন্য আশা নাই। কৃষির উন্নতি বলিলে কেবল যে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি, হল চালনা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই হয় এরূপ নহে। কারণ যখন সহস্র উন্নতি করিলেও এক বৃষ্টির অভাবে সমুদায় বৃথা হইয়া যায়, তখন শস্যের জীবন স্বরূপ জলের সুবিধা করিতে না পারিলে এই অভাব বিমোচন হইবার আশা নাই। আমাদের বিবেচনায়, গবর্ণমেণ্ট হইতে দেশমধ্যে বহুল পরিমাণে খাল কাটাইয়া দিলে বিস্তর সুবিধা হইতে পারে। খালের জল দ্বারা বৃষ্টির অভাব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়া থাকে। দেশমধ্যে অধিক পরিমাণে খাল খনিত হইলে অন্তর বাণিজ্যের সুবিধা, সাধারণের গমনাগমনের অনুকূলতা, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের উপকারিতা প্রভৃতি অশেষবিধ উপকার সাধিত হইতে পারে। যদিও এই কার্য্যে ব্যয় অধিক কিন্তু বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষে যত জীবন নষ্ট এবং তদ্ প্রতীকারে যে পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হয়, সেই অর্থে কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া শস্যের উৎপন্ন সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন নষ্ট এবং গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হয় না। উড়িষ্যাঞ্চলে শস্যক্ষেত্রে খালের জল বিক্রয় নৌকার মাস্তুল এবং মৎস্য বিক্রয় দ্বারা আয়ের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। শস্যক্ষেত্রে জলের এইরূপ সুবিধা না করিয়া যতদিন দৈবের উপর নির্ভর অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য নির্ভর থাকিবে, ততদিন কৃষির উন্নতির সম্ভব নাই।

বিজ্ঞান বলে বৃষ্টি পাতের কোন উপায় অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে বারুদের বাষ্প হওয়ায় ঐ যুদ্ধ যে বৎসর হইয়াছিল, সেই বৎসর তৎপ্রদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন অনাবৃষ্টি যে বৎসর হয় সেই বৎসর অধিক পরি-

মাণে বারুদ পোড়াইলে বৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইহা যে কতদূর সত্য তাহা সম্পূর্ণ মীমাংসিত হয় নাই। আমাদের দেশে বৃষ্টি না হইলে শস্যোৎপাদনের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। বৃষ্টির জলে যে সকল পদার্থ থাকে নদী, পুষ্করিণী এবং কূপাদির জলে সে সকল পদার্থ লক্ষিত হয় না। এজন্য ঐ সকল জল অপেক্ষা বৃষ্টির জলে উদ্ভিদ্দিগের সমধিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে। শস্য মূলে জল সিঞ্চন অপেক্ষা বৃষ্টির জল যে অধিক উপকারী তাহা বলা বাহুল্য। বৃষ্টি হইলে বায়ু শীতল হয়, উদ্ভিদ্দিগের সর্ব্বাবয়ব জলে ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী হয় এবং মৃত্তিকার শৈত্য সম্পাদিত হওয়ায় উদ্ভিদগণ স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে বৃদ্ধি হইতে থাকে। বৃষ্টির জল যে কেবল উদ্ভিদ্দিগের বৃদ্ধি সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকে এরূপ নহে, তদ্দ্বারা ফল শস্য উপযুক্ত আকারে পরিণত হয় এবং ফল সমূহে মিষ্টরসের সঞ্চার করে। সকল বৃক্ষের ও সকল ফলের পুষ্টিসাধন ও মিষ্টিতাজন্য জলের যে সমান আবশ্যকতা করে না তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বর্ষাকালের কোন কোন ফল, শীতকালে ফলিলে অর্থাৎ শরতের ডাব শীতকালের পেয়ারা প্রভৃতি কোন কোন ফল শিশিরপাতে অত্যন্ত মধুর আস্বাদন বিশিষ্ট হইয়া উঠে। বর্ষাকালে যেমন সর্ব্বদা বৃষ্টির আবশ্যক করে, শীত কালে সেইরূপ বৃষ্টি হইলে অনেক শস্যের পক্ষে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টিপাত অতি পুণ্যের লক্ষণ বলিয়া কৃষকদিগের মনে বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসের কারণ দেখা যাইতেছে, বর্ষার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে শীতকালে মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, কঠিন মৃত্তিকায় সুচারুরূপে হল চালনার ব্যাঘাত হয় এবং উদ্ভিদ্গণ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ শস্যাদির শিকড় অতি কোমল এবং মৃত্তিকার অধিক নিম্নে গমন করিতে পারে না। কিন্তু মৃত্তিকা উত্তমরূপ কর্ষিত ও নরম হইলে উদ্ভিদ্মূল অনায়াসেই তদভ্যন্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়। মাঘের শেষে শীত এক প্রকার অবসান হয়, প্রকৃতির আবার নূতন শোভা, নূতন অবস্থা, নূতন নূতন শস্যাদি উৎপাদনের পূর্ব্ব সূচনা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই সময় বৃষ্টি

পাত দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত হইলে তাহার কাঠিন্য ভাব বিদূরিত হইয়া কৃষি কার্য্যের অনুকূলতা সম্পাদন করে। কৃষি শাস্ত্র বিশারদ আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন "মৃদ্বীভূঃ সর্ব্ব বৃক্ষাণাং হিতা।" মৃদু অর্থাৎ কোমল মৃত্তিকা সকল বৃক্ষের পক্ষেই হিতকারী। মাঘের শেষে বৃষ্টিপাতে মৃত্তিকার এই কমলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সময়েতে বৃষ্টিপাত এবং হল চালনাদি কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে সুন্দররূপ শস্যাদি উৎপাদিত হইতে পারে। শস্যাদি সুচারুরূপে উৎপন্ন হইলে প্রজাসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এক বৎসর ভাল শস্য না হইলে সংসারে কষ্টের পরিসীমা থাকে না। অন্নকষ্ট যে সকল দুঃখের আকর তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। দেশ মধ্যে খাদ্যের অভাব হইলে নানা প্রকার দুঃখ, চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রতারণা, অরাজকতা প্রভৃতি নানাবিধ পাপস্রোত বৃদ্ধি হইতে থাকে। রাজার কর্ত্তব্য প্রকৃতিপুঞ্জের ধন প্রাণ রক্ষা, দেশ মধ্যে শান্তি বিধান এবং দেশের সকল প্রকার অভাব বিমোচন করা।

রাজার এই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন জন্য পূর্ব্বতন ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "ধান্যানাং সংগ্রহোরাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।" ফলতঃ দেশ মধ্যে শস্যাদি সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত থাকিলে, সাধারণের কোন ক্লেশ থাকে না, সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করে। যে দেশে শান্তি বিরাজিত, সেই ক্ষেত্রই পুণ্যক্ষেত্র, সেই রাজাই ধন্য।

আম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গাছ ফলবান্ হইলেও এই সকল পাইট পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অধিকন্তু ফল পাকিয়া শেষ হইলে গাছের ছোট ছোট শাখা পল্লবগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া দিলে ভাল হয়। তদ্বারা বৃক্ষের প্রাচীনত্ব নিবন্ধন ফল ছোট কিম্বা আস্বাদনের পরিবর্ত্তন ঘটে না। প্রতি বৎসর শাখা পল্লব ছেদন না করিয়া দুই বৎসর অন্তর ছেদন করিলেই চলিতে পারে।

অল্প বালুকাযুক্ত আঠালিয়া মৃত্তিকায় আমের গাছ ভাল হয়। বোধ হয় কৃষি তত্ত্বের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ব্যবধান করিয়া গাছ রোপণ করা উচিত। যে জাতীব উদ্ভিদের যে পরিমাণে দূরের রস আকর্ষণের শক্তি অধিক, তাহাদিগকে সেই পরিমাণে অন্তর করিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। যেমন উপযুক্ত আহার না পাইলে মনুষ্য ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে, উদ্ভিদেরাও সেই রূপ উপযুক্ত রস, উত্তাপ, বায়ু এবং আলোক না পাইলেও তেজস্কর ও দীর্ঘজীবী এবং অধিক ফলবান হয় না। অন্যূন ২০ হস্ত ব্যবধান করিয়া আমের চারা রোপণ করা উচিত।

কলমের গাছ এবং বীজের গাছ এতদ উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। বীজোৎপন্ন বৃক্ষে প্রায় সর্ব্বপ্রকার বীজের অনুরূপ ফল ধরে না। কলমের গাছে ঠিক অনুরূপ ফল ধরিয়া থাকে, কিন্তু তদ্ অপেক্ষা বীজের গাছ অধিক কাল স্থায়ী হয়।

শ্রীশশি ভূষণ গুহ
সিলেট কল্টিভেটিং কোং লিঃ
ইন্‌স্পেক্টর।

কাঁকরোল।

কাঁকরোল একটী উৎকৃষ্ট তরকারী। উহা সিদ্ধ ও ভাজিয়া খাইতে হয়। ইহার চাসে বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। একটু যত্ন করিয়া এক বার গাছ করিতে পারিলে অন্যূন ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত আর আবাদ করিতে হয় না। ক্ষেত্রে এক বার গাছ হইলে বৎসর বৎসর সেই গাছের মূল হইতে গাছ জন্মিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ঐ গাছ অন্য স্থানে তুলিয়া রোপণ করিলে চলিতে পারে। ইহার বীজে চারা হয় না। দো-আঁশ মৃত্তিকায় কাঁকরোলের গাছ রোপণ করিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে। অন্যান্য মৃত্তিকায় উহা রোপিত হইলে অধিক পরিমাণে

ফল ধরে না, এবং আস্বাদনেরও ব্যতিক্রম ঘটে। বর্ষাকালে কাঁকরোল ফলিবার সময়। শীতের প্রারম্ভে গাছে আর ফল ধরে না, যত শীত পড়িতে থাকে সেই সঙ্গে গাছ মরিতে আরম্ভ হয়।

এই রূপ প্রতি বৎসর গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু উহার মূল বাঁচিয়া থাকে। এবং ঐ মূল হইতে আবার নূতন নূতন অঙ্কুর নির্গত হইয়া গাছে পরিণত হয়। কাঁকরোলের গাছ সিম, উচ্ছে গাছের ন্যায় লতা বিশিষ্ট। গাছ বাড়িতে আরম্ভ হইলে অন্যান্য গাছের ডাল পালায় তুলিয়া দিতে হয়। গাছ বড় হইলে মাচা করিয়া দিলে ভাল হয়। বাগানের মধ্যে পগারের ধারে পুঁতিয়া আড়ের গায়ে তুলিয়া দিলেও লতা সকল স্বাধীন ভাবে বিস্তারিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মূল তুলিয়া পুঁতিবার সময় উহা অল্প পরিমাণে আগুনে পুড়াইয়া রোপণ করিলে গাছ সতেজ এবং ফল বড় হয়। অন্যান্য গাছের ন্যায় কাঁকরোল গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

যোয়ান।

ইহার দ্বারা মসলার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অনেক ঔষধে যোয়ান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নি উদ্দীপক গুণ থাকাতে যোয়ানের সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ধনের ন্যায় এই মসলার আবাদ করিতে হয়। যোয়ানের চাসের পক্ষে দো-আঁশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত। প্রথমতঃ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া উত্তম করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। ভূমি ভাল করিয়া কর্ষিত হইলে তাহাতে বীজ বপণ করা উচিত। বীজ বপণ সমাপ্ত করিয়া এক বার মই দিয়া ক্ষেত্র সমান করিয়া দিতে হয়। অন্যান্য শস্যের ন্যায় ইহারও চাসে ভূমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। আশ্বিন মাসের শেষে অথবা কার্ত্তিক মাসে যোয়ান বপণ করিতে হয়। চারা ঘন হইলে নিড়াইবার সময় কতক চারা তুলিয়া পাতলা করিয়া দিলে ভাল হয়। চারা ঘন হইলে ফলন অল্প হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে শস্য পাকিয়া উঠিলে তখন গাছ কাটিয়া মসলা বাহির করিয়া লইতে হয়।

প্রত্যেক গৃহস্থই চেষ্টা করিলে স্ব স্ব ব্যবর্য্য যোয়ান বাড়ীতে উৎপাদন করিতে পারেন। সুলফ মেতি শাক যেমন অধিকাংশই গৃহস্থ বাড়ীতে বুনিয়া থাকেন, সেই রূপ কিয়ৎ পরিমিত ক্ষেত্রে যোয়ান বুনিলে সংসার খরচের মসলার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। এক কাটা জমিতে এক পোয়া যোয়ানের বীজ বপণ করিলে অন্যূন দশ বার সের মসলা হইতে পারে। এমন সহজ উপায় থাকিতেও গৃহ ব্যবর্য্য যোয়ানের জন্য পয়সা হাতে করিয়া বাজারে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

কার্পাস।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ কার্পাস উৎপাদন জন্য প্রসিদ্ধ। ভারত বাসীগণ কোন্ সময় হইতে যে উহার চাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অতি দুঃসাধ্য। ফলতঃ অতি পুরাকাল হইতেই যে এদেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস চাস ও উহার বাণিজ্য হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশের পুরাবৃত্তে ভারতীয় তুলার বিশেষ উল্লেখ আছে এবং আফ্রিকা দেশের অন্যান্য স্থানেও যে উহার সমধিক আদর ছিল ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভারত অতি পূর্ব্বকাল হইতেই যে সমুদায় পশ্চিম ভূভাগে কার্পাস বিতরণ করিয়া আসিতেছে ইহা ইতিহাস সমূহে অতি জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। প্রাচ্য অধিবাসী-গণ যাঁহারা এক্ষণে সভ্যতায় পৃথিবীর শিরোভূষণ হইয়াছেন, তাঁহারা এই ভারতের কার্পাস জাত তুলা লইয়া লজ্জা নিবারণ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই সুসভ্য জনগণ যখন ঘোর অসভ্যতা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিলেন, পর্ব্বত গুহা বৃক্ষ কোটরে অবস্থিতি করিতেন এবং পশু-চর্ম্ম পরিধান করিয়া কোন রূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকিতেন, তাহার পূর্ব্বে ভারতে কার্পাস চাস আরম্ভ হইয়াছিল। শতবৎসর পূর্ব্বে ভারতে কৃষির যেরূপ উন্নতি ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতের আর সে দেশীয় অনুরাগ নাই, কৃষিকার্যে যত্ন নাই, এবং পৃথিবীর মধ্যে অধিক শস্য দাতা বলিয়া, অভিমান নাই। এক্ষণে ভারত জরাগ্রস্থ হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্বযৌবন নবোত্থিত দেশ সমূহ গ্রহণ করিতেছে। ভারত এক্ষণে পরমুখাপেক্ষী অন্যের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর আমেরিকা ভারতের চাসের উপযুক্ত শস্যাদি আবাদ করিয়া প্রচুর ফল ভোগ করিতেছে। ইংলণ্ড বাসীগণ নানা দেশীয় লাভ-জনক শস্য উৎপাদন জন্য কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম, কত যত্ন ও কত অধ্যবসা প্রকাশ করিয়া নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিতেছেন। সমধিক দুঃখের বিষয় ভারত স্বপ্লায়াস লব্ধ লাভ জনক ফসলের চাসে হতাদর হইতেছেন। বিদেশীয় লাভ-কর শস্যের আবাদ করা দূরে থাকুক, দেশীয় উৎপত্তিশীল শস্যাদিও অকারণ পরিত্যক্ত হইতেছে। আমাদের দেশে কার্পাস স্বল্পব্যয়ে যে পরিমাণে জন্মে বিদেশ মধ্যে দুই একটী স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে অল্পব্যয়ে সেই পরিমাণে জন্মে না।

কার্পাস চাসের হ্রাসতা সহকারে দেশীয় বস্ত্র প্রস্তুতের সংখ্যাও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎসঙ্গে বিদেশে কার্পাস চাস বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। মানচেষ্টার নগরস্থ বসন কল সমূহ ভারতের বস্ত্র বয়ন গৌরব নষ্ট করিয়া দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে, আর হত ভাগ্য ভারত বাসীগণ স্বীয় খ্যাতি বিলুপ্ত করিয়া লজ্জা নিবারণ জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছেন। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে দেশে তন্তুবায় থাকিতে স্বদেশ জাত তুলা বিনিময়ে বিদেশীয় তন্তুবায় গণের দয়ার উপর লজ্জা নিবারণের ভার দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে অনুমাত্র ঘৃণা বোধ করেননা।

কোন্ সময় হইতে বিলাতে কার্পাস আমদানী হয়, তৎকাল হইতে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইহার কিরূপ আদান প্রদান চলিতেছে, তাহা অবগত হইতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। পাঠকগণের সেই ঔৎসক্য চরিতার্থ করিবার জন্য এতদ্সম্বন্ধে কয়েকটী স্থূল স্থূল পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে বিলাতে প্রথম কার্পাস প্রেরিত হয়। ১৮২০ অব্দে অর্থাৎ ৩৭ বৎসর

পরে ভারতে প্রায় তিন মণ কার্পাস সূত্র ও এককোটী বিয়াল্লিস লক্ষগজ কাপড় আমদানী হয়। ১৮৭৪ অব্দে সুয়েজ খাল দিয়া ৪৭৫০০৩ মণ সূত্র ও ১, ২৬, ৩০০০০০০০ গজ কাপড় এ দেশে আনীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের যে মূল্য কত অধিক তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। ইংলণ্ড হইতে যে সকল বস্ত্রাদি আসিয়াছে তাহার মূল্যের এই পরিচয়, কিন্তু এ দেশ হইতে যে পরিমাণে কার্পাস বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ১৮৬০ খ্রীঃঅব্দে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার এবং ১৮৭১ অব্দে প্রায় একুশ কোটি টাকার তুলা এদেশ হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে। এই সমস্ত মূল্যের তুলার অর্দ্ধেক অংশের বস্ত্র দেশ মধ্যে নির্ম্মিত হইলে ভারতের যে কত উপকার সাধিত হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সকল বিষয় উল্লেখ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কি নিয়মে কার্পাস চাস করিতে হয় এবং উহার চাসে কি পরিমাণে লাভ হয় তদ্‌-বিষয় প্রকাশ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তজ্জন্য দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা জাহানাবাদ অঞ্চলে যে প্রকারে কার্পাস চাস হইয়া হইয়া থাকে এবং বিঘা প্রতি কিরূপ লাভের পড়ন হয়, তদ্বিবরণ পাঠক বর্গের গোচর করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

প্রায় ৭। ৮ বৎসর পূর্ব্বে জাহানাবাদ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে কার্পাস চাস হইত। এমন কি কৃষক মাত্রেই দুই এক বিঘা কার্পাস আবাদ করিত। কার্পাস চাসে ভূমির তেজ অত্যন্ত হ্রাস হয় এই বিশ্বাসে অনেক কৃষক উহাঁর চাস এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেকেই বলিয়া থাকে যে এ প্রদেশে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম কার্পাস আর জন্মিবে না। কারণ তাহারা দেখিয়াছে যে এক বৎসর কার্পাস গাছ বড় হইয়াও ভাল ফল হয়নাই। আমি অনেক কৃষক দিগকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। এক বৎসর ফসল ভাল না হইলে যে আর কখন ফসল ভাল হইবে না, এ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে অন্যান্য রবিশস্যের মূল অপেক্ষা কার্পাসের মূল অধিক দীর্ঘ

সুতরাং কার্পাস ক্ষেত্রে অন্যান্য শস্যের চাস করিতে হইলে, শিকড় তুলিতে ব্যয় অধিক এবং অনেক বার লাঙ্গল দিতে হয়। নতুবা আর কোন প্রকার শস্য ভাল জন্মে না। মেটেল বা আটালিযা মাটিতে কার্পাস ভাল হয়। আমরা খেঁড়ো কর্পাসের চাসের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। দোঁ আশ মৃত্তিকায় গাছ বড হয় কিন্তু ফল অল্প ধরে। কার্পাসের জমিতে ৭।৮ বার লাঙ্গল দিতে হয়। জমি যে প্রকারেরই হউক না কেন অজ্ঞ কৃষকেরা প্রচলিত প্রবাদের অনুশাসনের অণুমাত্র লঙ্ঘন করে না। এই প্রবাদ প্রথম খণ্ডের কৃষিতত্ত্বের ৮ম সংখ্যার লিখিত প্রবাদের সহিত সারাংশের ঐক্য হইলেও বিভিন্নতা দেখা যায় বলিয়া এস্থলে উহা উদ্ধৃত হইল।

"ষোল চাসে মূলা।
তার অর্দ্ধেক তুলা॥
চারি চাসে ধান।
বিনা চাসে পান॥"

কার্ত্তিক মাসে কার্পাসের জমিতে উত্তমরূপ চাস দিয়া মাটি তৈযার করে। কার্পাস ক্ষেত্রে গোবরের সার দিলে ভাল হয়। জমি চাসদিবার ও মই দিয়া সমান করিবার পূর্ব্বে কার্পাস বীজ তৈযার করা উচিত। দুই উপায়ে কার্পাস জন্মাইতে পারা যায়। প্রথম বীজ বপন দ্বারা দ্বিতীয় খুপি কাটিযা। কিন্তু এই দ্বিবিধ উপায়ের জন্যই বীজ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম প্রণালীর নিমিত্ত বীজ ৫।৬ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিযা অর্থাৎ বেলা ১০।১১টার সময় ভিজাইযা সন্ধ্যার অগ্রে তাহা একটা মোটা গুণের উপর রগড়াইতে হয়। বীজের গাযে তুলা লাগিযা না থাকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওযা আবশ্যক। পরে ঐ সকল তুলা বিহীন বীজ সমস্ত রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। এই নিয়মে ভিজাইয়া রাখিলে পরদিন প্রাতঃকালে তাহা বপণের উপযুক্ত হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে একবার ঘন ঘন করিয়া লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইতে হয়। বিঘা প্রতি অন্যূন সাড়ে তিন সের বীজ লাগে। বপনের পর মই দিয়া জমি সমান করিবার কিছুদিন পরে চারা বাহির হইবে।

ক্রমশঃ

কৃষক।

"নিত্যং দশহলে লক্ষ্মীর্নিত্যং পঞ্চহলে ধনং।
নিত্যঞ্চ ত্রিহলে ভক্তং নিত্যমেকহলে ঋণং॥"

রাজমার্ত্তণ্ড।

পৃথিবীর বাল্য ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য জাতি আদিম অবস্থায় যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল দ্বারা উদর পূর্ণ করিত। পশুপক্ষীরা যেমন ভবিষ্যতের জন্য কোন রূপ খাদ্য দিব সংগ্রহ করে না ক্ষুৎপিপাসা বোধ হইলেই আহারান্বেষণে ব্যগ্র হয়, এবং কোন প্রকারে তাহা সম্পন্ন হইলেই নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করে, মানব জাতি এই নিয়মানুসারে চলিলে দেহ রক্ষা, সমাজ বন্ধন, এবং ধর্ম্মোন্নতি প্রভৃতি মনুষ্য-জীবনের গৌরব কর মহান লক্ষ্য সকল কোন ক্রমেই সংসিদ্ধ হইতে পারে না। বিদ্যা, সভ্যতা, ধর্ম্মাদি জন্য পশুজীবন অপেক্ষা মনুষ্য জীবনে অধিক আদর, অধিক মূল্য এবং অধিক শ্লাঘা। এক একটী মনুষ্য জীবনে জগতের যে কতদূর উন্নতি হয় তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতির সাধন জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, অতএব সেই জীবন সুরক্ষা করিবার উপায় যাহাদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতেছে সেই কৃষক জীবন আলোচনা করা যে একটী সুখকর বিষয় তাহা বলা বাহুল্য।

সভ্য জগতে চতুর্দ্দিকে যে সকল উন্নতি দেখা যাইতেছে এই সকল উন্নতির ভিত্তি যে কৃষক জীবন তাহা ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে। প্রথমে যখন মনুষ্য জাতি যদৃচ্ছা লব্ধ ফল মূল দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতেন, তখন সংসার ঘোর অসভ্যতান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তদনন্তর যখন পাশুপাল্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অনুষ্ঠিত হয়, তখনও কিছুই উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থার পর কৃষি কার্য্য আরম্ভ হয়। কৃষি কার্য্য আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যগণ সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

তখন তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের পাদদলিত মৃত্তিকা রেণুতে জীবনোপায়ের গুপ্ত ভাণ্ডার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুখ সৌভাগ্যের মূল, আবাস ভূমির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, আবাস ভূতা পৃথিবী ফল শস্য প্রসবের জন্য তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলতঃ এই সময় হইতেই যে পৃথিবী দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা প্রমাণ জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না। কৃষিজাত দ্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মধ্যে বাণিজ্য প্রথা প্রবিষ্ট হওয়াতে সুখ সৌভাগ্যের স্রোত গৃহে গৃহে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। কৃষক সংসারের ভোগ বিলাসিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অতি পবিত্র জীবন সংসারের সুখের জন্য উৎসর্গ করিতে লাগিল, শরীরস্থ রক্ত বিন্দু স্বেদ বিন্দুরূপে পরিণত করিল, বাহুবল দ্বারা সমাজ লুণ্ঠন নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কার্য্যে কলঙ্কিত না করিয়া জগতের আহারোপার্জ্জনে নিয়োজিত করিতে লাগিল, সংসারও নবীন ভাব ধারণ করিয়া যথার্থ মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত হইয়া উঠিল। এই রূপে কৃষক জাতি দ্বারা জনসমাজের উপকার হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ কৃষক শ্রেণী না থাকিলে সংসারের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই যে সভ্যতা জ্যোতিতে সংসার আলোকিত, বিদ্যার মাধুর্য্যে সংসার মধুরতাময়, ধর্ম্মের উন্নত ভাবে সংসার উন্নত, বীরত্বের ভৈরব রবে সংসার কম্পিত এই সকলের স্তরে স্তরে দেখ কৃষকের পরিশ্রম লব্ধ সাহায্য অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় সঞ্চারিত হইতেছে। উদ্যানস্থ বৃক্ষগণ যেমন মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পত্র, পুষ্প, ফল ধারণ করে। পত্রের শোভা, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, এবং ফলের মধুরতা দ্বারা অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ করে, মনুষ্য সমাজ ও সেই রূপ কৃষক জীবন হইতে আহারাদি গ্রহণ করিয়া নানা বিধ সুখের উপায় সাধন করিয়া থাকে। এক মাধ্যাকর্ষণ যেমন কেন্দ্রস্থান হইয়া জগতের প্রত্যেক পদার্থকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে সেই রূপ এক কৃষক জীবন সামাজের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া লোকস্থিতি রক্ষা করিতেছে। শত্রুগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্গ মধ্যে সৈন্যগণ আস্ফালন করিতেছে, তরবারির চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিত হইতেছে, বজ্রনাদী কামানের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের পীড়ন হইতে

রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দুর্গ মধ্যে, সেনা নিবেশে, তরবারি ফলকে এবং অগ্নি উদ্গীরণকারী কামনে কোন উপায় দেখা যায় না। উহার এমনি প্রভাব যে সৈন্য গণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্থির থাকে, তরবারি হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হয়, গোলা সকল শীতল ভাব ধরণ করে, সংসার মহা প্রলয় স্থান হইয়া উঠে, সমাজ বন্ধন ছিন্ন হয়, সন্তান প্রতি জনক জননীর যে স্বাভাবিক স্নেহ সঞ্চারিত আছে তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়, চতুর্দ্দিক কৃতান্তের ভীষণ মূর্ত্তি বিরাজিত হইতে থাকে। কৃষক শ্রেণী না থাকিলে সংসারকে এই ভয়ানক অবস্থা হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। ফলতঃ কৃষক যে সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবাসীরা এই পবিত্র কৃষক জীবন অতি হেয় জ্ঞান করিয়া কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না।

প্রাচীন ভারতে কৃষক অতি আদরের পাত্র ছিল। কৃষিকার্য্য অতি পবিত্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। যে দেশে বশিষ্ঠ, জনক, প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কৃষি কার্য্য করিতে মহা গৌরব জ্ঞান করিতেন, সে দেশে যে কৃষি কার্য্যের যার পর নাই উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল তাহা কে না স্বীকার করিবেন। কৃষির অবনতির সহিত ভারতেরও নানা শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্যের অভাব হইলে সমাজের নানা বিধ বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। কৃষক শ্রেণী হইতে এই খাদ্যের উপায় অবধারিত হয়। কিন্তু সমাজের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, যাহারা সমাজকে রক্ষা করিতেছে, তাহারাই আবার সমাজের নিকট অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। দাসত্বের পদাঘাতে যাহাদিগের বক্ষঃস্থল বিদলিত, সামান্য উদরান্নের জন্য যাহাদিগের মস্তক বিজাতীয় দ্বারে বিক্রীত, যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি পরাধীনতা অনলে ভস্মীভূত, তাহারাই সমাজ মধ্যে মহামান্য, ভদ্র বলিয়া পরিচিত। দাসত্বোপার্জ্জিত ধনাঢ্য অপেক্ষা কৃষকের হৃদয় অতি পবিত্র অতি নির্ম্মল। সমস্ত দিবস অনাহারের পর কৃষক যখন ভগ্ন কুটীরে বসিয়া স্বাধীনতা উপার্জ্জিত সামান্য শাকান্ন আহার করে, তাহার সেই তণ্ডুল গ্রাস দাসত্ব প্রিয় ধন কুবেরের নানা-বিধ উপাদেয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক মধুর, অধিক পবিত্রকর বোধ হয়। পরাধীন ব্যক্তির প্রত্যেক গ্রাস দাসত্ব হলাহল পরিপূর্ণ, তাহার সুধাধবলিত

সৌখরাজী দাসত্বের মলিন আবরণে আবৃত, তাহার মস্তক প্রভুর পদে অবনত, তাহার জীবন আজন্ম পরপদ সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত; প্রভুর রোষদৃষ্টি অগ্নিময়ী বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় তাহার হৃদয়কে বিভীষিকা দেখাইতেছে। অপমান বৃশ্চিক অহোরাত্র তাহার অন্তঃকরণ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। ফলতঃ দাসত্বরূপ উঞ্ছ বৃত্তি যাহার জীবনের আশ্রয় তাহার হৃদয়ে সুখ কোথায়! ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় মর্ম্মবেদনায় তাহার অন্তর স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু কৃষকের হৃদয় অতি শান্ত ভাবে শান্তিরসে পরিপূর্ণ থাকে। তাহার নয়ন প্রভুর মুখের ভ্রূকুটী দর্শন করে না, তাহার হৃদয় অপমানের পদাঘাতে কখন ভগ্ন হয় না, তাহার জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ন্যায় প্রভুর আফিসে বদ্ধ থাকে না, সে সর্ব্বদা প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তিসুখ অনুভব করে স্বাধীন ভাবে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন লইয়া পত্রাচ্ছাদিত ভগ্ন কুটীর উজ্জ্বল করিয়া থাকে। শান্তি রসে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণভাবে বর্দ্ধিত হয়, স্বাস্থ্য যাহার জীবনের মূলে সংযুক্ত তাহার সুখের পরিসীমা নাই। কৃষক স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিয়া পরমানন্দের সহিত জীবন যাপন করিয়া থাকে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে সকল শ্রেণী অপেক্ষা কৃষক শ্রেণী দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। কৃষিকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম প্রতিং পালন করা আবশ্যক, সেই নিয়ম সমূহ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি অনুকূল। কৃষককে প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিতে হয়, প্রভাত কালের নির্ম্মল বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতদূর উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধ্যবসায়ী পরিশ্রমী, শীতগ্রীষ্মোপসহিষ্ণু না হইলে কৃষিকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় না।

কৃষকের কার্য্য যে অতিশয় গুরুতর তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। কৃষকের উপর জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে, কৃষক যে পরিমাণে কৃষি কার্য্যে উন্নত হইবে, সেই পরিমাণে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। যে কোন বিষয় উন্নতি করিতে হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হয়। এক্ষণে যে কৃষি কার্য্যের অবনতি হইতেছে, ইহার কারণ কৃষকদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার না হওয়া। জ্ঞান বিস্তারের উপর যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি

নির্ভর করিতেছে, তাহার প্রমাণ ইংলণ্ড ও আমেরিকা। ঐসকল দেশের মৃত্তিকা কৃষি কার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তত্রাপি বিজ্ঞান বলে ইয়ুরোপীয়েরা দিন দিন ইহার প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন, দৃঢ় পরিশ্রম এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কৃষি কার্য্য করিয়া থাকেন, ভারতীয় কৃষকগণ সেই রূপ যত্ন সহকারে কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে ভারত মৃত্তিকায় যে কত শস্য উৎপন্ন হইত তাহা মনে ধারনা করা যায় না। ভারতের কৃতবিদ্যগণ কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দিন দিন উহার উন্নতি হইতে পারে। কৃষির অবনতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় এগ্রিকলচার সোসাইটীর কার্য্যবিবরণ পুস্তকে * উল্লিখিত আছে এতদ্দেশীয় লোকেদের অজ্ঞানতা ও অনুৎসাহিতা বশতঃ তাঁহারা কোন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ব্যগ্র নহেন। ভারতের মৃত্তিকায় যে গুপ্ত ধন আছে, তাহা প্রকাশ করিতে সামান্য নিপুণতা মাত্র আবশ্যক করে। ইংলণ্ডের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে শাক সবজী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তত্তুল্য দ্রব্যাদি আমরা যে এদেশে উৎপন্ন করিয়া দর্শাইতে পারিব, ইহা কেহ স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু উক্ত সোসাইটীর অধীনস্থ প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত কৃষক দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক "ভারতের মাটিতে সোনা ফলে" এই যে প্রবাদ বাক্য বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে প্রাচীন কালের কৃষকগণই ইহার অর্থ বুঝিয়াছিলেন। ইংলণ্ড আমেরিকায় কৃষক শ্রেণীর যে রূপ আদর, ভারতবর্ষে কৃষকদিগের প্রতি সেই রূপ আদর উৎসাহ প্রদত্ত হইলে, কৃষির কখনই এত অবনতি হইত না। ঐ সকল দেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্বহস্তে কৃষি কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। আমাদের দেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে কৃষিকার্য্য করা দূরে থাকুক, অনেকেই কৃষক দিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেও অপমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এতদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিসিক্ত ছিলেন, সেই সময়ে কৃষকদিগের উন্নতি জন্য তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রীশ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্টিক এগ্রিকলচার সোসা-

* ১৮৬৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কার্য্য বিবরণ পুস্তক ২য় ভলম

ষ্টীতে উপস্থিত হইয়া উৎসাহও অতি আনন্দের সহিত সামান্য কৃষক ও মালী-দিগকে স্বহস্তে পরিতোষিক বিতরণ করিতেন। মহাত্মা বেণ্টিক কৃষি কার্য্য যে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, তাহার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আপনাকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে অতি গৌরব জ্ঞান করিতেন। মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার যে পত্রলেখা হয়, তাহাতে তিনি রণজিৎসিংহকে লিখিয়া ছিলেন, " মহারাজ অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন, যে তাবৎ সম্পত্তির মূলই ভূমি এবং ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্যের ও তাহার গুণের বৃদ্ধি হয়, তদপক্ষে সাহায্য ও পোষকতা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

কৃষক শ্রেণীর উন্নতি সম্বন্ধে দেশ মধ্যে কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই। ভূমির উৎপন্ন সংখ্যা বৃদ্ধি দেশ মধ্যে লাভজনক নূতন নূতন শস্যের চাস অনুষ্ঠিত না হইলে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে প্রণালীতে এক্ষণে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তদ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভব দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষকগণ অত্যন্ত নিঃস্ব, তাহাদিগের কৃষি কার্য্যোপযোগী অর্থ, হৃষ্ট পুষ্ট বলীবর্দ্দ প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাবে অতি সংকীর্ণ ভাবে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। দারিদ্র দশা চির দিনের জন্য তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যে প্রণালীতে কৃষক গণ চাস করিয়া থাকে, ভারত মৃত্তিকা বলিয়াই কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যাহার এক হাল চালিত হয় তাহার নিত্যই ঋণ এবং যাহার দশ হাল চালিত হয় সে লক্ষ্মীবান হয়। কিন্তু এ দেশের কয়েক জন কৃষকের দশ হাল চালিত হইয়া থাকে, অনেক কষ্টে একখানি হাল চালানই অনেক কৃষকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ভারতের যেরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইতেছে, অন্ন কষ্ট দিন দিন যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে কৃতবিদ্য গণ কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে দেশের মঙ্গল আশা দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

গোলাপ।

গোলাপ এতদ্দেশীয় ফুল নহে। বোধ হয় মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এদেশে আনীত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গোলাপ দেখা যাইতেছে সে সকল গোলাপ দেখিলে ভারতীয় কবিগণ বোধ হয় কখন পদ্মকে ফুলকুলের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করাইতেন না। পুষ্পের যে কয়েকটী সৌন্দর্য্য থাকা উচিত গোলাপেতে সমুদায়ই লক্ষিত হয়। বিজ্ঞান বলে যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। গোলাপের যে এত উন্নতি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এক মাত্র বিজ্ঞানই ইহার মূল; বিজ্ঞান বলে গোলাপের আকার বৃহৎ ঘনসন্নিবেসিত বহু দল, বিবিধ মনোহর বর্ণ এবং নানা প্রকার বিচিত্রতা সংসাধিত হইয়াছে। একজাতীয় গোলাপের শাখা অন্য জাতীয় গোলাপের শাখায় সংযোজিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোলাপের চোক ভিন্ন জাতীয় গোলাপে বসাইয়া নানা প্রকার মনোহর গোলাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। গোলাপ কত প্রকার এবং উহাদের আকার ও বর্ণের বিষয় জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মে। বিঁশে উদ্যান প্রিয় ব্যক্তি দিগের উহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা অবসর ক্রমে ঐ সকল পরিচয় প্রকাশ করিয়া পাঠক বর্গের ঔৎসক্য চরিতার্থ করিব ইচ্ছা আছে।

রোজালাফ্রাঙ্ক—ইহা একটী উৎকৃষ্ট গোলাপ। এক একটী ফুল বড় স্থলপদ্মের ন্যায় বৃহৎ আকার বিশিষ্ট। লা ফ্রাঙ্কের আকার যেমন বৃহৎ দেখিতে ও সেইরূপ সুদৃশ্য। বৃহৎ আয়তনের উপর ঘন অথচ বহুদল সন্নিবেশিত হওয়াতে উহার সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। দেখিলেই বোধ হয়, বিধাতা দর্শন সুখ একত্রিত করিয়া উহার স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। লাফ্রাঙ্কের বর্ণ গাঢ় শুভ্র নহে। ঈষৎ লোহিত আভাযুক্ত শুভ্র বর্ণের উপর লাল লাল ছিটায় রঞ্জিত এই সৌন্দর্য্যের আধারে আবার পরমেশ্বর পরিমল সংযোজিত করিয়া পুষ্পরাজ্যে যারপর নাই উন্নতি বিধান

করিয়াছেন। লাফ্রান্ক ফুটিতে আরম্ভ হইলে প্রচুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যান শোভা করিয়া রাখে। বারমাসই প্রায় ফুল হইয়া থাকে অন্যান্য গোলাপের যেমন জোড় কলম বাঁধিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার ও চারা সেইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে *। এক একটী গাছ দুই হাত ঊর্দ্ধে বড় হয়। টবে গাছ বসাইলেও কোন হানি হয় না।

মার্সেলনীল—এই জাতীয় গোলাপ দেখিতে অতি মনোহর। ইহার দল সকল তরল জরদা বর্ণে শোভিত। অন্যান্য গোলাপ অপেক্ষা ইহার দলের আকার বড়। ফুল যেমন বড় দেখিতে ও সেইরূপ মনোহর। মার্সেলনীলের শাখা সকল অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, এজন্য জাফরীতে ডাল তুলিয়া দেওয়া উচিত। প্রায় বার মাসই ফুল ফুটিয়া থাকে। ফুলে তত অধিক গন্ধ নাই। যে অল্প পরিমাণে গন্ধ আছে তাহা অত্যন্ত মধুর। মার্সেলনীলের ন্যায় সিলিনিয়াফরেষ্টিয়ার ও ক্লথ অবগোল্ড, লিপ্যাক্টোল, লাবুলডিয়র সুফ্রেন, প্রভৃতি কয়েকটী গোলাপ ফুল পাতলা জরদা বর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু এই সকল ফুলের আকার মর্সেলনীল অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সামান্য গন্ধযুক্ত। কেবল লাবুলডিয়র নামক গোলাপের আকার অপেক্ষাকৃত বড় এবং সৌরভ ও অধিক। এই সকল গোলাপ দেখিতে অতি মনোহর। আশ্রয় বদ্ধ হইলে ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ গুলি টবে রোপণ করিলে চলিতে পারে। মাটির গাছ অপেক্ষা টবের গাছে অধিক যত্ন করিতে হয়। টবের আকার যত বড় হয় গাছের পক্ষে ততই সুবিধা জনক। (ক্রমশঃ)

ভুরা।

—০—

চীনার ন্যায় ভুরা ও এক প্রকার শস্য। এক প্রকার ঘাস হইতে উহা উৎপন্ন হয়। ভুরা দ্বারা উত্তম পায়স প্রস্তুত হইয়া থাকে। কৃষকেরা চীনা ও ভুরার তণ্ডুলে অন্ন পাক করিয়া খাইয়া থাকে। ধান্য অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এই শস্যের আবাদ হয়। এজন্য অনেক স্থলের কৃষকেরা ইহার চাস করিয়া থাকে।

---

* জোড় কলম বাঁধিবার প্রণালী—১২৮৭ সালের কৃষিতত্ত্বের ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভুরার আবাদে মৃত্তিকার বিশেষ কোনরূপ পাইট না করিলেও ক্ষতি হয় না। ক্ষেত্রে সার দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। অনেক স্থলের কৃষকেরা ভূমিতে আদৌ সার দেয় না। সামান্যরূপ ভূমি কর্ষণ করিয়া বিঘা প্রতি অন্যূন ছয় সের বীজ বুনিয়া থাকে। বীজ বপণের পূর্ব্বে মৃত্তিকায় লাঙ্গল দেয় এবং বপণের পর একবার মইদিয়া রাখে। অনন্তর বীজ হইতে চারা সকল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। অন্যান্য শস্যের ন্যায় ইহার গাছ ঘন হইলে কোন হানি হয় না। ভূমি নিড়াইবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই, না নিড়াইলেও কোন অপকার হইতে দেখা যায় না। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ভুরা বপণ করিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শেষ এবং ভাদ্র মাসের মধ্যেই প্রায় শস্য পাকিয়া উঠে। ধান্যাদি শস্যের ন্যায় ভুরা পাকিয়া উঠিলে কাটিয়া মাড়িয়া লইতে হয়। কোন কোন স্থানের কৃষাকরা আবার চৈত্র মাসের পূর্ব্বে ও ভুরা বপণ করিয়া থাকে। আউশ ধান পাকিবার পূর্ব্বে উহা পাকিয়া উঠিলে কৃষকদিগের অন্নকষ্ট অনেকাংশে নিবারণ করে। ভুরার আতপ ও উশনা দুই প্রকার তণ্ডুল প্রস্তুত হয়। বিঘাপ্রতি প্রায়—৮।৯ মণ ভুরা জন্মিয়া থাকে। ইহার অন্ন তত সুখাদ্য নহে।

কার্পাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় প্রণালী বীজ তিন দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। বীজ রোপণের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় জল হইতে বীজ তুলিয়া উহার নীচে উপরে এমত ভাবে খড দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যেন বাহিরের বাতাস উহাতে না লাগিতে পায়। পরদিন ক্ষেত্রে দুই হাত অন্তর প্রত্যেক খুপিতে ৩।৪ টী বীজ বসাইতে হয়। এই নিয়মে রোপণ করিলে ৫।৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুর নির্গত হইবে। কিন্তু প্রথম প্রণালীতে বীজ হইতে চারা বাহির হইতে ৯।১০ দিন সময় লাগে। কার্পাস বীজ সহ অন্যান্য রবিশস্য অর্থাৎ সর্ষপ, মসুর, মটর ইত্যাদি বীজ ও বপণ করিয়া থাকে। এই সকল শস্য পাকিয়া উঠিলে উপড়াইয়া ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে হয়। পরে বাত অর্থাৎ যো

হইলে লাঙ্গল দিয়া একবার ভূমি চসিতে হয়। অনন্তর কোদাল দ্বারা একবার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিতে হয়। যদ্যপি অল্প পরিমাণে কার্পাস চাস থাকে, তবে কোদাল দ্বারা উত্তম করিয়া ক্ষেত্র খুঁড়িয়া দিলেই চলিতে পারে। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে কিম্বা জল সিঞ্চন দ্বারা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সরস রাখিতে হয় এবং যো হইলে খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক বরে। বৈশাখ মাসেও জল আবশ্যক হয় অর্থাৎ যত দিন পর্য্যন্ত গাছে কুঁড়ি না ধরে, তত দিন মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রে ঘাস প্রভৃতি জন্মে ও তুলার পরিবর্ত্তে গাছ বড় হয়। আবার আদৌ জল না পাইলে গাছ ছোট হইতে থাকে এবং অসময়ে ফল পাকিয়া উঠিয়া তুলা খারাপ হয়। কুঁড়ি ধরিবার সময় হইতে কার্পাস তোলার শেষ পর্য্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুর প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ আড়াই কিম্বা তিন হাত দীর্ঘ হইয়া ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কার্পাসের ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতে থাকে। কৃষকেরা মধ্যে মধ্যে ফুটন্ত তুলাও ঘরে আনিয়া রাখে। পরিশেষে কার্পাসের অর্দ্ধস্ফুটন্ত কুঁড়ি সকল তুলিয়া আনিয়া গাছ কাটিয়া কার্পাস ক্ষেত্রে কেলেস ধান্য জন্য লাঙ্গল দেয়। বীজ সহ তুলা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুঁড়ি গুলি রৌদ্রে রাখিলে তাহা হইতেও অনায়াসে তুলা বাহির করা যায়। নিম্নে তুলা চাসের আয়ব্যয় প্রদর্শিত হইল।

কার্পাস চাসের ব্যয়।

জমির খাজনা	২৸৵০
চাস খরচ	৪৸৵০
বীজের মূল্য	।০
সার	১৲
অন্যান্য খরচ	২৲
শর্ষপ, মজুর ইত্যাদি বাবদ	১৲
মোট	১১৸০

আয়।

বীজ সহ তুঁলা—৫/	২৫৲
কার্পাস গাছ	২৲
শর্ষপ, মসুর ইত্যাদি	৮৲
মোট	৩৫৲
খরচ	১১৸৹
	২৩।৹ লাভ।

এক বিঘা কার্পাস চাস করিলে প্রায় ২৩৲ টাকা লাভ হয়। চাসে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না, কেবল কার্পাস তুলিবার সময় প্রায় প্রত্যহ একটী লোক দুই তিন ঘণ্টা আবশ্যক করে। যাহা হউক এই লাভকর প্রয়োজনীয় ফসলের চাস যাহাতে সর্ব্বত্র বহুলরূপে প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
হুগলী কলেজ।

ফুলকফি।

কর্ণেলস্টেসী সাহেবের পরীক্ষিত।

চেষ্টা করিলে অসময়ও শাক সবজী উৎপন্ন করা যাইতে পারে। অসময়ে কোন গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক পরিমাণে যে যত্ন করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য। সচরাচর শীতকালেই ফুলকফি হইয়া থাকে, কিন্তু চেষ্টা করিলে গ্রীষ্মকালেও উহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। অসময়ের দ্রব্যের মূল্য অধিক; সুতরাং আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কর্ণেল ষ্টেসী সাহেব তাঁহার আলিগড়স্থিত

উদ্যানে গ্রীষ্মকালে ফুলকফির চাস করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেম, পাঠকবর্গের গোচরার্থে এস্থলে তাহা লিখিত হইল।

কিরূপ জমিতে কফির চাস করিতে হয় এবং সারাদি কি নিয়মে দিতে হয় তাহা কৃষিতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় কেবল কি নিয়মে চাস করিলে অসময়ে কফি জন্মাইতে পারা যায়, তদ্বিষয় উল্লিখিত হইল। ফাল্গুন কিম্বা চৈত্রমাসে ফুলকফির বীজ বপণ করিতে হয়। চারা কিছু বড় হইলে অধিক গ্রীষ্ম হইবার পূর্ব্বে তাহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। এই ক্ষেত্র কিছু উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কারণ বর্ষার সময় বৃষ্টির জল ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইলে চারা সকল নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। এজন্য এরূপ উচ্চ স্থানে উহা রোপণ করিতে হইবে, বৃষ্টির জল যেন শীঘ্র গড়াইয়া পড়িতে পারে। এইরূপে বর্ষা পর্য্যন্ত ঐ সকল চারা একভাবে রাখিয়া পরে যেখানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে হইবে, তথায় তুলিয়া রোপণ করা উচিত। এই নিয়মে রোপণ করিলে ফুলকফি যে নিয়মে উৎপন্ন হয় তাহার ১৫।১৬ দিন অগ্রে কখনও বা একমাস অগ্রে খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বর্ষাকালে পাতার চাল দ্বারা ঢাকিয়া দিলে অনেক উপকার দর্শে। কেহ কেহ এরূপও করিয়া থাকে, বৃষ্টির সময় ঐরূপ চাল দ্বারা চারা সকল ঢাকিয়া রাখে, এবং বৃষ্টি ধরিয়া গেলে পুনর্ব্বার আচ্ছাদন খুলিয়া দেন, ইহাতে চারা বাড়ে না। কৃষকদিগের ইহা মনে রাখা উচিত যে সকল শাকসবজীর বীজ একেবারে বপণ করা উচিত নহে, একেবারে বপণ করিলে এক সময়ে সমুদায় উপযুক্ত আকারে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সমুদায় ফুরাইয়া উঠে। এজন্য অগ্র পশ্চাৎ করিয়া বপণ করা ভাল। যে কোন শাকসবজী অগ্রে করিতে পারিলেই যে অধিক লাভ হয়, ইটী কৃষকের মনে জাগরুক থাকা আবশ্যক।

দেশীয় তরকারী।

"পেটের বাছা।
বাড়ীর গাছা॥"

ঋতু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাক সবজী তরকারী উৎপন্ন হয়। কোন সময়ে কোন্ তরকারীর চাস করিতে হয় এবং কি নিয়মে চাস্ করিলে সফল যত্ন হইতে পারা যায় তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। বিলাতবাসী সাহেব দিগের ন্যায় আমাদের ভাড়াটিয়া আবাসে বাস করিতে হয় না যে স্থানের অভাব বশতঃ কোন প্রকার গাছপালা প্রস্তুত করিতে ব্যাঘাত জন্মে। এ দেশে যে নিতান্ত দরিদ্র তাহারও এক খানি কুটীর এবং কুটীরের চতুর্দ্দিকে কিছু জমি আছে, আবাস স্থলের চারিদিকে শাক সবজী তরকারী উৎপাদন করিলে, অনায়াসেই সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে। বাড়ীর গাছ পালায় যে কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ হয় না। গাছের সুপক্ক ফল, সতেজ টাটকা শাক সবজী প্রভৃতি তরকারীর আস্বাদন যে কত মধুর তাহা যাঁহারা বাজার বাসি, শুষ্ক দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহারা সে সুখে বঞ্চিত। গৃহস্থ মাত্রেরই উচিত ঐ সকল দ্রব্য স্ব স্ব আবাস বাটীতে প্রস্তুত করা। সুদক্ষ গৃহস্থ হাট বাজারের মুখ অপেক্ষা করিয়া থাকে না। তাহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই নিত্য হাট বাজার সজ্জিত থাকে। কোন বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন "বাপুহে বাড়ীতে নিত্য হাট বাজার বসাইবে।" এই হাট বাজারের অর্থ আর কিছুই নহে, আবাস বাটীর চারিদিকে শাক শবজীর ক্ষেত করিয়া ঐ সকল উৎপাদন করা। আমরাও আশা করি, কৃষিতত্ত্বের পাঠক গণ স্ব স্ব আবাস ভূমির চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফুল, ফল, শাক, সবজী প্রভৃতি তরকারীর আবাদ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

শাক—পালং, চুকোপালং, বিটপালং, শুলফ, মেতি, পীড়িং, মুলিশাক, বেতুয়া, পুঁই, চাঁপানটে, পদ্মনটে কনকারাঙ্গা, সুষনি, হিঞ্চে, গাঁংনটে, স্যাঞ্চি, পুদিনা, হালিম, দেশীয় শাকের মধ্যে এই গুলি প্রধান। এতব্যতীত লাউ, কুমড়া, সজিনা প্রভৃতি নানা জাতীয় শাক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল শাকের আবাদ করিতে হইলে, সামান্য পরিশ্রম করিতে হয় ইহাদিগের মধ্যে অনেক শাক বার মাসই হইয়া থাকে। উপরি উক্ত শাক সকল শীত কালে উৎপন্ন হয়। কোন কোন জাতি আবাদ করিলে অন্যঋতুতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল শাক বুনিবার সময় জমি উত্তম করিয়া

কোদলাইয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিতে হয়। জমির পাইট যে পরিমাণে উত্তম হইবে, ফসলও যে সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইবে ইহা কৃষকদিগের মনে রাখা উচিত। শাকের জমিতে অল্প পরিমাণে সার দিলে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। গাছের অবস্থা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে জল দিতে হয়। বীজ পাতলা করিয়া বুনিলে ঝাড় বড় বড় হইয়া থাকে। শাক বাড়িয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল শাকের মধ্যে সুষনি, হিঞ্চে, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় জলজ। উহারা জলে উৎপন্ন হয়। মরা নদী, খাল বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে এই সকল শাক জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের কোন রূপ পাইট করিতে হয় না। যে কোন শাক চারার অবস্থায় সুখাদ্য। গাছ পাকিয়া উঠিলে খাদ্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। একটী প্রবাদ আছে

"শাকের ছা
মাছের মা"

বাস্তবিক শাকের চারার অবস্থায় ভাল। পালং, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় শাকের পাতা ও মুথা বা গোড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল শাক ভিন্ন কয়েক জাতি কচু শাক ও তরকারির কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

মিটাডাঁটা, হাজ্‌রিমুলা, কাঁচড়াদাম, চামলাই, পুনক, প্রভৃতি শাক সমূহ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। বেলে ও আঠালিয়া মাটিতে ডাঁটা সুস্বাদু হয় ডাঁটা এক স্থানে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত হইলে তুলিয়া ক্ষেতে রোপণ করিলেও চলিতে পারে। সচরাচর যে সকল ডাঁটার বড় বড় গাছ, পাতা বড়, রং তাদৃশ গাঢ় নহে, সেই সকল ডাঁটা প্রায় মিষ্ট হয় না। ডাঁটা দেখিলেই মিষ্ট কি না তাহা বলিতে পারা যায়। নরম সেঁতা মাটিতে ডাঁটা প্রায় সুস্বাদু হয় না। ডাঁটা আমনে ও আউশে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কোন কোন শাকের পাতায় পোকা লাগিয়া থাকে। শাকে পোকা লাগিলে গাছে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। সচরাচর সুমিষ্ট ডাঁটাতেই অধিক পরিমাণে পোকা লাগিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ইক্ষু।

ইক্ষু একটী লাভজনক ফসল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার আবাদ প্রণালী বিভিন্নরূপে সম্পাদিত হয়। আমাদের দেশে ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। অত্রস্থ গুড ও চিনি নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে এখানে ইক্ষু চাসে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়, একারণ অনেকে ইহার চাসে তাদৃশ মনোযোগী হয় না, কারণ ইক্ষু চাসে কিছু মূল ধনের আবশ্যক করে। আমাদের এখানে যত প্রকার ফসল জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইক্ষু চাসেই অধিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। যদি ও ইক্ষু চাসে অধিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয় সত্য বটে, তথাচ ইহা অপেক্ষা লাভজনক ফসল আমাদের এখানে আর কিছুই নাই। এতাদৃশ ব্যয় সাধ্য চাস নিঃস্ব কৃষকদিগের দ্বারা সুসম্পাদিত হওয়া সুকঠিন। যদিও এখানকার কৃষকেরা ইক্ষু চাস করিয়া থাকে কিন্তু তাহা অতি সামান্য মাত্র সুতরাং তাহাতে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারে না। যদি তাহারা অধিক পরিমাণে ইক্ষু চাস করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যে বিলক্ষণ লাভ বান হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাস হইত এক্ষণে উহার চাস এক বারে বন্দ হইয়া যায়। পুনরায় কৃষকেরা ইক্ষু চাসে মধ্যে মনোযোগী হইয়াছে। এবৎসর এখানে যে প্রকার ইক্ষুজন্মিয়াছে, যদি সকলেরই কিছু অধিক পরিমাণে আবাদ থাকিত, তাহা হইলে, তাহারা বিলক্ষণ লাভবান হইত। কিন্তু অতি অল্প, পরিমিত ভূমিতে ইক্ষুর চাস থাকায়, তাদৃশ লাভের সম্ভাবনা নাই। ইক্ষু নানা প্রকার, তন্মধ্যে দেশী, কাজলী, বোম্বায়ে, সামসাড়া, প্রভৃতি কয়েক প্রকার ইক্ষুর চাস আমাদের এখানে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সামসাড়ার চাসই এখানে অধিক হয। সকল প্রকার ইক্ষু চাসের পাইটই প্রায় সমান।

যে জমিতে ইক্ষুর চাস করিতে হইবে, সে জমি একটু উচ্চ ও তাহার মৃত্তিকা দোয়াঁশ হওয়া আবশ্যক। জমি একটু উচ্চ হইলে, তাহাতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া ইক্ষুর মূল পচাইতে পারে না ; জমিতে জল দাঁড়াইলে ভাল রূপ ইক্ষু জন্মে না। যদি জমিতে জল দাঁড়ায়, তাহা হইলে জল

বাহির করিয়া দিবার উপায় থাকা বিশেষ আবশ্যক। উচ্চ জমিতে ফাল্গুণ মাসে জল সিঞ্চন করিয়া, মৃত্তিকা সিক্ত করিতে হইবে। ৪।৫ দিন পরে জমিতে যো পাইলে অর্থাৎ কর্ষণোপযোগী মৃত্তিকা হইলে, তাহাতে উপর্য্যু-পরি ৩। ৪ টা চাস দিয়া মৃত্তিকা উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া, মই দিতে হইবে।

ইক্ষুর জমিতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। আমাদের এখানে পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক, সার * এবং রেড়ীর খইল ইক্ষুর জমিতে দিয়া থাকে। পঙ্ক ও সার অগ্রে জমিতে দিয়া, তৎপরে চাস দিতে হয়, কারণ তাহাতে জমির মৃত্তিকার সহিত সার সমান রূপে মিশ্রিত হইতে পারিবে। জমিতে অধি-পরিমাণে পঙ্ক ও সার দেওয়া হইলে, কাঠায় এক মণের অধিক খই দিবার আবশ্যক নাই। এই রূপে জমির পাইট হইলে পর জমির মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ লম্বা দিকে এক হস্ত অন্তর অর্দ্ধহস্ত কি তিনপোয়া পরিসর নালা রাখিতে হয়, জমির এক স্থানে জল সিঞ্চন করিলে সেই নালার দ্বারা সমস্ত জমিতে জল পাইতে পারে, এরূপ করিয়া দাঁড়া বান্ধিতে হইবে। সেই দাঁড়ার নিম্ন স্থানে ইক্ষুর ডগা রোপণ করিতে হইবে। ইক্ষু রোপণ করিবার সময়ে কাঠা প্রতি ১৫ সের খইল দিয়া চৈত্র কি বৈশাখ মাসের প্রথমে বালি হাপর † হইতে ইক্ষুর ডগা বাহির করিয়া কিছু কিছু অন্তর রোপণ করিতে হইবে। যে স্থানে ইক্ষু রোপণ করিতে হইবে, সেই স্থানে একটু গর্ত্ত করিয়া, ইক্ষুর ডগা তাহার মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পুরণ করিয়া দিতে হইবে। বালি হাপরে ৫।৭ দিন রাখিলে ডগার গাঁইট অর্থাৎ চোক হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে। যদি রোপণ কালীন চারা বাহির হইয়া না থাকে, তবে ইক্ষুর ডগা রোপণকরিয়া, জল সিঞ্চন করিলেও ৫।৭ দিন মধ্যে চারা বাহির হয়। অনেক ইক্ষুর ডগা হাপরে ও বালি হাপরে না রাখিয়া, ডগা গুলির ২। ৩ টী গাঁইট রাখিয়া কর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই কর্ত্তিত ডগা গুলিকে এরূপ ভাবে রোপণ করে যে, ডগার গাঁইটের চোক গুলি নীচে উপরে না রাখিয়া উভয় পার্শ্বে রাখিয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে হাপর হইতে ও ডগা তুলিয়া রোপণ করিতে হয়। ক্রমশঃ

* হাপরে ইক্ষুর ডগা রাখন ও বালিহাপরের বিষয় পশ্চাৎ বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

† গোময় ও ঘুঁটের ছাই মিশ্রিত সারকে আমরা "সার" বলিয়া উল্লেখ করিব।

কৃষক।

——oo——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষি কার্য্য যে অতি গুরুতর তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গুরুতর কার্য্যের ভার কৃষকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি সম্বন্ধে সমুদায় তত্ত্ব কৃষকের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেখা উচিত তাহা দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না। কৃষিকার্য্য অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য, সুতরাং ক্লেশ সহিষ্ণু ব্যক্তির ইহাতে প্রবেশ করা উচিত। বিলাসী ব্যক্তি দ্বারা কৃষি কার্য্য কোন রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার জল, শীতের শিশির কৃষকের অঙ্গের ভূষণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ক্লেশের মুখ দেখিলে অবসন্ন হয়েন, তাঁহার কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি সহস্র অর্থ ব্যয় করিলেও লাভের মুখ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। বহুদিন হইতে কৃষকদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হা ভাত।"

যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিতে সমর্থ এবং মজুরদিগকে খাটাইতে পারে তাহার সম্পূর্ণ লাভ হয়, যে স্বয়ং পরিশ্রম করিতে অসমর্থ কিন্তু ছাতা লইয়া সর্ব্বদা ক্ষেত্র তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক লাভ হয় আর যে নিজে পরিশ্রম করিতে কিম্বা তত্ত্বাবধান করিতে অপারক তাহার কখনই অন্নের সংস্থান হয় না। অতএব কৃষকদিগের পরিশ্রমী হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিশ্রমী হইলেই যে আশানুরূপ ফল লাভ হয়

এরূপ নহে। কাল দেশ পাত্র বুঝিয়া পরিশ্রম না করিলে কোন ফল লাভ হয় না। অতএব কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভূমি, বীজ, জল, বায়ু উত্তাপ, সার, কৃষিব্যবহার্য্য যন্ত্র ও পশু এবং সময় এই গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কৃষকের গুরুতর কার্য্য। মৃত্তিকা কত প্রকার, কোন্ মৃত্তিকায় কোন প্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে, কি উপায়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, কোন জাতীয় উদ্ভিদে কোন্ সার দেওয়া প্রশস্ত ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকায় রোপণ করা উচিত। এক রূপ মৃত্তিকায় সকল প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না। কারণ সকল জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনোপযোগী পদার্থ একরূপ নহে। যেমন প্রাণিদিগের খাদ্যের বিভিন্নতা আছে, সেই রূপ উদ্ভিদদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া তাহারা পরিপুষ্ঠ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ যেমন অন্ন আহার করিয়া জীবধারণ করিয়া থাকে, তুষ ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্য-জীবন কোনমতেই রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ যে যে পদার্থ গ্রহণ করিয়া মনুষ্য শরীর পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তুঁষে সে সকল পদার্থ লক্ষিত হয় না। সুতরাং তুঁষ ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্যদিগের কোন উপকার নাই। কিন্তু গো প্রভৃতি পশুগণ তুঁষ ভক্ষণ করিয়া অনায়াসেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের দেহ রক্ষা জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন তুঁষে তদ্ সমুদায় লক্ষিত হয়। সেই রূপ মৃত্তিকার যে সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া গোধূম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া আক্ষুর হয় তো পরিপুষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য সকল জাতীয় উদ্ভিদ একরূপ মৃত্তিকায় রোপণ নিষেধ। আবার এরূপও হইতে পারে প্রতি বৎসর এক জাতীয় শস্য এক স্থানে রোপিত হইলে সুন্দর রূপ ফসল হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বৎসর বৎসর এক ভূমিতে এক প্রকার শস্য বপণ করিলে সেই ভূমিতে ঐ শস্যের পোষনোপযোগী যে সকল পদার্থ যত দিন থাকে, তত দিন উহা উপযুক্ত আকারে পরিণত হইয়া ফল শস্য প্রদান করিতে সমর্থ হয়। এবং ঐ সকল পদার্থের অভাব হইলেই আর উহারা

সতেজ হইয়া শস্যাদি প্রদানে সক্ষম হয় না। এজন্য কৃষকের উচিত ভিন্ন ভিন্ন বৎসর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের আবাদ করা। এই রূপে পর্য্যায় ক্রমে আবাদ, কিম্বা মধ্যে মধ্যে ভূমি পতিত রাখা অথবা যে জাতীয় শস্যের আবাদ হইবে, তদুপযোগী সার সেই ভূমিতে দিয়া ভূমির উর্ব্বরা শক্তি অব্যাহত রাখা উচিত। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কোন মতেই কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। উর্ব্বরতা শক্তির অভাবে কৃষক যত কেন পরিশ্রম করুক না সমুদায়ই বৃথা হইবে। কৃষিকার্য্যের মূলই ভূমি। অতএব যাহাতে সেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় তদ্‌পক্ষে বিহিত বিধানে সচেষ্টিত থাকা কর্ত্তব্য।

এ দেশের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা। সামান্য রূপ যত্ন করিলেই প্রচুর ফল লাভ করা যাইতে পারে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে কোন বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেমন না না প্রকার পদার্থ সার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমাদের দেশে কৃষকেরা হয় ত সে সকল সারের নামও কখন শ্রবণ করে নাই। গোবর ও খইল সার ভিন্ন অন্য সার এ দেশে আদৌ ব্যবহার হয় না। কঠিন মৃত্তিকা কোমল করিতে হইলে চূণ প্রভৃতির সার দিয়া যে রূপ মৃত্তিকা রূপান্তরিত করিতে হয় তদ্ সমুদয়ে কৃষকদিগের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

ভারত মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিই ভারতের অবনতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, কোন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে দেশে যত সহজে খাদ্যের সংস্থান হয়, সেই দেশ ততই অবনতির দিকে গমন করে। ভারত ও মিসর দেশ পৃথিবীর মধ্যে উর্ব্বরা, সুতরাং এই সকল দেশবাসীরা সহজে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়া কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হয় না। কোন রূপে উদর পূর্ণ হইলেই নিশ্চিন্ত থাকে। সুতরাং নিশ্চিন্ত জাতি দ্বারা জগতে কোন উপকার সাধন হয় না। অভাবই উন্নতির মূল; কোন বিষয়ের অভাব হইলে সেই অভাব মোচন জন্য না না প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, মনুষ্যগণ নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে জীবন উৎসর্গ করেন এই খাদ্যের অভাব নিবন্ধন ইংলণ্ডের এত উন্নতি, এত সমৃদ্ধি।

মনুষ্যের এই স্বভাব সহজে কোন বিষয় লাভ করিতে পারিলে ক্লেশের বিকটমুখ দর্শন করিতে চাহে না। ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডের ভূমি উর্ব্বরা হইলে ইংরাজ জাতি এতদ্দেশীয়দিগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, ভারত মৃত্তিকায় সহজে উদরান্নের সংকুলান হয় বলিয়াই ভারতবাসিরা ইংরাজদিগের ন্যায় কৃষির উন্নতি সংকল্পে মস্তিষ্ক পরিচালিত করেন না। যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবেশ ও বাণিজ্য বিস্তার ভিন্ন ভারতের আর মঙ্গল আশা নাই। বৎসর বৎসর দেশ মধ্যে শিক্ষিত-দল যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছেন, তাঁহাদের চাকুরীর সংস্থান কোন মতে হইতে পারে না। কারণ চাকুরীর সংখ্যা অপেক্ষা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, একটী কর্ম্ম খালি হইলে শত শত প্রার্থী উপস্থিত হয়। সম্প্রতি ১৮৮১ কন্‌ভোকেসন্ উপলক্ষে জষ্টীস্ উইল্‌সন্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে "এই কষ্ট দূর জন্য এ দেশের লোকেরা প্রথমেই গবর্ণমেণ্টের নিকট দ্বিবিধ সাহায্য চাহেন। প্রথম রাজ কার্য্যে সমধিক পরিমাণে দেশীয় নিয়োগ। তিনি বলেন যে এ বিষয়ে অনেক করা হইয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্ট আরও অনেককে নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সম্ভবত পদ সমূহে নিযুক্ত করিলেও বহুল প্রার্থী থাকিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর অল্পপরিমাণেই লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রতিবৎসর তাহার বহুগুণাধিক প্রার্থী উপস্থিত হইতে থাকিবে। অতএব রাজকীয় পদের দ্বারা এ অভাব মোচন কামনা ক্ষতিসাধক স্বপ্নমাত্র। দ্বিতীয় সাহায্য শিল্পাদি শিক্ষা বিস্তার। তিনি বলেন এসম্বন্ধেও অনেক করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা আরও যে অভাব মোচিত হইবে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নাই। তিনি ইংলণ্ডের ঘটনার উপমা দিয়া বলিয়াছেন বিবাহ সংখ্যা হ্রাস, বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং তদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই এই অভাব মোচনের প্রধান উপায়।" বাস্তবিক দেশীয় কৃত বিদ্যগণ কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহার উন্নতি সাধন না করিলে ভারত বাসীদিগের অন্নকষ্ট নিবারিত হইবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মার্জ্জিত বুদ্ধি পরিচালিত হইলে দিন দিন কৃষি জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

মৃত্তিকা, সারাদির উৎকর্ষ সাধন বিজ্ঞান সাপেক্ষ, সুতরাং বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে শিক্ষিত গণ তাহাদিগের সহিত যোগদান করিলে প্রভুত উপকার হইতে পারে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি এবং কৃষকদিগের পরিশ্রম এক সঙ্গে কার্য্যে নিয়োগ হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া উঠে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণ যেমন দেশীয় রাজ মিস্ত্রী, সূত্রধর প্রভৃতি সামান্য লোকদিগকে লইয়া উত্তমোত্তম অট্টালিকা, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প বিভাগে উন্নতি করিতেছেন, সেই রূপ কৃতবিদ্য যুবকগণ পরিশ্রমী কষ্টসহ কৃষকগণকে লইয়া কৃষি কার্য্যে প্রবেশ করিলে দিন দিন যে উহা উন্নতি মুখে অগ্রসর হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্দেশে যে সকল নীলকর ও চা কর সাহেবেরা চাস আবাদ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা কেহই স্বহস্তে হল চালনা করিয়া থাকেন না। কেবল বুদ্ধি বলে সামান্য কৃষকদিগের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। তাঁহারা আমাদের মৃত্তিকা, আমাদের পরিশ্রম লইয়া ধন শালী হইতেছেন। আমরা ভারবাহী পশ্বাদির ন্যায় তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের জন্য সুখের জন্য তাঁহাদের পদতলে মান সম্ভ্রম বিদ্যাবুদ্ধি স্বাধীনতা সমর্পণ করিতেছি। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ব্যবসা, স্বাধীন কার্য্য, স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ভারত বাসীরা স্বপ্নেও একবার চিন্তা করেন না। পালিত পশুর ন্যায় কোন প্রকারে প্রভুর দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা পাইলেই জীবন সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষিত দিগের মধ্যে কেহই স্বাধীন কৃষিতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হয়েন না। নদনদী সমূহের যেমন সমুদ্রাভিমুখে গতি, সেইরূপ দেশীয় কৃতবিদ্যগণের শিক্ষা স্রোত দাসত্বাভিমুখে ধাবিত। গুরুতর পরিশ্রম লব্ধ বিদ্যার পুরস্কার দাসত্ব পাদুকা যে জাতির বিশ্বাস, সে জাতি দ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া সুকঠিন। জাতীয় সম্মিলন, জাতীয় গৌরব রক্ষা করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীন ভাবে জীবিকার উপায় করিতে না পারিলে জাতীয় গৌরব রক্ষা হয় না। অন্যের অনুগ্রহের উপর যে জাতির জীবিকার সংস্থান নির্ভর করিতেছে, সে জাতির উন্নতি অতল সাগরের গর্ভে লুক্কায়িত।

গোলাপ।

——oo——

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মেরিরেডি—ইহার বর্ণ গাঢ় লাল নহে, তরল লালে রঞ্জিত। দেখিতে অতি মনোহর। লাফ্রাঙ্ক অপেক্ষা ইহার আকার অতি বৃহৎ। বোধ হয় ইহার ন্যায় আয়তনে বড গোলাপ আর নাই, এক একটী ফুলের যেমন বৃহৎ আকার সেইরূপ অসাধারণ সৌন্দর্য্য। লা ফ্রাঙ্কের দল সমূহ যে প্রকার ঘন সন্নিবেসিত মেরিরেডির দল সে প্রকার ঘন নহে। সৌগন্ধ সৌন্দর্য্য বৃহৎ আকার প্রভৃতি যে সকল গুণের জন্য পুষ্পের প্রধান আদর মেরিরেডি সে গুণ সমূহে পরিপূর্ণ। প্রস্ফুটিত মেরিরেডি দর্শন করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় আনন্দে বিকসিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিরস সহজেই সঞ্চারিত হইতে থাকে। ফলতঃ গোলাপের মধ্যে মেরিরেডি একটী উৎকৃষ্ট পুষ্প।

চোক কলম কিম্বা অন্য কলমেও ইহার চারা হইয়া থাকে। চোক কলম অপেক্ষা জোড় কলম অতি সহজ, এজন্য সচরাচর মালিরা জোড় কলমেই চারা তৈয়ার করিয়া থাকে। গাছে জল সিঞ্চন, ক্ষেত্রে সার দেওয়া এবং কার্ত্তিক মাসে ডাল ছাটিয়া দেওয়ার যে সকল ব্যবস্থা অন্যান্য গোলাপ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, মেরিরেডিরও সেই সকল পাইট করিতে হয়। কলম করিবার উপায় জানা থাকিলে একটী গাছ হইতে বহুতর গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। মেরি রেডির এক একটী গাছ উর্দ্ধে ৩।৪ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গাছ যত ঝাড়াল হয় ততই ভাল, কারণ ঝাড় বিশিষ্ট গাছ হইতে বহুতর শাখা নির্গত হইয়া প্রচুর পুষ্প ফুটিতে আরম্ভ হইলে উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা হয়। গাছের তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে গোবরের সার জল সিঞ্চন এবং গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। ফুল কিম্বা ফলের উৎকর্ষ সাধন যে পাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য।

টবে রোপণ করিলেও মেরিরেডির গাছ হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ফুলের টব অপেক্ষা ইহার টব্ বড করা উচিত। টব অপেক্ষা ভূমিতেই ভাল হইয়া থাকে, তবে টব বড় করিয়া রোপণ করিলে গাছের পক্ষে ভাল। ছোট টবে গাছের শিকড সকল আবশ্যকীয় স্থানের অভাব বশতঃ স্বাধীন ভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

সুতরাং শিকড় সমূহ পরস্পর জড়িত হইয়া যায়। টব বড হইলে এ অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। প্রতি বৎসর টবের মাটি ঝাড়িতে হয়, মাটি ঝাড়িতে হইলে পূর্ব্বদিন টবে জল দিয়া রাখিতে হয়, জলে মাটি নরম হইয়া থাকে, পরদিন টব উল্‌টাইয়া অল্প পরিমাণে ঘা দিলে তাহা হইতে গাছ পৃথক হইয়া আইসে। ভূমির গাছ অপেক্ষা টবের গাছ সর্ব্বদাই জল দিতে হয়, কারণ ভূমির গাছে জল দিতে বিলম্ব হইলেও মৃত্তিকাস্থ রস আকর্ষণ করিয়া উহারা জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু টরের গাছ ভূমির গাছের ন্যায় রস আকর্ষণের সুবিধা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং টবের গাছে অধিক পরিমাণে যত্ন ও পাইট করিতে হয়।

প্লিটিনডিন্‌কিনক্লিন—ইহা একটী উৎকৃষ্ট গোলাপ মধ্যে পরিগণিত। ইহার বর্ণের শোভা দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মোহিত হইতে হয়। স্তবকে স্তবকে দল সমূহের সমাবেশ যার পর নাই প্রীতিপদ। এই জাতীয় গোলাপের সম্পূর্ণ গাঢ় লাল বর্ণের উজ্জ্বতায় উদ্যান শোভিত হইয়া থাকে। পুষ্পের যেমন অসাধারণ সৌন্দর্য্য সেই রূপ প্রাণ মুগ্ধকর সৌরভ। এই গোলাপের বিশেষ গুণ এই যে কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, কি শীত প্রায় সকল সময়ই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। যিনি এক বার এই বিকসিত গোলাপ দর্শন ও আঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কখন সেই নির্ম্মল সুখের আস্বাদন ভুলিতেপারে না, লাবণ্য ময়ী যুবতীর অধর প্রান্তে টিপি টিপি হাসির ছটা প্রকাশের ন্যায় এই গোলাপের কোরক সমূহ যখন ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতে থাকে, তখন এক রূপ চমৎকার শোভা উপস্থিত হয়। এবং পুষ্প সম্পূর্ণ বিকসিত হইলে আপন সৌন্দর্য্যে, আপন রূপের গরিমায় আপন সৌরভে বিভোর হইয়া উদ্যান মাতাইয়া তুলে। ফলতঃ প্লিটিন ডিন কিনক্লিন উদ্যানের একটী সজীব সৌন্দর্য্য।

এই জাতীয় গোলাপের গাছ টব অপেক্ষা ভূমিতেই ভাল হইয়া থাকে। টবে গাছ বসাইতে হইলে টব বড় করা আবশ্যক। মৃত্তিকা ও পাইটের গুণে ফুলের আকার ছোট ও বড় হইয়া থাকে। ইহার ফুলের আকার মধ্যম রকম। পাঁপড়ী অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। গাছের পাইট ও কলমাদির নিয়ম অন্যান্য গোলাপের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

পিচ।

আসামের অন্তঃপাতী গোহাটীর সিবিল সার্জন ডাক্তরকে, এম. স্কাট সাহেব যে প্রণালীতে পিচবৃক্ষ রোপণ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছিলেন। উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিদিগের সেই প্রণালী অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধে আমরা ভারতবর্ষীয় এগ্রিকলচার সোসাইটীর জর্নেল ৪র্থ খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় লিখিত স্কাট সাহেবের পত্র খানি এস্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

স্কাট সাহেবের পিচগাছে ৬০টী পিচ ফলিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪টী ফল অতি বৃহৎ আকারের হইয়াছিল। তাহাদের ওজন তিরাশী ভরি বার আনা, আর ৬টীর আকার মধ্যম, তাহাদের ওজন ১০৪৷৷০ ভরি হইয়াছিল। অপরগুলির মধ্যে এক একটী ১২৷১৪ ভরির ন্যূন এরূপ ফল অল্প ছিল। অধিকাংশ ফলের বেড় ৯ইঞ্চ হইতে ১০৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

স্কাট সাহেব লিখিয়াছেন, আমি পিচ গাছ রোপণ করিবার জন্য অকটোবর মাসে ৬ বা ৮ ফিট ইস্কোয়ার এবং ৪ফিট গভীর করিয়া একটী গর্ত্ত কাটিয়াছিলাম। এবং মেষের বিষ্ঠা ও গোবর একত্র করিয়া তাহার সঙ্গে কাষ্ঠের কয়লা মিশাইয়া সার প্রস্তুত করি, এবং সেই সার দিয়া ১২ইঞ্চ পর্য্যন্ত ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করি, পরে তাহার উপর দশ সের ছোট মাছ ফেলিয়া

দিয়া উপরে প্রায় এক সের চূণ দিয়াছিলাম। ঐ চূণের উপর পুনর্ব্বার গোময়, ভেড়ার বিষ্ঠা, কাষ্ঠের কয়লা ও ছাই একত্র করত গর্ত্ত পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সার ও তাহার উপর ছোট মাছ এবং চূণ ক্রমে ক্রমে দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ হইলে উপরে মাটি দিয়া চাপা দিয়াছিলাম। গত বৎসর জমি প্রস্তুত করিবার সময় সারের সঙ্গে কিছু খইল মিশাইয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। পুরাতন চামাড়া, এবং হাড় কুচি কুচি করিয়া ভেড়ার বিষ্ঠা, গোবর এবং চূণের সঙ্গে মিশাইয়া ছয় বা আট মাস মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে যে সার হয় অন্যান্য সারের সঙ্গে তাহা যোগ করিয়া দিলে যথেষ্ঠ উপকার হয়। অপর নবেম্বর মাসের শেষে অথবা যখন কুঁড়ি হইতে আরম্ভ হয় তখন গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং গাছের গুঁড়িরপাশে আড়াই ফিট পর্য্যন্ত নীচে যে সকল শিকড় থাকে তাহা সূঁচল বাঁশ দ্বারা ছেঁদা করিয়া দিতে হয় কিন্তু শিকড় সকল যেন ছিঁড়িয়া না যায় তদ্‌পক্ষে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনন্তর মাটি খুলিয়া দিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিকড় সকল আল্‌গা রাখিতে হইবে। তাহার পর পূর্ব্বোল্লিখিত পোঁতা সারের সঙ্গে কিছু কাঠের কয়লা মিশাইয়া ঐ শিকড়ের মধ্যে দিবে এবং যে মাটি শিকড় খুঁড়িতে তোলা হইয়াছিল, তাহা উপরে আল্‌গা করিয়া ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর যখন পিচ ধরিতে আরম্ভ হইবে, তখন কতকগুলি ভাঙ্গিয়া পাতলা করিয়া দিবে এবং ফল পাকিবার পূর্ব্বে পোকা না ধরে এজন্য উপরে থোলিয়া চাপা দিবে।”

পিচ বীচি ও কলম হইতে দুই প্রকারে চারা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কলমের চারাই উৎকৃষ্ট। বীচের চারা বাহির হইতে অনেক সময় অপেক্ষা করে এবং সর্ব্বদা জল দিতে হয়। ইহার বীচি অত্যন্ত কঠিন, তজ্জন্য আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্কুর নির্গত হইতে অধিক সময় লাগে। আমের চারার সহিত যেমন আমের শাখার কলম বাঁধিতে হয়। পিচেরও সেইরূপ কলম প্রস্তুত করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে একবার গাছে ফল ধরিয়া থাকে। এক একটী গাছে প্রচুর ফল হয়। লিচু গাছ অপেক্ষা পিচের গাছ কিছু ছোট হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসেই ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। পিচ নানা জাতীয়, তন্মধ্যে পিচম্নলতানি, এমিন, এবং ঢাকাই এই তিনিই প্রধান।

আনারস ।

আনারস অতি সুখাদ্য ফল। অম্লমধুর আস্বাদন জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। সকল জাতীয় আনারসের সমান অস্বাদন নহে। কোন কোন আনারস অত্যন্ত মধুর কোন কোন জাতীয় তীব্র অম্লবিশিষ্ট। গাছের সুপক্ক ফল অত্যন্ত সুখাদ্য। রোগবিশেষে উহা পথ্যের কাজ করে। কৃমি প্রভৃতি রোগে আনারসের পাতা ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের সকল প্রদেশই প্রায় আনারস জন্মিয়া থাকে। ইহার চাসে বিশেষ রূপ পরিশ্রম কিম্বা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয় না। সামান্য যত্ন করিয়া বাড়ীতে রোপণ করিলে প্রচুর ফল লাভ করা যায়। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই কয়েক মাস অধিক ফল ধরিয়া থাকে। অন্যান্য সময়ও সামান্য রূপ ফলিয়া থাকে। কিন্তু সময়ের ফলের ন্যায় অসময়ের আনারস তত সুস্বাদু হয় না। এক একটী গাছে এক একটী ফলের অধিক আনারস ধরে না। কলাগাছের ন্যায় প্রত্যেক গাছের মূল হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে। সুতরাং এক বার আবাদ করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে গাছ থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পুরাতন গাছ মারিয়া নূতন চারা রাখিতে হয়। প্রাচীন গাছ নিস্তেজতা বশতঃ ফল ভাল হয় না।

বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়েই আনারসের গাছ পুঁতিতে পারা যায়। কিন্তু বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে রোপণই প্রশস্ত। পুরাতন গাছের গোড়া হইতে যে চারা নির্গত হয় তাহা কিম্বা আনারসের যে মুখ হইতে পুচ্ছের ন্যায় শিশ বাহির হইয়া থাকে, সেই মুখে শিশসমেত ফলের কিয়দংশ কাটিয়া রোপণ করিলেও গাচ হইতে পারে। ছায়াযুক্ত স্থানে উৎকৃষ্ট আনারস হইয়া থাকে। বাগানের ধারে ধারে অনেকেই গাছ রোপণ করে। গাছের কোনরূপ পাইট করিতে হয় না। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই আনারস হইয়া থাকে কিন্তু সকল মৃত্তিকায় ফলের আস্বাদন সমান হয় না। নীরস মৃত্তিকা অপেক্ষা স্যাঁতা স্থানে আনারস ভাল হয়। ফলতঃ মৃত্তিকা ভেদে ফলের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকার এবং আস্বাদনেরও তারতম্য হইয়া

থাকে। আর্দ্র স্থানে প্রচুর ফল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু খাইতে তত সুস্বাদু হয় না। বেলে মাটিতে গাছ রোপণ করিলে ফল অল্প ধরিয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত সুখাদ্য হয়। আনারস ক্ষেত্রে সর্ব্বদা গমনাগমন করিলে ফল ধরার ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

আনারস নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আনারসের গায়ে আদৌ চোক নাই, কোন কোন জাতি দেখিতে সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট। আটমাথা নামে এক জাতীয় আনারস আছে, তাহা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। যত প্রকার আনারস আছে, তন্মধ্যে চিনের আনারস অত্যন্ত মধুর।

শস্যের পর্য্যায়াবর্ত্তন।

বাণিজ্য এবং কৃষিই অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। ভারত বাসীগণ এই দুইটীর মধ্যে কোনটীই যত্ন সহকারে উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন না; তাঁহারা ধনোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ উপেক্ষা করিয়া পরের অধীনতা স্বীকার করিতে ভাল বাসেন। যদি তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহা হইলে আর শত শত পরিবারকে দারিদ্র রাশিতে পরিবেষ্টিত দেখিতে হয় না। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে উর্ব্বরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দেশ অন্যান্য দেশের শস্যাগার। বর্ষে বর্ষে এখান হইতে অপরিমেয় শস্য অপরাপর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের দেশের কৃষকগণ সততই বলিয়া থাকে পূর্ব্বের মত আর ভূমি সকল উর্ব্বরা নহে বস্তুতঃ ক্রমশঃই ভারত ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হইতেছে। কৃষকগণ কৃষিতত্ত্বজ্ঞ নয় বলিয়াই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহে। যাঁহারা আজ কাল রসায়ণ এবং কৃষিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যোপযোগী উপাদান সকলও ভাল নহে। তাহাদেরও কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন নিতান্ত আবশ্যকীয়। কৃষকদিগের অজ্ঞতা এবং উপাদান গুলির অপকৃষ্টতাই শস্য হ্রাসের প্রধান কারণ।

এক্ষণে দেখা যাউক মৃত্তিকাতে কোন্ কোন্ উপাদান বস্তু থাকিলে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মাইতে পারে। রসায়ন তত্ত্ব এবং উদ্ভিদ তত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিতগণ বৃক্ষাদির ধ্বংশাবশেষ পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, যে মৃত্তিকাতে বালুকা, কর্দ্দম, পটাস্ এবং উদ্ভিদের ধ্বংশাবশেষ আছে সেই মৃত্তিকাই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে। প্রায় সকল ভূমিতে এই কয়টী উপাদান নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কোন ভূমিতে পূর্ব্বোক্ত উপাদান গুলির মধ্যে কোন একটীর ন্যূনাধিক্যের তারতম্য বিশেষ বিশেষ জাতীয শস্যের উপর নির্ভর করে। কোন পাত্রে পূর্ব্বোক্ত উপাদান গুলি জলে মিশ্রিত করিযা যদি তাহাতে একটী উদ্ভিদ্ কিছুদিনের জন্য রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ উদ্ভিদ সকল উক্ত উপাদান সমান পরিমাণে গ্রহণ করে নাই। যে টী ঐ জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনেব অধিকতব সহায়তা করে সেইটী অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে উদ্ভিদ্ গণও অন্য অন্য জীবের ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুষ্টিসাধক দ্রব্য বাছিয়া লইতে পারে। যদি সকল উদ্ভিদই একটী উপাদান অধিক পরিমাণে লইত তাহা হইলে শীঘ্রই উহার নিঃশেষ হইত এবং ভূমির কিছুমাত্র উর্ব্বরতা শক্তি থাকিত না।

কিন্তু উদ্ভিদের জীবন এতাদৃশ যে,যে উপাদানটী এক জাতীর পুষ্টিসাধক সেটী অপর জাতীর প্রাণনাশক সুতরাং যদি আমরা এক ভূমিতে ক্রমশঃই এক জাতীয় শস্য উৎপাদন করিয়া থাকি তাহা হইলে অবশেষে সেই ভূমি আর সেই শস্য উৎপাদন করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। কৃষকগণ এই সকল বিষয় জানে না সুতরাং তাহারা বলিয়া থাকে যে ভূমির আর পূর্ব্বের ন্যায় উর্ব্বরতা শক্তি নাই।

এইরূপ অনর্থ নাশের উপায় কি নাই? দুইটী উপায় আছে, ১ম নানা জাতীয় শস্যের পর্য্যায়াবর্ত্তন ২য় ভূমিতে সার প্রদান। পাঠক গণ মনে করুন ধান্যাদি বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকাতে আলু, পটাস মিশ্রিত মৃত্তিকাতে, মুগ কলাই ইত্যাদি চূণ মিশ্রিত মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রায় সকল ভূমিতেই সকল উপাদানই

বর্ত্তমান থাকে তবে কোনটীর ভাগ অধিক আর কোনটীর অল্প। যদি এক ভূমিতে প্রতি বৎসরই ধান্যের চাস করা যায় তাহা হইলে কএক বৎসর পরেই বালুকার অংশ হ্রাস হইবে সুতরাং ঐভূমিরত ধান্য আর ভালরূপ জন্মিবে না। কৃষকের ক্রমশঃই অর্থ নাশ হইতে থাকিবে। পূর্ব্বে যে ভূমিতে ধান্য রোপণ করা যাইত এক্ষণে যদি সেই ভূমিতে আলুর চাস করা যায় তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে আলু পওয়া যাইবে। কয়েক বৎসর পরে আলুর পরিবর্ত্তে মুগ কলাই ইত্যাদি ঐ ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে। পূর্ব্বে যে যে উপাদান এক কালে নিঃশেষ হইয়াছিল সেই সেই উপাদান বৃষ্টির জল দ্বারা পুনরায় সঞ্চারিত হয়। যে পর্য্যন্ত ধান্যের মূল সঞ্চালিত হইয়াছিল সেই গভীরতা পর্য্যন্ত বালুকার ভাগ অল্প হয় কিন্তু তাহার নিম্ন প্রদেশে বালুকাংশের হ্রাস নাই। বৃষ্টিদ্বারা ভূমির উপরিভাগ ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং পূর্ব্বে যে ভাগটী নীচে ছিল তাহা এক্ষণে উপরিভাগ হইতেছে। সুতরাং কয়েক বৎসর পরে যে ভাগে পূর্ব্বে ধান্যের মূল সঞ্চালিত হয় নাই সেই ভাগটী উপরিভাগ হইবে। এই ভাগে বালুকাংশের অনল্পতা প্রযুক্ত এক্ষণে পুনরায় ধান্যের চাস ভাল হইবে। এই রূপে যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরের পর্য্যায়ক্রমে শস্যের পুনরাবর্ত্তন করা যায় তাহা হইলে কৃষকের লাভের সীমা থাকে না। আমাদের দেশের কৃষক গণকে যদি কেহ এরূপ কথা বলেন তাহা হইলে তাহারা ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে। কিন্তু যদি কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি দেখাইতে সযত্ন হন তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সেই নিয়ম অনুকরণ করিবে।

কোন কোন দেশে কৃষকগণ স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা কেবল একজাতীয় শস্য উৎপাদনের জন্য কিয়দংশ ভূমি কর্ষণ করে আর কিয়দংশ কয়েক বৎসরের নিমিত্ত অকর্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া রাখে; প্রথমাংশ ভূমির উপাদান নিঃশেষিত হইলে অপর অংশ কর্ষণ করে এবং প্রথমাংশ অকর্ষিতাবস্থায় রাখিয়া দেয় এই নিয়মে চাস করিলে কৃষকের অনেক ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ যেখানে ভূমির কর অধিক সেখানে কোন ক্রমেই এই রূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত ২ য় উপায়টী অনায়াসে অবলম্বন করা যাহাতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকগণ কতকগুলি কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের অনিষ্ট আপনারাই সাধন করিতেছে।

পূর্ব্বে আমি এক জন কৃষককে ভূমিতে কিছু পরিমাণে চুণ দিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম সে আমায় বলিল "তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, জান না ভূমিতে চুণ দিলে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়"। ভূমিতে যবক্ষার জান সংবলিত উপাদানের অভাব হইলে গোময়াদি প্রদান করিলে ঐ অভাব দূর হয়। চীন দেশ বাসিরা অতি প্রাচীন কাল হইতে নগরের মল মূত্রাদি একাত্রীকরণে বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়াছে এবং সেই জন্যই কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ব্রীটন বাসিগণ পূর্ব্বে ঐ সকল দুর্গন্ধ পূরিত দ্রব্য সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যাইতেন কারণ তখন তাঁহারা তাহার মূল্য বুঝিতেন না। পরে তাঁহারা চীন দেশের লাভ দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ করেন। এক্ষণে তাঁহারা কৃষিকার্য্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমরা কিছুই ভাল অনুকরণ করিতে পারিলাম না যেটী মন্দ সেইটী আগে অনুকরণ করিতে সযত্ন হই। আমরা যদি পশুপক্ষীর মলাদি ভূমিতে প্রদান করি তাহা হইলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অস্থি পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ভূমিতে প্রদান করিলে ফস্ফরকীয় দ্রব্যের অভাব মোচন হইবে। ভূমিতে কলাই, মসূর অড়হর মুগ ইত্যাদি উৎপাদিত হয় সেই ভূমিতে মধ্যে মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে চুণ দিলে ঐ সকল শস্য অধিক পরিমাণে জন্মিবে। পাঠকগণ আমার বক্তব্য এই যে যদি আপনারা স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া কৃষির উন্নতি দেখাইতে পারেন তাহা হইলে ভারতের চিরভূষণ কৃষকগণও আপনাদিগকে অনুকরণ করিবে। যদি তাহা করিতে কুণ্ঠিত হন তবে কৃষকগণকে অন্ততঃ কিছু কিছু করিয়া শিক্ষা দিবেন। তাহারা যখন এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে তখন তাহারা সহজেই অগ্রবর্ত্তি হইবে।

শ্রীকান্তি ভূষণ ঘোষ
হুগলী কলেজ।

তিল।

তিল শর্ষপ প্রভৃতি কয়েক প্রকার শস্য হইতে তৈল পাওয়া যায়। তৈল আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তু, রন্ধন, মর্দ্দন প্রভৃতি আমাদের অনেক কার্য্য তৈল দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা পাঠকগণের নিকট তিল চাসের বিষয় অবতারণা করিব। অতি অল্প পরিশ্রমে ও অল্প ব্যয়ে তিলের চাস হইতে পারে; অথচ ইহাতে লাভও নিতান্ত কম নহে। তিল প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিতে পারে। ধান্যাদি কাটা হইলে পর ফাল্গুন মাসে, অথবা চৈত্র মাসের প্রথমে জমিতে জল সিঞ্চন করিয়া, জমির মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে থাকিতে এক দিনেই ২।৩ টা চাস প্রথমে দিয়া তিল বীজ বপণ করিতে হইবে। তিল বীজ বপণ করিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে (বিঘা প্রতি দুই সেরের হিসাবে) তিল বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, এবং বপণ করিবার দিন তিলবীজ গুলি জল হইতে তুলিয়া, ঘুঁটের ছাই মাখাইয়া বপণ করিতে হয়। ঘুঁটের ছাই মাখাইবার কারণ এই যে, তিল বীজ কিছু কিছু অন্তরে বপণ করিতে হয়, ঘুঁটের ছাই না মাখাইলে এক স্থানে অধিক তিল বীজ পড়িয়া অধিক চারা বাহির হইয়া থাকে। তিলের চারা ঘন হওয়া ভাল নহে, এক একটী চারা অন্য একটী চারা অপেক্ষা এক হস্ত, দেড় হস্ত অন্তর থাকা আবশ্যক। এরূপ হইলে তিল গাছ গুলি বিলক্ষণ বৃহৎ ও ফলশালী হয়। জমিতে ঘন চারা বাহির হইলে, চারাগুলি মোটেই বর্দ্ধিত ও ফলশালী হইতে পারে না। যে জমিতে তিল চারা ঘন বাহির হইবে, তাহার কতক চারা নিড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিঞ্চিৎ আর্দ্র জমিতে চাস দিয়া তিল বীজ বপণ করিলে, জল সিঞ্চন ব্যতিরেকে চারা বাহির হইয়া থাকে। শুষ্ক জমিতে চাস দিয়া তিল বীজ বপণ করিলে, জল সিঞ্চন ব্যতীত চারা বাহির হয় না।

চারা বাহির হইবার পর ৮।১০ দিন মধ্যে বৃষ্টি না হইলে, জল সিঞ্চন

করিয়া একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে, বড এক খানা জল সিঞ্চনের আবশ্যক করে না। যদি মোটেই বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ১০।১৫ দিন অন্তর ২।১ বার জল সিঞ্চন করিয়া, নিড়াইতে হয়। নিড়াইবার সময় জমির মৃত্তিকা কোদালির দ্বারা উল্টাইয়া দিতে হয়। তিল চাসের আর এখানে অন্য কোন পাইট করিতে হয় না। বৈশাখ মাসের শেষ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে তিলের ফুল ধরিবার সময়। সে সময়ে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে জল সিঞ্চন বিশেষ আবশ্যক। এরূপ করিলে গাছগুলি অধিক ফলশালী ও তিল গুলি বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিলের সুঁটী গুলি বিলক্ষণ পক্ক হইলে, তিল গাছের গোড়া কাটিয়া, গাছগুলি গৃহে আনিয়া গাদা দিয়া ৪।৫ দিন রাখিতে হয়। যখন তিল গাছের পাতা গুলি গাদার গাছ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন গাছ গুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিলে, সুঁটি হইতে তিল বাহির হয়। এই সময়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত তিলগাছের গাদাদিতে ও গাছগুলি শুষ্ক করিতে হইবে। তাহা না করিলে ভিতর কার শস্য পাকিয়া ভুয়া তিল হইয়া থাকে। কৃষকের অসাবধানতা দোষে অনেকেরই তিল ভুয়া হইয়া থাকে।

জমিতে উত্তম রূপ তিল জন্মিলে বিঘাপ্রতি ১৪।১৫ মণ তিল হইতে পারে একমণ তিলে ১১।১২ সের তৈল হইয়া থাকে, তিলের মূল্যানুসারে তিলের ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি অভাব পক্ষে ২৲ টাকা করিয়া ও তিলের মণ ধরা যায়, তাহা হইলে ও প্রত্যেক বিঘায় প্রায় ৩০৲ টাকার ফসল পাওয়া যায়। ৪।৫ টাকা খরচ করিলেই একবিঘা জমিতে তিলের আবাদ হইতে পারে। খরচ বাদে প্রত্যেক বিঘায় ২৫৲ টাকা করিয়া লাভ হইতে পারে। কলুদের নিকট তিলের পরিবর্ত্তে তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে তৈলের জন্য পয়সা হাতে করিয়া, আর বাজারে যাইতেও হয় না। একবিঘা জমিতে যে তিল জন্মে তাহার পরিবর্ত্তে যে তৈল পাওয়া যায়, এক একটী গৃহস্থের প্রায় তদ্দারা দুই বৎসরের আবশ্যকীয় তৈল পাওয়া যায়। এরূপ লাভ সত্তেও যে কৃষকেরা তিল চাসে মনোযোগী হয় না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। (ক্রমশঃ)

কৃষি ব্যবহার্য্য পশু।

অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্‌গবং জীবিতার্থিনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং।

কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেখা উচিত তাহার কোন্ কোন্ অঙ্গে কি কি দোষ আছে। এবং সেই সেই দোষ প্রতীকার করা সাধ্যায়াও কি না। কৃষি সম্বন্ধে দোষ বিচার করিতে হইলে উহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক, অর্থাৎ ভূমি, সার, বীজ, জল বায়ু, কৃষি-ব্যবহার্য্য অস্ত্র ও পশ্বাদির বিষয় বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা উচিত। কারণ যখন ঐ সকল পদার্থের উপর কৃষির জীবন ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তখন তদ্‌সমুদায়ের মূলে কি কি দোষ আছে তাহা অবগত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দিন দিন দেশের যেরূপ দুরবস্থা হইতেছে, অন্ন কষ্ট যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে কৃষির উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে সংসার নির্ব্বাহ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। এ প্রস্তাবে কৃষি ব্যবহার্য্য পশুর বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রস্তাব উপসংহার করিব। এবং অন্যান্য বিষয় অবসর ক্রমে প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

গবাদি পশু দ্বারা আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল পশু দিন দিন যেরূপ হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তদ্দ্বারা কৃষি কার্য্যের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়া আসিতেছে। এ দেশে যত প্রকার পশু আছে, তন্মধ্যে গোজাতি দ্বারা সংসারের যে রূপ উপকার হয় অন্য পশু দ্বারা তাহার সহস্রাংশের এক অংশ হয় কি না সন্দেহ। গো জাতি মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারী এজন্য প্রাচীন শাস্ত্র-কারেরা তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তর বিধি দিয়া গিয়াছেন। একাল পর্য্যন্ত সেই সকল বিধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে গোজাতির প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদ্‌ব্যবহার আর দেখা যায় না। গো সমূহের উন্নতি কল্পে বৃষোৎসর্গের যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আর সুসিদ্ধ হয় না।

এখন বৃষ সমূহ মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক ময়লা বাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় বৃষ সমূহ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং এখন আর হৃষ্টপুষ্ট বলীবর্দ্দ দ্বারা গো বৎস উৎপাদন করার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইয়া উঠিয়াছে। গো সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারাদি প্রাপ্ত হয় না। গো শালা সকলের অবস্থা অতি শোচনীয়। গো জাতির স্বাস্থ্যের প্রতি কোন রূপ দৃষ্টি রাখা হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় দেশমধ্যে গোজাতির চরিবার মাঠ পতিত থাকে না যে তাহারা স্বচ্ছন্দে তথায় ভ্রমণ এবং আহার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। গো জাতির অবনতির সহিত কৃষির ও যে অধোগতি হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় কৃষির দোষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় এগ্রিকল্‌চার্ সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত জেমস্ গিবন্ সাহেব বলিয়াছিলেন, "কৃষিকর্ম্মের অপর একটী দোষ এই যে কৃষকেরা গবাদি পশুর আহারার্থে বিশেষ কোন ঘাস উৎপাদন করে না। নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভূমিতে যে সকল ঘাস জন্মে তাহাই পশু দিগকে খাইতে দেয়। যদি এতদ্দেশীয় পশুদিগকে উত্তম আহারের উপায় করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অল্প পশু দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব গবাদি পশুর ভক্ষণার্থ ঘাস উৎপাদন করিয়া ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেওয়া অথবা ঘাস কাটিয়া আহারের উপায় বিধান করা, গো শালায় বিচালী বিছাইয়া দেওয়া এবং তাহা গোমূত্রযুক্ত হইলে সারের জন্য ব্যবহার করা, এদেশে যত প্রকার ঘাস আছে তাহার উপকারিতা নির্ণয় করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং যে সকল দেশের জল বাতাস, দেশীয় জল বায়ুর তুল্য তদ্দেশীয় ঘাস আনাইয়া দেশ মধ্যে রোপণ করা অতীব আবশ্যক।" বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় পূর্ব্বাপেক্ষা গোজাতি যে ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই অবনতির অনেকগুলি কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৃষোৎসর্গের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হওয়াতে দুর্ব্বল বৃষ দ্বারা গোবৎস উৎপাদন হওয়াতে উহারা দিন দিন খর্ব্বকায় ও নিস্তেজ এবং অধিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। গাভী সকল উপযুক্ত পরিমাণে আহার না পাইয়া অধিক দুগ্ধ দিতে পারে না। দুগ্ধ লোলুপ ব্যক্তিগণ এরূপ করিয়া দোহন করে যে গোবৎস শরীর রক্ষার্থে

আবশ্যকীয় দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় না সুতরাং বাল্যকাল হইতেই বৎস সকল আহারাভাবে শীর্ণ হইতে থাকে। এই রূপে গোজাতি একে নিস্তেজ, ও দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আবার বিজাতীয জঠরানল খাণ্ডব দাহনের ন্যায় তাহাদিগকে ধ্বংশ করিতেছে। এক দিকে আহারাভাবে দুর্ব্বল নিরীহ গো সমূহ সামর্থের অধিক পরিশ্রম করিয়া হীন পরামাযু হইতেছে অপরদিকে পরমায়ু থাকিতেও অকালে অনেক পশু যমসহোদরদিগের গ্রাসে কবলিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে গো সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

কৃষির উন্নতি সংকল্পে অনেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইংলণ্ড হইতে বলবান গোরু আনাইয়া এদেশে চাস করিলে বিস্তর উপকার হইতে পারে। এতদ্ সম্বন্ধে গিবসন সাহেব সোসাইটীতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার স্থূল বিবরণ পাঠকবর্গের গোচরার্থে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

" ইয়ুরোপীয বলদের সঙ্গে এতদ্দেশীয বলদেব এই বিভিন্নতা যে এদেশীয় বলদের ঝুঁট আছে এবং দীর্ঘে ইয়ুরোপীয় বলদ অপেক্ষা পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছোট। কিন্তু এদেশে যে প্রণালীতে কৃষি কার্য্য সাধিত হইযা থাকে, যদি গো জাতিকে কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর দ্রব্য আহাব করিতে দেওয়া যায়, তবে দেশীয় বলদ সমূহ এই দেশের নিমিত্তই উপযুক্ত বোধ হয়। অতি গ্রীষ্ম সময়ে ও দেশীয় গো সমূহ অধিক পরিশ্রম কবিতে পাবে। এবং শিক্ষা দিলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেব গোরু অপেক্ষা ইহারা অত্যন্ত চালাক বোধ হয। এতদ্দেশীয গোরুর প্রধান দোষ এই যে অল্প দুগ্ধ দেয়, কিন্তু ভাল দ্রব্য প্রচুরাধিক পরিমাণে আহারের ব্যবস্থা ভিন্ন তাহাব প্রতীকার হওযা সুকঠিন। ইহাদিগের আহাব জন্য যৎসামান্য যে বিচালী দেওয়া হইযা থাকে, তাহা খাইয়া অন্য কোন দেশীয় গোরু হইলে বাঁচিতই না। যদ্যপি ইংলণ্ডীয় বৃষ দ্বারা দেশীয় গাভীর বৎস উৎপাদন করা হয, তাহা হইলে উক্ত দোষ সমূহ দূরীভূত হইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষাতে দেখা গিযাছে যে দেশীয় বৃষেব সঙ্গে ইংলণ্ডীয় গাভীর পাল দেওয়া অপেক্ষা, দেশীয গাভীর সহিত ইংলণ্ডীয বৃষেব পাল দেওযাতে যে গোরু জন্মে তাহার অধিক দুগ্ধ হয়। দেশীয় গোরুর দুগ্ধ অত্যুত্তম তাহাতে অধিক মাখন জন্মে।

শ্রীযুক্ত কর্ণেলস্কিনর সাহেব সোসাইটীতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন " যে উত্তর বা পশ্চিম প্রদেশ বা মহীসুর হইতে উত্তম উত্তম বৃহৎ বলদ আনাইয়া এতদ্দেশে ব্যবহার করা অতিশয় কঠিন বরং অসাধ্যই কহা যাইতে পারে, সরকারী কার্য্যার্থে অথবা পরীক্ষার্থে বাঙ্গালা দেশে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বলদ আনীত হইয়াছিল, তদসমুদায় ক্রমে ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদিও কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে সাহেবদিগের গাড়ীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বড বড বলদ দেখা যায়। কিন্তু কিছু দিন পরে তাহারাও খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইতে দেখা গিযাছে। ঐ সকল গোরু আনাইযা এ দেশে চাস আরম্ভ করিলে আপাততঃ লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কোন প্রকার স্থাযী লাভের আশা করা যাইতে পারে না। আমরা বোধ করি যে বঙ্গদেশের জল, বাতাস রাস্তা ও নিরন্তর কৃষি ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র বলদ অতি উপযুক্ত। সকলেই অবগত আছেন যে অনেক ঘণ্টা ব্যাপিযা কামান আকর্ষণের অতি ক্লেশজনক কার্য্যে বঙ্গদেশের এই ক্ষুদ্র চালাক বলদ দ্বারা পশ্চিম প্রদেশেও বিলক্ষণ ফল দর্শিযাছে। বঙ্গদেশীয় গোজাতির আর কোন রূপ উন্নতি হইতে পারে না ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের বিবেচনায় বিদেশীয় বৃষের সহিত পাল দেওয়াতে গোজাতির উন্নতি সাধিত হইবে না। কিন্তু স্নেহ পূর্ব্বক ঐ অশ্রান্ত বলদের রক্ষণাবেক্ষণেতে এবং বিচালী অপেক্ষা উত্তম ও শক্তিজনক দ্রব্য আহারের উপায় করিয়া দিলে, ইহাদিগের দ্বারা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমাদের এই বিশ্বাস সোসাইটী বাহুল্য রূপে উত্তম উত্তম বিশেষতঃ গিনি ঘাস ও পশুর অন্যান্য আহারীয ঘাসের বীজ দেশান্তর হইতে আনয়ন করিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ করিলে ভাল হয।

আমরা যে সকল পরীক্ষার বিষয উল্লেখ করিলাম, তাহা সরকারি ব্যয়ে হইয়াছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন নহে মালেট নামক জনৈক সাহেব দেশীয় সাধারণ কৃষির উৎকর্ষ সাধন জন্য নানা প্রকার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল চেষ্টা প্রায় বিফল হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে দৃষ্ট কর্মতা ব্যতিরেকে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সফল

যত্ন হইতে পারে না। যে কোন দেশের কৃষির উন্নতি কল্পে পরামর্শ দান সহজ বটে কিন্তু অতি শয় নৈপুণ্য, সদ্বিবেচনা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং দেশীয় অবস্থা সুন্দররূপ বোধ না থাকিলে সুপরামর্শে কার্য্য সফল করা অতি কঠিন ”

বঙ্গ দেশের মৃত্তিকার যে রূপ অবস্থা, তাহাতে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভূমি কর্ষণ জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না তথায় কঠিন মৃত্তিকা কর্ষণ জন্য অশ্বদ্বারা হল চালিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গোজাতির খাদ্যের ভাল রূপ উপায় করিয়া দিলে তাহাদিগের দ্বারা কৃষি কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গো জাতির আহারের পক্ষে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। পতিত ভূমি না থাকাতে তাহারা স্বাধীনভাবে আহার গ্রহণ করিতে পারে না, যদিও দুই এক স্থানে তৃণ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু দেশ মধ্যে পাউণ্ডের সৃষ্টি হওয়াতে কেহই গোরু ছাড়িয়া দিতে সাহসী হয় না, মনুষ্য দিগের পক্ষে নবাবী আমলের "বৈকুণ্ঠে বাস" "অন্ধকূপ" প্রভৃতি যেমন ভয়ানক নরকস্থান এবং কষ্টের জীবন্ত দৃষ্টান্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ সভ্যতার মধ্যে মফস্বলস্থ পাউণ্ডগুলিও গোজাতির পক্ষে সেইরূপ ক্লেশকর। মনুষ্য-দিগের খাদ্যের ন্যায় গো জাতির খাদ্যও দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গৃহস্থেরা যখন আপন আপন উদর পূর্ণ ও পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ তখন যে গোসমূহকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিতে সক্ষম হয় ইহা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা স্বচক্ষে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখি-য়াছি পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট সুশ্রী গোরু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গো সমূহ যে আহারাভাবে শীর্ণ ও হীন পরমায়ু হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। কারণ বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গবাদি পশুর মধ্যে বাল্য বিবাহ সুরাপান, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার কঠিন চিন্তা প্রভৃতি বলবীর্য্য এবং পরমায়ু নাশের বিষ প্রবেশ করে নাই যে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে অবনত করিতেছে। দেশের জলবায়ুর দোষে যে অন্যান্য স্থানের গো সমূহ অপেক্ষা বাঙ্গালার গোরু অনেকাংশে হীনাবস্থাপন্ন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু যখন এই জল বায়ু প্রভৃতি উপাদানে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এত দিন পর্য্যন্ত গাভী

সকল দুগ্ধবতী, বৃষ সমূহ শ্রমক্ষম এবং বলবান ছিল, কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই যে সেই জল বায়ু এত অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। আমরা দেখিতেছি ইংরাজী সভ্যতা যে সময়ে এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সময় হইতেই দেশ মধ্য কি মনুষ্য কি গবাদি পশু সকলেরই খাদ্য দিন দিন মহার্ঘ্য হইয়া এই অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে যে পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে তো সমুদায় উপন্যাসের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দেশে টাকায় আট শের তণ্ডুল, সাতআট সের ঘৃত, এক মণ দুগ্ধ বিক্রীত হইত, সেই দেশে আট টাকা চাউলের মণ, আটসেরের স্থানে এক সের ঘৃত, এক মণের স্থানে পাঁচ ছয় সের দুগ্ধ বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে গোজাতির খাদ্যের মূল্য ছিল না বলিলেও বড় দোষ হয় না। বিজাতী সভ্যতার কি মাহাত্ম্য দেশ না অন্ন না বস্ত্র, নচ বারি পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির জীবন স্বরূপ যে গো জাতি আহারাভাবে দিন দিন হীন দশাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, বলবীর্য্যের নিদান উপাদেয় যে দুগ্ধ ঘৃত তাহার আস্বাদন হইতে বাঙ্গালি রসনা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইতেছে। গোহত্যার যে মহা পাপ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত তাহা চির দিনের জন্য রুদ্ধ হইতেছে, ভারতে কত দানব, কত পিশাচ, কত রাক্ষস বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু গো জাতির প্রতি কেহ কখন কোন প্রকার অনিষ্ট করে নাই।

গো জাতির ন্যায় মহিষ দ্বারাও কোন কোন স্থানে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন হয়। গোরুর ন্যায় মহিষ ও সমাজের অনেক মঙ্গল কার্য্য করিয়া থাকে। সচরাচর মহিষে দশ বার সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। গোরুর দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধ অতি ঘন ও তেজস্কর। এবং উহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ বিহারে বর্ষা কালে ধান্য ভূমি প্রস্তুত করিতে মহিষ দ্বারা হল চালিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মেতে মহিষের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ভাল করিয়া পরিশ্রম করিতে পারে না। এজন্য কৃষকেরা সর্ব্বদা মহিষের গায়ে জল দিয়া থাকে। গোজাতি যেমন গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে, প্রখর রৌদ্রেও পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয়, মহিষে তাহা পারে না। গোরুর ন্যায় মহিষ চালাক নহে। এই উভয় পশুর বলের তুলনা করিলে যদিও গো অপেক্ষা

মহিষের শক্তি অধিক কিন্তু উহারা গো জাতির ন্যায় অল্প আহারে পরিতৃপ্ত হয়, এমন কি কেবল মাত্র উলুঘাস খাইয়াও জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মহিষের দ্বারা কৃষি কার্য্যের বিস্তর উপকার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সমধিক দুঃখের বিষয় প্রতিবৎসর পূজা উপলক্ষে এই উপকারী নিরীহ পশুর জীবন নষ্ট করা হইয়া থাকে। কৃষি কার্য্যে মেষের বিষয় এদেশে কোন পরীক্ষা করা হয় না।

ইংলণ্ডে এই পশুর বিষ্ঠায় ক্ষেত্রে সারের কার্য্য হইয়া থাকে। তথায় এই সারে বিস্তর উপকার হইয়া আসিতেছে। এদেশেও ঐ সার ব্যবহৃত হইলে সমধিক উপকার হইতে পারে। সার সম্বন্ধে ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় নানা দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পশু সারের মধ্যে কেবল গোবরের সার গৃহীত হয়। ফলতঃ কৃষিকার্য্যে গোজাতির ন্যায় উপকারী পশু আর দ্বিতীয় নাই। অতএব উহাদিগকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। দুর্ব্বল গোরু দ্বারা বহু পরিশ্রম জনক কৃষি কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত উহাদিগকে প্রতিপালন করা উচিত।

এদেশে গো শালা সমূহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে প্রণালীতে উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাতে সুচারু রূপে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। রাত্রিকালে গো সমূহের শয়নের নিমিত্ত বিচালী প্রভৃতি কোন প্রকার তৃণাদি পাতিয়া দেওয়ার রীতি নাই। গো সমূহ দিবাভাগে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া রাত্রি কালে যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে দিবসে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনিদ্রা ও আহারের অভাবে মনুষ্যদিগের যে রূপ ক্লেশ হইয়া থাকে, নীরহ গোজাতির পক্ষেও সেইরূপ ক্লেশ হয়, ইহা কৃষকদিগের জানা উচিত। রাত্রিকালে কীটাদির দংশন নিবারণ জন্য গো শালায় ধূম এবং শীত কালে অগ্নি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গো সমূহের আহারের জন্য প্রতি দিন খৈল, ভুসি ও দানা দেওয়া উচিত। ফলতঃ উহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দেওয়া এবং সামর্থ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে নিযুক্ত করা একান্ত বিধেয়।

দেশীয় তরকারি।

এদেশে বারমাসই নানা প্রকার তরকারী হইয়া থাকে। এক একটী ঋতু পরিবর্ত্তের সঙ্গে নূতন নূতন তরকারী উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিকাংশ তরকারী রোপণ জন্য বৎসর মধ্যে দুইটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ বর্ষা ও শীতের প্রারম্ভ। বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বৃষ্টি পাত হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্র হইয়া উহার প্রজনন শক্তি সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় বীজাদি বপণ করিলে শীঘ্রই খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। বর্ষাকালে অধিকাংশ উদ্ভিদই তেজস্কর এবং স্বাভাবিক ক্রমানুসারে বাড়িয়া থাকে। বৃষ্টির জল দ্বারা যে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বর্ষাকাল। কারণ এই সময় নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ্যাদি উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে নূতন শোভায় শোভিত করে। কি তৃণ ক্ষেত্র, কি শস্য ক্ষেত্র, কি লতা, কি গুল্ম, কি বৃক্ষরাজী যে দিকে দৃষ্টি করা যায় সেই দিকেই শ্যামল বর্ণের নধর পাতা, শাখা এবং ফুল ও ফল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। ফলতঃ বৃষ্টির জলই যে উদ্ভিদ্দিগের পক্ষে যারপর নাই উপকারী তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রস্তাবে আমরা এই সময়ের রোপণোপযোগী তরকারীর বিবরণ লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করিব এবং অবসরক্রমে শীতঋতুর উপযোগী তরকারীর পরিচয় স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের জ্ঞাতব্য বিষয় সাধারণের গোচর করিব।

বৈশাখ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমে বৃষ্টিপাত হইলে, তরকারীর ক্ষেতসকল পাইট করিতে হয়, অর্থাৎ ভূমির পরিমাণানুসারে লাঙ্গল কিম্বা কোদালী দ্বারা মৃত্তিকা খনিত করিয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি উত্তম করিয়া বাছিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন তরকারীর জন্য ক্ষেত্র মধ্যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। কোন্ স্থানে কোন্ তরকারী রোপণ করিলে সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কি নিয়মে কোন্ তরকারী রোপণ করিতে হয় তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড কৃষিতত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এস্থলে সংক্ষেপে ঐ সমদায় বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শাক—ডাঁটা, পদ্ম নটে, কন্‌কা নটে, পুঁই, বর্ষাতি নুনা প্রভৃতি বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের কতকদিন পর্য্যন্ত বপণ করিবার প্রশস্ত সময়। যত প্রকার শাক আছে তন্মধ্যে কপি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শাকের বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। কেবল ঘাস মারিয়া মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। শাক বপণের পর যদি কিছুদিন বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। কলসীতে করিয়া জল ঢালিয়া দিলে জল প্রবাহে চারার গোড়া আলগা হইয়া অনিষ্ট হইতে পারে, এজন্য বোমা কিম্বা অন্য উপায়ে অল্প অল্প করিয়া জল ছিটাইয়া দিলে ভাল হয়। পদ্মনটে প্রভৃতি শাকের জমিতে অল্প পরিমাণে গোবরের সার দিলে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে যদি গাছ ঘন হয় তবে উহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলেই চলিতে পারে। যে কোন শাক ঘন করিয়া বপণ করা ভাল নহে। গাছ ঘন হইলে শাকের ঝাড় হইতে পারে না। এই সকল শাক বুনিবার অল্প দিন পরে চারা বাহির হইয়া থাকে। চারা একটু বড় হইলেই কাটিতে আরম্ভ করা উচিত। শাক যত কাটা যায় ততই উহার ঝাড় হইয়া উঠে। বীজ রাখিতে ইচ্ছা হইলে কাটা বন্ধ করিতে হয় এবং তখন জল দেওয়ারও কোন আবশ্যকতা হয় না। গাছে উত্তম রূপে বীজ সুপক্ক হইলে, তখন শাক উপড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গাছ হইতে বীজ পৃথক করিয়া লইতে হয়। ক্ষেত্রস্থ গাছ মাত্রেই বীজ রাখা উচিত। কারণ বাড়ীর গাছের বীজ রাখিলে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বাজারের বীজে নানা বিধ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, শস্যের ভাল মন্দ বিচার থাকে না, এবং যথা নিয়মে যথা সময়েও উহা উত্তোলিত হয় না। এজন্য স্বচক্ষে উহা দেখিয়া রাখা উচিত। অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, বীজের দোষে সমুদায় পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা এবং অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে। নটেশাকাদি অতি সুখাদ্য।

উপরি উক্ত শাকের মধ্যে ডাঁটা, চারা অবস্থায় খাদ্যের উপযুক্ত হয় না, উহা একটু বড় হইলে সুমিষ্ট হয়। ডাঁটা নানা প্রকার তন্মধ্যে মিষ্ট ডাঁটা

রোপণ করাই উচিত। যে সময় সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়, তখন শাক বুনা উচিত নহে, কারণ, বুননের পর অধিক বৃষ্টি হইলে, বীজ সকল ধৌত হইয়া স্থানান্তরে ভাসিয়া যাইতে পারে, অথবা সমুদায় বীজ একস্থানে একত্রিত হইয়া চারা হইতে পারে, কিম্বা বীজ সবল বৃষ্টির চাপে অধিক মাটির নীচে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুর নির্গমের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। এজন্য যে দিন বৃষ্টি হইয়া পর দিন রৌদ্র হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ আকাশে মেঘ প্রভৃতি বৃষ্টির সম্ভব না থাকে, সেই দিন উহা বপণ করা উচিত। যে কোন শাকের ক্ষেতের ঘাসাদি বাছিয়া মাটিগুঁড় করিতে হয়। মাটি যত আলগা হয়, ততই শিকড় বিস্তারের সুবিধা হইয়া থাকে। বীজ বপণ করিয়া তাহার উপর অল্পমাত্র মৃত্তিকা ধূলিবৎ করিয়া ছড়াইয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। ঐ আচ্ছাদনে যেন অধিক মাটির চাপ না পড়ে। উহা ঢাকিয়া না দিলে পক্ষীতে বীজ খাইয়া ফেলে।

বর্ষাতি মূলা—শীত কালের মূলা হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপরি উক্ত শাক সমূহের ন্যায় ইহারও বপণের ব্যবস্থা। ফলতঃ ইহা এক প্রকার শাক মাত্র। শীতের মূলার ন্যায় বড় হয় না।

যে কয়েক রকম শাকের বিষয় উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে পুঁই স্বতন্ত্র। উহা উক্ত প্রকারে রোপণ না করিলে চলিতে পারে। এক একটী গাদা করিয়া তাহাতে কয়েকটী বীজ পুঁতিতে হয়। চারা একটু বড় হইলে কোঞ্চি কিম্বা অন্য কোন ডালপালার আশ্রয় করিয়া দিতে হয়। এবং অবশেষে মাচা কিম্বা ঘরের চালে তুলিয়া দিলে ভাল হয়। ভালরূপ আশ্রয় পাইলে গাছ চারিদিকে বৃদ্ধি পাইতে পারে। অন্যান্য শাকের ন্যায় পুঁই শীঘ্র খাদ্যের উপযুক্ত হয় না এক একটী গাছ অনেক দিন পর্য্যন্ত গৃহস্থের উপকারে আইসে। উহার কোন রূপ বিশেষ পাইট নাই। বীজ পুঁতিয়া কিম্বা অন্যস্থান হইতে চারা তুলিয়া রোপণ করিলেই গাছ হইতে পারে।

শিম—এদেশে নানা জাতীয় শিম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আলতা পাতি, চার কোণা, ঘৃত কাঞ্চন, এবং মাখন শিম প্রভৃতিই প্রধান। ইহার দ্বারা উত্তম তরকারি হইয়া থাকে। হিন্দু মতানুসারে চৈত্র মাসে ও একাদশী তিথিতে ভক্ষণ নিষেধ। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই শিম হইয়া থাকে,

এক একটী গাছে প্রচুর ফল ধরে। অনেকের মনে বিশ্বাস পুরাতন শিম গাছে বজ্রপাত হইয়া থাকে, এজন্য শীতের অবসানে গাছ মারিয়া ফেলে, গাছ না মারিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা জীবিত থাকে।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই প্রায় শিম হইয়া থাকে। গাছের বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। এক একটী মাদা করিয়া তাহাতে ৩। ৪ বীজ রোপণ করিতে হয়, বৃষ্টি না হইলে মধ্যে মধ্যে একটু জল দিলে শীঘ্রই উহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের প্রথম ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে বীজ রোপণ করিতেই হয়। চারা সকল বাড়িতে আরম্ভ হইলে কোঞ্চি অথবা অন্য কোন ডাল পালায় উহা তুলিয়া দিতে হয়। শিমের লতানিয়া গাছ, সুতরাং মাচা কিম্বা কোন বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া দিলে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে ফল ধরিতে বিলম্ব হয় এজন্য পাতা ছিঁড়িয়া দিলে ভাল হয়। অন্যান্য পাইটের মধ্যে গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হইলে গাছ মরিয়া যায়, এজন্য আর্দ্রস্থানে উহা রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে। শিমের সুপক্ক বীজে দালি হইয়া থাকে, কোন কোন রোগে শিমের পাতার সত্ত্ব ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে।

যে কএক জাতীয় শিমের বিষয় উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে মাখন শিম অত্যন্ত বড়। চৈত্রের শেষে কিম্বা বৈশাখের প্রথমে উহা রোপণ করিলে শ্রাবণ মাসে ফলিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট ফল হইয়া থাকে। এই শিম বিলাত হইতে এদেশে আনীত। ইহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু ও কোমল।

বরবটী—ইহাও শিমের ন্যায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতে উৎপন্ন হয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপণের প্রশস্ত সময়। অন্যান্য পাইট আদি শিমের ন্যায়। ইহার কাঁচা ফলে তরকারী এবং সুপক্ক ফলে অত্যুত্তম দালি প্রস্তুত হয়। ছোলার ন্যায় বরবটী ভিজাইয়া অনেকে খাইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গাছে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে। বরবটীর গাছ লতা বিশিষ্ট।

ঝিঙ্গা—ইহা প্রায় বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে তরাই কহে। কঠিন মৃত্তিকা ভিন্ন সকল প্রকার নরম

মাটিতেই ইহা হইয়া থাকে। সার মাটি দিয়া এক একটী মাদা করিয়া তাহাতে ৩।৪ টী বীজ রোপণ পূর্ব্বক অল্প পরিমাণে মাটি দ্বারা তাহা আবার চাপিয়া দিতে হয়। বীজ যেন অধিক মৃত্তিকার নিম্নে প্রবিষ্ট না হয়। বীজ বপণের পর মধ্যে মধ্যে মাদাতে অল্প পরিমাণে জল দেওয়া উচিত। সচরাচর চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যেই বীজ বুনিয়া থাকে। ঝিঙ্গার লতানিয়া গাছ হয়, এজন্য উহা মাচায় তুলিয়া দিলে ভাল হয়, অনেক স্থলে আবার কাঁকুড় গাছের ন্যায় ভূমিতেই লতাইয়া ফল ধরিয়া থাকে। একটু টিকোল ভূমিতে ঝিঙ্গা রোপণ করা উচিত কারণ গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হইলে গাছ মরিবার সম্ভব।

করলা—ইহাও এক জাতীয় উচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। উচ্ছে অপেক্ষা করলার আকার অনেক বড়। এক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই উহার আবাদ হইতেছে। যত্ন করিয়া উহার গাছ রাখিলে বার মাসই ফল ধরিয়া থাকে। উচ্ছে যে প্রকার ভূমিতে চাস করিতে হয়, ইহাও সেই রূপ মৃত্তিকায় জন্মে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে করলা রোপণ করিতে হয়। ঝিঙ্গার ন্যায় ইহারও মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদাতে তিন চারিটী বীজ বপণ করিতে হয়। এবং গাছ বাড়িতে আরম্ভ হইলে, ডাল পালায় কিম্বা মাচায় তুলিয়া দিতে হয় আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাস হইতেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। বৎসরের মধ্যে দুইবার রোপণ করিলে অধিকাংশ সময় ফল লাভ করিতে পারা যায়। শীতকালে ফল লাভ করিতে হইলে কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপণ করিতে হয়।

ধুঁদুল—ইহা ঝিঙ্গা জাতীয়, ইহার রোপণাদি প্রণালী ঝিঙ্গার ন্যায়। ঝিঙ্গা অপেক্ষা ধুঁদুলের আকার বড়। তরকারিতে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঢাঁড়স—ইহা তরকারিতে ব্যবহার হয়। শাকাদির মাটি যে রূপ পাইট করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ইহার পক্ষেও সেইরূপ। দুই হাত অন্তর ঢাঁড়সের এক একটী বীজ রোপণ করিতে হয়। গাছের কোন বিশেষ পাইট করিতে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিলে ভাল হয়। ঢাঁড়স তত সুখাদ্য নহে।

সশা—ইহা জল পান ও রন্ধনে দুই প্রকারে ব্যবহার হয়। সশার বিশেষ কোন রূপ পাইট করিতে হয় না। বাড়ীতে একটী গাছ হইলে প্রচুর ফল জন্মিয়া থাকে। সশা মাদা করিয়া বুনিতে হয়, এক একটী মাদাতে তিন চারিটী বীজ রোপণ করা উচিত। বীজ রোপণের পর যদি অত্যন্ত রৌদ্র হয় তবে মধ্যে মধ্যে জল দিলে উপকার হইয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে চারার ডগা সকল ডাল পালাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত। আশ্রয় পাইলে ডগা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে পারে। গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে ফলন ভাল হয় না, এজন্য তেজস্কর গাছের পাতা ছিঁড়িয়া তেজের হ্রাস করিয়া দিতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসের সশা অপেক্ষা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের সশা অত্যন্ত সুখাদ্য এবং উপকারী।

চিচিঙ্গে—ধুঁদুল ও ঝিঙ্গার ন্যায় ইহারও চাস করিতে হয়। গাছ বড় হইলে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। বিশেষ কোন পাইট নাই। ইহা তরকারির কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

বিলাতীকুমড়া—ইহার সুপক্ক ফল মিষ্ট আস্বাদন যুক্ত এবং সুখাদ্য। পাকা কুমড়া ঘরে তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তর-কারীর ব্যবহার যোগ্য থাকে। সকল সময়েই ইচ্ছা করিলে ইহার গাছ করিয়া ফল লাভ করিতে পারা যায়। দোঁয়াস মৃত্তিকায় এই কুমড়া অধিক জন্মে। গাছের গোড়ায় সার মাটি দিলে ফলন বেশী এবং ফল বড় হয়। যে স্থানে জল সঞ্চিত হয়, সেখানে বিলতী কুমড়া ভাল হয় না এমন কি গাছ মরিয়া গিয়া থাকে। এক একটী মাদা করিয়া ৩।৪ টী বীজ রোপণ করিলেই হইতে পারে, যাহারা মাঠে অধিক আবাদ করিয়া থাকে তাহারা দুই হাত অন্তর এক একটী বীজ লাইন করিয়া পুঁতিয়া থাকে। বীজ ভিন্ন অন্যস্থান হইতে চারা তুলিয়া রোপণ করিলেও গাছ হইতে পারে। বৃষ্টির সময় চারা রোপণ করা প্রশস্ত। গাছ বড় হইলে মাচা করিয়া দিলে ভাল হয়। ফুটি ও তরমুজ গাছের ন্যায় ভূমিতে উহা লতাইয়া বেড়াইলেও বিশেষ কোন হানি নাই।

সাঁচিকুমড়া—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রতি পদ তিথিতে ইহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই কুমড়া তরকারিতে ব্যবহার হয়। পক্কাবস্থায় ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রায় ইহা যথেষ্ট জন্মে। বাড়ীতে একটী গাছ হইলে

একটী গৃহস্থের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। রসাস্থানে ফলন অধিক হয়। মাদা করিয়া বীজ রোপণ করিয়া কিম্বা অন্যস্থান হইতে চারা তুলিয়া পুঁতিয়া দিলেই চলিতে পারে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ রোপণের সময়। কিছু সার মাটির সহিত মাদা করিয়া গাছ রোপণ করিলে প্রচুর ফল হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা বাহির হইতে বিলম্ব হইলে, অর্থাৎ বীজ রোপণের পর যদি অত্যন্ত রৌদ্র হয় এবং জলাভাবে অঙ্কুরিত হইতে ব্যাঘাত জন্মে, তবে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়। চারা কিছু বড় হইয়া ডগ বাহির হইতে আরম্ভ হইলে চারার গোড়ায় কাটি পুঁতিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছ অধিক বাড়িয়া উঠিলে ডাল পালায় কিম্বা মাচা করিয়া তুলিয়া দিতে হয়। অনেকে মাচার অভাব নিবারণ জন্য ঘরের চাল কিম্বা গাছের নিকট চারা রোপণ করিয়া থাকেন, গাছ বড় হইলে উহাতে আশ্রয় করিয়া উঠে। গোবরের সার কুমড়ার অত্যন্ত উপকারী। কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় গো শালায় যে সকল গাছ হইয়া থাকে, সেই সকল গাছে ফলন অধিক হয়।

আম্র।

ফলের মধ্যে আম্র অতি উপাদেয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে আম্রের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে আম্র বৃক্ষের উল্লেখ বিবরিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুশীলনে আম্র-শাখা প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ কোন্ সময় হইতে যে আম্র এদেশে চলিত হইয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

অপক্কাবস্থায় আম্র অত্যন্ত তীব্র অম্ল রস বিশিষ্ট থাকে। বায়ু রক্ত পিত্তকারী, কফ নাশক, রুচিকারক প্রভৃতি গুণ সমূহ বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে। কোন কোন জাতীয় আম্র অপক্কাবস্থায় অত্যন্ত সুখাদ্য। এই জাতীয় আম্র কাঁচামিঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পক্কাম্র বর্ণ রুচি-মাংস শুক্র-বলকারী, বায়ু পিত্ত নাশক, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকারক। আম্র নানা জাতীয, মৃত্তিকা ও জল বায়ু ভেদে উহার

আস্বাদনেরও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের মধ্যে মালদহ আম্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে নানা স্থান হইতে বহুবিধ উত্তমোত্তম আম্রের কলম আনাইয়া উহার বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আম্র শীত প্রধান ও পার্ব্বত্য দেশের ফল নহে। উত্তমোত্তম ফুল ও ফল গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমেশ্বর শস্যাদি ও ফুল ফলের জন্য ভারতকে সকল দেশের শিরোভূষণ করিয়াছেন। বোম্বাই এবং মালদহের আম্র চির প্রসিদ্ধ। আম্র প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে রসাল দোঁয়াস মৃত্তিকার গাছ তেজাল ও ফল অধিক জন্মে। অত্যন্ত রসা স্থানে গাছ রোপণ করিলে ফল তত সুখাদ্য হয় না, ফলের মিষ্টতা হ্রাস হইয়া থাকে। অত্যধিক বালির ভাগ বিশিষ্ট স্থানে গাছ রোপণ করিলে, গাছের তেজ হ্রাস,ফলের আকার ক্ষুদ্র এবং ফলন অল্প হয়।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রায় আম্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানের ফল সুখাদ্য নহে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হুগলী, নদীয়া এই সকল স্থানের আম্র অতি উৎকৃষ্ট। আম্রের একটী বিশেষ গুণ এই যে আচার ও আম্রসত্ত্ব করিয়া রাখিলে বার মাসই উহা ব্যবহার যোগ্য থাকে। আম্র সত্ত্ব অতি সুখাদ্য। বাত পিত্তহারী, সারক, এবং রুচিকারক বলিয়া বৈদ্য-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। স্থান বিশেষে অতি উত্তম আম্র সত্ত্ব হইয়া থাকে। নদীয়া জেলার মধ্যে মহেশ পুরে যেমন উৎকৃষ্ট আম্র সত্ত্ব হয় আর কোন স্থানে সেরূপ হয় না। যিনি একবার উহার আস্বাদন এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আম্র সত্ত্ব প্রস্তুত বিষয়ে তত্রস্থ মহিলাগণের প্রধান গুণপণা।

আঁঠি ও কলম দুই উপায়ে আমের চারা হইয়া থাকে। আঁঠির গাছ প্রায় ফলের অনুরূপ হয় না। কিন্তু কলমের গাছ নিশ্চয়ই মূলগাছের ন্যায় উত্তম হইয়া থাকে। কলমের গাছে অল্প দিনের মধ্যে ফল ধরিয়া থাকে। প্রথম বৎসর গাছে মুকুল হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। কলমের চারা অপেক্ষা আঁঠির গাছ ফলবান হইতে অধিক বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু উহাতে অধিক ফল ধরে, গাছ অধিক বড় এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। এমন কি এক একটী আঁঠির গাছে যে পরিমাণে ফলধরে, কলমের একটী বাগানের

ফল তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। গাছ বড় হইলে যে কেবল মাত্র ফল অধিক হইয়া উদ্যানস্বামীর লাভ বৃদ্ধি করে তাহা নহে, বৃহৎ গাছ বিক্রয় দ্বারাও বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। বাক্স প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য গঠনে আম্র কাষ্ঠের সমধিক আদর। পুরাতন বৃক্ষ সমুদায় বিক্রয় করিয়া নূতন গাছ করিতে পারিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কোন সম্ভব নাই। কলমের চারায় তিন বৎসরে এবং আঁঠি গাছে ৫।৭ বৎসরে ফল ধরিয়া থাকে।

মৃত্তিকার দোষে যে আম্রের আস্বাদনের ব্যতিক্রম ঘটে তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ বাগান করিবার সময় কেহ মন্দ চারা রোপণ করে না। মফঃস্বলে অধিকাংশ স্থানেই আঁঠির চারা হইয়া থাকে। সুতরাং আস্বাদনেরও যে অন্যথা হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি। ফলতঃ উৎকৃষ্ট আম্রের বাগান অর্থাৎ ফলের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে হইলে কলমের চারা রোপণ করাই প্রশস্ত।

মুকুলোদ্গমের পর অত্যধিক কুজ্ঝটিকা হইলে আম্রের সমধিক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ঐ সময় বৃক্ষের মূল সরস রাখিতে পারিলে বিস্তর উপকার হয়। সকল স্থানে এবং সকল জাতীয় বৃক্ষে এক সময়ে ফল ধরে না। সময়ের বিভিন্নতা বশতঃ চৈত্র মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আম্র দেখিতে পাওয়া যায়। মুঙ্গের জেলায় এবং ত্রিহুতের অনেক স্থানেই আম্রের বড় বড় বাগান আছে।

বাগান করিবার সময় অনেকেই ঘন ঘন করিয়া আম্রের চারা রোপণ করিয়া থাকেন। গাছ ঘন হইলে উদ্যানস্বামীর ক্ষতি ভিন্ন উপকার হয় না। কারণ গাছ ঘন হইলে, ফলন অল্প হয়, গাছ সকল আবশ্যক স্থান ব্যপীয়া বৃদ্ধি হইতে পারে না, শিকড় ও শাখা সকল পরস্পর সংঘটিত হইয়া সতেজ হইতে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য বিংশতি হস্ত অন্তর ব্যবধান রাখিয়া রোপণ করা উচিত। গাছ যত অন্তর রাখিয়া রোপণ করা হয়, ততই উহা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বৃহৎ আকারে পরিণত হইয়া থাকে। ঘন ঘন রোপণ করিলে গাছের সংখ্যা অধিক হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৃক্ষের আকার বৃহৎ হয় না। ফলতঃ ১০।১২ হস্তের ন্যূনকল্পে আম্র রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে। (ক্রমশঃ)

মৃত্তিকা।

"মৃদ্বীভূঃ সর্ব্বরক্ষাণাং হিতা।"

বৃ, সং।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে মৃত্তিকার প্রতি অগ্রে দৃষ্টিকরা উচিত কারণ মৃত্তিকার উর্ব্বরতানুসারে কৃষকের পরিশ্রম সফল হইয়া থাকে। সকল প্রকার মৃত্তিকার সমান রূপ উর্ব্বরতা শক্তি থাকে না। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ সমৃদ্ধি ও জীবনোপায় মৃত্তিকা রেণুতে সংযোজিত করিয়া দিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি গোপনে বসিয়া নানা উপায়ে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। মৃত্তিকার এই উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি রাখিতে পারিলে যে কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত উন্নতি হয় তাহা বলা বাহুল্য। অতএব কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া অতীব আবশ্যক।

মৃত্তিকা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, চিক্কণ অর্থাৎ এটেল ও বালি। যে মৃত্তিকায় সমধিক জল ধারণ শক্তি বর্ত্তমান থাকে ও সূর্য্য কিরণে সত্বর উত্তপ্ত হয় না এবং গাত্রে লাগিলে সংলগ্ন হইয়া থাকে তাহাকে চিক্কণ মৃত্তিকা কহে। আর যাহার জল ধারণ শক্তি নাই শীঘ্র উষ্ণ হইয়া উঠে তাহাকে বালুকা কহে। নিরবচ্ছিন্ন বালুকা ক্ষেত্রে প্রায় কোন রূপ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না। কারণ বালুকায় উদ্ভিদের শরীর পোষণোপযোগী রসের সম্পূর্ণ অভাব হওয়াতে একে উহা নিস্তেজ মৃতপ্রায় থাকে, তাহাতে আবার রৌদ্র লাগিলে সহসা বালুকা কণা অগ্নি কণার ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উদ্ভিদের জীবন নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য আরব দেশেও আফ্রিকার অন্তর্গত সাহারা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ মরুভূমি সকল তৃণাদি উদ্ভিদ্ শূন্য মহাশ্মশান রূপে বর্ত্তমান আছে।

কি চিক্কণ কি বালুকা এই সকল মৃত্তিকায় প্রতি নিয়ত নানা পদার্থ

সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপাদন করিতেছে। বর্ষাকালে পর্ব্বত গাত্র হইতে চিক্কণ, কঙ্কর, প্রস্তর প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ ধৌত হইয়া নানা স্থানের মৃত্তিকার গুণান্তর সাধন করিতেছে। অনেকেই অবগত আছেন নদ্যাদি চর ভূমিতে কোন প্রকার সার দিতে হয় না অথচ প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, জলপ্লাবন সময়ে নানা পদার্থ স্রোত সংযোগে আসিয়া প্লাবিতস্থান সমূহে পলি পড়িয়া থাকে; তাহাতেই মৃত্তিকার প্রজনন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। নিয়ত এক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যেমন আমাদের শরীর সুস্থ ও সম্যক বৃদ্ধিশীল থাকে না, উদ্ভিদগণও সেই রূপ এক প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে না। এজন্য সর্ব্বদা ভূমিতে সার দিয়া মিশ্র মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়। মিশ্র মৃত্তিকা উদ্ভিদের পক্ষে অতি অনুকূল। নানা প্রকার পদার্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে যে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিশ্র মৃত্তিকা কহে। পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে "বোদ" মৃত্তিকা কহে। উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদদিগের পক্ষে বোদ মৃত্তিকা অত্যন্ত উপকারী। বোদ মৃত্তিকা সারের কার্য্য করিয়া থাকে। যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ভাল নহে, সেই ভূমিতে সারের পরিবর্ত্তে এই মৃত্তিকা দিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। অনেক বৃক্ষের মূলে সারের ন্যায় বোদ মাটি দিলে বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চিক্কণ ও বালিতে নানা প্রকার মৃত্তিকা সংযোগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা অনুকূল। মিশ্র মৃত্তিকার মধ্যে খিয়ার, পলি, দোঁয়াস, চড়া প্রভৃতিই প্রধান। খিয়ার মৃত্তিকায় বালির অংশ সামান্য এবং চিক্কণের ভাগ অধিক। এ জন্য এই মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন, সহজে হল চালিত হয় না, বৃষ্টি দ্বারা ভূমি সিক্ত না হইলে মৃত্তিকার কাঠিন্যভাব বিদূরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এবং বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকা কর্দ্দমময় হইয়া উঠে, ঐ কর্দ্দম আঠার ন্যায় অঙ্গে লাগিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্তিকাকে খিয়ার কহে।

যে মৃত্তিকাতে বালির অংশ অধিক, অনায়াসেই হল চালিত হইয়া থাকে, এবং উপরিস্থিত মৃত্তিকা সর্ব্বদাই রসাল থাকে তাহাকে পলি মৃত্তিকা কয়। বর্ষার জলপ্লাবনে নদ্যাদির তীর ভূমিতে অধিক পরিমাণে পলি মাটি সঞ্চিত হইয়া থাকে, এজন্য চরভূমির প্রজনন শক্তি অধিক।

যে মৃত্তিকায় সহজে লাঙ্গল কর্ষিত হয় ও উভয় প্রকার মৃত্তিকা যাহাতে মিশ্রিত থাকে, এবং নিযমিত সময়ের মধ্যে জল মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহাকে দোঁষাস মৃত্তিকা কহে।

যে মৃত্তিকাতে চিক্কণের ভাগ অপেক্ষা বালির অংশ অত্যধিক, রৌদ্র প্রবল হইলে মৃত্তিকা নীরস শুষ্ক হয়, এবং উদ্ভিজ্জাদি মরিতে আরম্ভ হয়, আর অতি সহজেই মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে পারা যায় তাহাকে চড়া কহে।

নিরবচ্ছিন্ন বালুকা কিম্বা চিক্কণ মৃত্তিকাতে কোন প্রকার উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয় না। এজন্য মিশ্র মৃত্তিকাতে চাস করিয়া থাকে। ফলতঃ উদ্ভিদ্দিগের প্রকৃতি অনুসারে ঐ সকল মৃত্তিকার সংযোগ সমানরূপ আবশ্যক করে না। অর্থাৎ কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে বালুকা অধিক, কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে চিক্কণের অংশ সমধিক আবশ্যক করে। এজন্য উহাদিগের স্বভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাতে রোপণ করা উচিত। কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে কোন্ প্রকার মৃত্তিকার কত অংশ থাকিলে উপকারজনক হয়, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় গুরুতর। বিজ্ঞান ও রাসায়নিক শাস্ত্র সম্যক অনুশীলন না করিলে তাহা নির্ব্বাচণ করিতে পারা যায় না। আমেরিকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিরতিশয় পরিশ্রম করিয়া কৃষি বিদ্যা সম্যক অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া নানা প্রকার কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া দিন দিন কৃষি জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। আমেরিকার যে এত উন্নতি, একমাত্র কৃষিই তাহার মূল। গৃহে জীবনোপায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলে, সে জাতি কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। ফলতঃ উদরান্নের জন্য দাসত্বের পদে দলিত হওয়া যারপর নাই কাপুরুষের কার্য্য। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিয়া কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। পেটের ভাতের জন্য আজীবন গোলামী করিবেন, দাসত্বের পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আর্য্য কুলে

কালি দিবেন। অমূল্য মনুষ্যজীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ন্যায় প্রভুর হস্তের ক্রীড়ার সামগ্রী করিবেন, তত্রাপি অভিমানী কৃতবিদ্যগণ কৃষি বিজ্ঞানাদি অনুশীলন করিয়া স্বাধীন কৃষিতে মনোযোগী হইবেন না। আমেরিকার ন্যায় দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভারত মৃত্তিকা যে কত শস্য প্রসব করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভারত চিরকাল শস্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভারত চিরকাল জগতের অন্ন দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভারত চিরকাল বাণিজ্যের ভাণ্ডার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভারত মৃত্তিকার গুণ চিরকাল পৃথিবীর সকল ইতিহাসেই মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, ভারত চিরদিন পৃথিবীর শিরভূষণ ছিল। জগতে এমন বীর কেহ ছিলেন না যিনি ভারত মৃত্তিকার প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়াছেন। কত রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, কত বীরকুল সূর্য্যের উন্নত মস্তক ভারত মৃত্তিকা রেণুতে মিশ্রিত হইয়াছে, কত অহঙ্কার স্ফীত বক্ষঃস্থলের উষ্ণ শোণিত ভারত মৃত্তিকাতে অভিষিক্ত হইয়াছে! ভারত যদি আফ্রিকার দগ্ধ মরু হইত, ভারত যদি সাইবেরিয়ার ন্যায় তুষার রাশির চির আকর স্থান হইত, তাহা হইলে ভারতে ঐ সকল ব্যাপার কিছুই অনুষ্ঠিত হইত না। এক ভারত মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিই ভারতের জীবন্ত গৌরব। কিন্তু কি মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয়, কি শোচনীয় ব্যাপার সেই আর্য্যজাতীর ভারত মৃত্তিকার উর্ব্বরতাশক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সেই ভারতবাসীদিগের গৃহ অন্ন শূন্য হইয়া মহা ক্লেশের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

মৃত্তিকাই যখন অন্ন কষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায়, মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে যখন অন্নের সংস্থান হয় না, মৃত্তিকার উপর যখন জীবিকার উপায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তখন যাহাতে উহার প্রজনন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্‌পক্ষে বিহিত বিধানে চেষ্টা করা উচিত। দেশীয় কৃষকেরা মৃত্তিকাতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া চির প্রচলিত সংস্কারানুসারে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার নূতন নূতন উপায় তাহারা অবগত নহে। কোন্ জাতীয় শস্যের পুষ্টিসাধন জন্য মৃত্তিকাতে কোন্ কোন্ পদার্থের

প্রযোজন, এবং তাহাব অভাব হইলে কি উপাযে তদ প্রতীকার হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এই জ্ঞানের অভাব হইলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। কৃষক যদি উদ্ভিদ্ ও মৃত্তিকার অবস্থা সম্যকরূপ অবগত হইযা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। ভূমি উর্ব্বরা কি না তাহা জানিবার সহজ উপায় এই যে, যে মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্ সহজেই তেজস্কর ও পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধন শীল হয়, সেই মৃত্তিকাই স্বাভাবিক উর্ব্বরা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহাতে বৃক্ষাদি স্বাভাবিক ক্রমানুসারে পরিবর্দ্ধিত হয না, নিস্তেজ ভাবে থাকে, তাহাকে অনুর্ব্বরা মৃত্তিকা কহে। উচ্চ স্থানেব মত্তিকা প্রায় অনুর্ব্বরা হইযা থাকে, তাহাব কাবণ এই, তথায জলাদিব সঞ্চার অভাবে মৃত্তিকা নীবস হয। নীরস মৃত্তিকাব উদ্ভিদ্ জীবিত থাকিতে পারে না। এজন্য পর্ব্বতে কোন শস্যাদি উৎপন্ন হয না, কিন্তু পর্ব্বতের যে অংশ সমতল অর্থাৎ যে স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া উদ্ভিজ্জাদির আবশ্যকীয় রসের অভাব পূর্ণ কবিতে পারে, তথায নানা প্রকাব শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন্ মৃত্তিকায় কোন্ কোন্ পদার্থেব কত অংশ আছে তাহা জানিবার একটী সহজ উপায আছে, নিম্নলিখিত উপাযে পরীক্ষা করিলে মৃত্তিকার তত্ত্ব জানিতে পাবা যায। এক সের পরিমিত শুষ্ক মৃত্তিকা একখণ্ড যদি অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, এবং দগ্ধেব পর উহা ওজন করিলে যে পরিমাণে কম হইবে; তাহাই ঐ মৃত্তিকাব সারাংশ বিবেচনা কবিতে হইবে। আর যদি পোড়াইবার সময তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তাহা হইলে জানা যাইবে; উহাতে জন্তুসার ছিল। উদ্ভিজ্জ সার থাকিলে কোন প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয় না। মনেকর পূর্ব্বোক্ত একসেব পরিমিত মৃত্তিকা খণ্ড দগ্ধ করিয়া ওজন করিলে যদি তিন পোয়া হয়, তবে অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, এক সেবের মধ্যে এক পোযা সাব ছিল। এবং ঐ তিন পোয়া মৃত্তিকা যদি জলে মিশাইয়া জল ফেলিয়া বালুকার ভাগ শুষ্ক করিয়া ওজন করা যায় ও তাহা যদি এক পোয়া হয়, তবে জানিতে হইবে উক্ত মৃত্তিকায় দুই ভাগ চিক্কণ ও এক ভাগ বালুকা আছে।

যে স্থান বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকে, সে স্থানের ভূমি

অধিক উর্ব্বরা হয় না, আওতায় থাকিলে উদ্ভিজ্জ্যাদি সুন্দররূপ বাড়িতে পারে না। এজন্য ঐরূপ স্থানে শস্যাদির আবাদ করা উচিত নহে। আওতায় থাকিলে তত্রস্থ মৃত্তিকা আবশ্যকীয় রৌদ্রাদির অভাবে শস্যশালিনী হইতে পারে না। মত্তিকায় আবশ্যকীয় আলোক ও উত্তাপ না পাইলে উদ্ভিদাদি প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য যাহাতে ক্ষেত্রে সম্যক প্রকারে উত্তাপাদি পাইতে পারে তাহাব ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মনুষ্যের যত্ন ও চেষ্টার উপর যে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ করুণাময পরমেশ্বব স্বতঃই ভারত মৃত্তিকাকে প্রজনন শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, অত্রস্থ মৃত্তিকায় পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিজ্জ্যাদি প্রায় উৎপন্ন হইতে পাবে, অনেক স্থানের মৃত্তিকা এত উর্ব্বরা যে চাসাদি কিছুই কবিতে হয না, কেবল মাত্র বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কি ফুল ফল, কি শস্যাদি জীবনোপায় কোন বিষয়ের জন্য ভারতদাতা সন্তানদিগকে পরমুখাপেক্ষী কবেন নাই। জননী যেমন স্বীয় দেহ নিঃসৃত স্তন্য দ্বাবা সন্তানের শরীব পোষণ কবিযা থাকেন। ভারত মৃত্তিকাও সেই প্রকার নানাবিধ শস্যাদির দ্বারা সমস্ত জগৎকে চিরদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন যেমন এক এক লোম কূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড দেখাইযা ছিলেন, ভারত মৃত্তিকাও সেইরূপ এক একটী বেণুতে জগতের অগণ্য প্রাণিদিগের খাদ্যের উপায় দেখাইয়া দিতেছে। ফলতঃ এমন উর্ব্বরা ক্ষেত্র পাইয়াও অন্নের সংস্থান করিতে না পারা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

সকল জাতীয় উদ্ভিদে যে এক প্রকার মৃত্তিকা আবশ্যক কবে না, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ কমল মৃত্তিকা যে অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষে অনুকূল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৃক্ষাদির পক্ষে কঠিন মৃত্তিকা উপকারী, ওষধিবর্গ প্রায় কঠিন মৃত্তিকায় সম্যক বৃদ্ধি শীল হয় না। যে সকল উদ্ভিদের ফল ও কাণ্ডে জলীয়ভাগ অধিক থাকে, অর্থাৎ ফুটী ও তরমুজ প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সমধিক বালির ভাগ মিশ্রিত মৃত্তিকাই প্রশস্ত। আম্র নিচু প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের শাখা বিশিষ্ট মূল এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক দূর বিস্তারিত হয়, তাহাদিগের

পক্ষে চিক্কণ মৃত্তিকার আধিক্য উপকার জনক। চিক্কণ ও বালি সমভাগে মিশ্রিত যে মৃত্তিকা তাহাতে আলু মূলা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড মৃত্তিকাভ্যন্তরে বৃদ্ধি হয় এবং যাহাদিগের মূল কোমল ও রসাল তাহাদিগের পক্ষে হিতকর। ফলতঃ এইরূপ মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের প্রকৃতি জানিয়া কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যে লাভের মুখ দর্শন করা যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য ঋষিগণ কৃষিতত্ত্বে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চবিধ মূল * পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগে যে জগতের যাবতীয় ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, এই মত তাঁহাদিগের দ্বারা প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। তাঁহাদের মতে বর্ণমালার কয়েকটী বর্ণের সংযোগে যেমন যে কোন ভাষায় যে কোন শব্দ ও পদ রচনা করা যায়; সেইরূপ উক্ত পঞ্চবিধ মূল পদার্থের সংযোগে সংসারের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্ষিতি অর্থাৎ মৃত্তিকা রূপান্তরিত হইয়া এই সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করিতেছে। এই মৃত্তিকা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিজ্জ শরীর পোষণ করিতেছে, আবার সেই উদ্ভিজ্জ দ্বারা জীব দেহ গঠিত, বর্দ্ধিত এবং রূপান্তরিত হইতেছে। জগতে নূতন পরমাণু কিছুই সৃষ্ট হইতেছে না, আদিম পরমাণু সমূহ রূপান্তরিত ও গুণান্তরিত হইয়া সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। শরীরস্থ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সমুদায়ই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ও মৃত্তিকা দ্বারা সুরক্ষিত এবং পরিশেষে আবার মৃত্তিকা রেণুতে পরিণত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিতেছে। ফলতঃ মৃত্তিকাই যে সকলের মূল, তাহা বলা বাহুল্য। মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, সেই উদ্ভিদে আবার জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। বিশ্বপতি তাঁহার এই বিশ্বরাজ্য রক্ষা করিতে এক মৃত্তিকা দ্বারা কত বিচিত্র কার্য্য অহর্নিসি সম্পন্ন করিতেছেন। যে মৃত্তিকাকে আমরা সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি, কোন বিষয় ঘৃণা করিতে হইলে মাটির সহিত তুলনা দিয়া ব্যাখ্যা করি, কিন্তু মাটিই যে সমুদায়ের মূল তাহা আমরা একবারও বিবেচনা করি

* নব্য পণ্ডিতদিগের মতে মূল পদার্থ পঞ্চষষ্ঠী।

না। ঐ যে তোমার উদ্যানে বিবিধ বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র পুষ্প পত্র লতিকায় জগতের চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে, ঐ যে তোমার বক্ষঃস্থলে সুকুমার শিশু নির্ম্মল মুখচন্দ্র ন্যস্ত করিয়া হাস্যছটা বিকাশ করিতেছে, ঐ যে তোমার প্রণয়িনী ভুবন উজ্জ্বলরূপে সংসার মুগ্ধ করিতেছে, আর যে তুমি সম্মুখস্থ দর্পণে তোমার দেহকান্তি দর্শন করিয়া রূপের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতেছ এ সমুদায়ের মূলে দৃষ্টিকর, একমাত্র মৃত্তিকাই পরক্ষ সম্বন্ধে এই সকল বিচিত্রতা সাধন করিতেছে। উহারা যেমন একমাত্র মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে, কিছুদিন পরে আবার দেখিবে পশু পক্ষ্যাদির পদ দলিত মৃত্তিকা রেণুতে ঐ সকল পরিণত হইয়া রূপের অহঙ্কার, দেহের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া গিয়াছে।

উদ্ভিদগণ প্রতি নিয়তই মৃত্তিকা হইতে স্বীয় স্বীয় দেহ রক্ষা জন্য নানা প্রকার পরমাণু গ্রহণ করিতেছে, সর্ব্বদা একরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিলে সে পদার্থের অভাব হইয়া থাকে। এজন্য প্রতি বৎসর এক মৃত্তিকায় একরূপ শস্য রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে। কৃষকেরা মৃত্তিকার এই অভাব বিমোচন করিবার জন্য প্রতি বৎসর ভূমিতে সার দিয়া থাকে। কোন কোন সার কোন কোন উদ্ভিদের উপযোগী তাহা বিবেচনা করিয়া ক্ষেত্রে সার দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে মৃত্তিকার প্রজনন শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং ঐ স্তর সমূহ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দ্বারা সংরচিত, সুতরাং সকল স্তরের মৃত্তিকা সকল প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে অনুকূল নহে। উদ্ভিজ্জাদির ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হইয়া যে মৃত্তিকা স্তর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মৃত্তিকা উদ্ভিদদিগের অত্যন্ত পুষ্টিসাধক। এই মৃত্তিকাকেই পূর্ব্বে রোদ মৃত্তিকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রোদ মৃত্তিকা যে উদ্ভিজ্জাদির অত্যন্ত উপকারী তাহার কারণ এই যে সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া উহারা বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়া থাকে, উক্ত মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক স্তর অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং

তাহাতে কোন প্রকার উদ্ভিদ্ রোপণ করিলে, তাহাদিগের কোমল শিকড় সকল, তাহা ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে পারে না। শিকড় সকল চারিদিকে বিস্তৃত না হইলে, আবশ্যকীয় রস গ্রহণ পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য বৃক্ষাদি রোপণ ও বীজ বপণ করিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা সুন্দররূপ কর্ষণ করা আবশ্যক। মৃত্তিকা যত কর্ষিত হয়, ততই উদ্ভিদের পক্ষে সুবিধা। কিন্তু সকল মৃত্তিকায় সমানরূপ কর্ষণের আবশ্যকতা হয় না। যে মৃত্তিকা শিথিল অর্থাৎ তত কঠিন নহে, তাহাতে অধিক গভীর করিয়া কর্ষণ না করিলেও চলিতে পারে। ফলতঃ উদ্ভিদ্ ও মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে কর্ষণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকা কর্ষণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মনে বিশ্বাস ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের পক্ষে হল কর্ষণ করা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কিন্তু এই সংস্কার যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যদি হল কর্ষণ করা পাপ জনক বিষয় হইত, তাহা হইলে রাজর্ষি জনক কখনই স্বহস্তে হল চালনা করিতেন না। ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ জনক স্বয়ং বলিয়াছেন, "অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে ক্ষেত্র কর্ষণে কোন দোষ জ্ঞান ছিল না। কালক্রমে কৃষিকার্য্যের অবনতির সঙ্গে নানা প্রকার কুসংস্কার আসিয়া ভারত বাসিদিগের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ আমোদজনক স্বাধীন কৃষিকার্য্য, পাপজনক বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা বাস্তবিক পাপগ্রস্থ মান মর্য্যাদা ও জীবননাশক তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত উন্মাদের কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভাবে সৎপথে থাকিয়া জীবিকার উপায় সংস্থান করা যে কতদূর সুখকর তাহা বলিয়া শেষ হয় না। মূর্ত্তিমান অধীনতার ধ্বজা স্বরূপ লেখনী হস্তে ধারণ করা অপেক্ষা স্বহস্তে হল কর্ষণ করা, শরীরস্থ রক্তবিন্দু পর পদ সেবায় ক্ষয় করা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে উৎসর্গ করা, উদরান্নের জন্য মান সম্ভ্রম প্রভৃতি আত্মাদর বিসর্জ্জন দিয়া আজীবন অধীনতা চক্রে নিষ্পেষিত হওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে হল চালনা করিয়া স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করা দেবের আকাঙ্খিত।

আমাদের দেশে মৃত্তিকাই প্রধান সম্পত্তি। জীবনোপায় মৃত্তিকার

অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুখ সম্পত্তি যাবতীয় ব্যাপার মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। ভারত মৃত্তিকার গুণে ভারত-লক্ষ্মী চিরকাল ভারতে আবদ্ধ। ভারতের মৃত্তিকায় সোনা ফলে, ইহা কাহার অবিদিত আছে? যে দেশে পদতলস্থ মৃত্তিকাস্তরে জগতের খাদ্যের ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে দেশ, যে আজ উদরপোষণ জন্য মুষ্টি ভিক্ষার নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ আর কি আছে। ভারতবাসীগণ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন থাকিয়াও পিপাসা শান্তি করিতে পারিতেছেন না। সোনার ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িতেছেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন রূপ যে মহাব্রত হিন্দুহৃদয় শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অন্নদাতা বলিয়া অন্য জাতীয় যে চিরন্তন গৌরব ছিল, তাহা মলিন আবরণে আবৃত হইতেছে। ভারত এখন কাপুরুষ জীবনপোষণ জন্য গৃহপালিত পশুর ন্যায় প্রভুর দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার নিমিত্ত লালায়িত। যে ভারতমৃত্তিকা পৃথিবীর অন্নক্ষেত্র ছিল, সেই ভারত-মৃত্তিকা এখন দুর্ভিক্ষ দৈত্যের চির বাসস্থান হইয়া উঠিতেছে।

আম্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অগ্রে কোন স্থানে পাতো দিয়া চারা বড় হইলে, তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলেও চলিতে পারে, কিম্বা যেখানে স্থায়ীরূপে গাছ করিতে হইবে, এককালে সেখানে পুঁতিলেও কোন ক্ষতি নাই। পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, তিন চারি মাস অগ্রে একখণ্ড ভূমির কিয়দংশ (অর্থাৎ আঁঠির পরিমাণানুসারে) অন্যূন ৩। ৪ হস্ত গভীর করিয়া খনন

করিতে হইবে, দোঁয়াস মৃত্তিকা তিন ভাগ এবং এক ভাগ দগ্ধ মৃত্তিকা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ খনিত স্থান পূর্ণ করিবে ও মধ্যে মধ্যে সেইস্থান জল দিয়া সিক্ত রাখিতে হইবে। এইরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে, জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আঁঠি কিম্বা চারা তাহাতে রোপণ করিবে। যদি পাতো না দিয়া একেবারেই স্থায়ীরূপে গাছ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আম্র বাগানের উপযুক্ত স্থানে মৃত্তিকা গভীর করিয়া খনন পূর্ব্বক এক ভাগ সার, ঐ মৃত্তিকায় সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে অন্তর অন্তর রোপণ করিতে হইবে। চারা অন্যূন দুই হস্ত বড় হইলে, বাঁশের ঘের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। ঘের দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; প্রথমতঃ চারার অবস্থায় অধিক রৌদ্র লাগিলে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভব তাহা নিবারিত, দ্বিতীয়তঃ চারাদি পশুর অত্যাচার হইতে চারা সুরক্ষিত হইতে পারে। চারার অবস্থায় পশ্বাদিতে আহার করিলে যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণ করিতে অধিক দিন সময় অপেক্ষা করে। মধ্যে মধ্যে চারার মূলদেশ পরিষ্কার এবং অল্প পরিমাণে খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। চারার সম্যকরূপ পাইট করিলে অল্পদিনের মধ্যে উহা তেজস্কর ও বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। ফলতঃ পাইটের উপর যে উদ্ভিদ্ মাত্রেরই উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। অনেকে পানের বরজে আম্রের চারা রোপণ করিয়া থাকেন, পান ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রখর রৌদ্র নিবারণের সুব্যাবস্থা থাকাতে ক্ষেত্রস্থচারা সকল অনতিকাল মধ্যে বড় হইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করে। চারা বড় হইলে প্রতি বৎসর শীতকালে গোড়া খুঁড়িয়া পোড়া মাটির সার দেওয়া উচিত। কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাস পাইট করিবার সময়। এজন্য ঐ সময় গাছের মূল দেশ খনিত করিয়া মাটি ও খৈলের সার দেওয়া কর্ত্তব্য। চারা ছোট বড় অনুসারে অর্থাৎ ছোট গাছে এক সের ও বড় গাছে দুই সের খৈল গুঁড়া ভিজান জল দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। গাছের যত পাইট হইবে ফল তত উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে। বৃক্ষ মূলে ঘাস ও জঙ্গল হইলে আম্রের আকার ক্ষুদ্র ও ফসল অল্প এবং পোকা লাগিয়া বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিবে।

বর্ষার জল যে স্থান হইতে নিষ্কাশিত হইতে পারে না, অর্থাৎ বৃষ্টি

হইলে জল সঞ্চিত হয়, এরূপ স্থানে আম্রের বাগান করা উচিত নহে। কারণ বৃক্ষ মূলে সর্ব্বদা জল সঞ্চিত থাকিলে, আস্বাদনের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিযা থাকে। এজন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পগাব খনন করিয়া উহাতে মাটি তুলাইয়া কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে, সেই ক্ষেত্রে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে কোন অনিষ্ট হইতে পাবে না। যদি অত্যন্ত উচ্চ ভূমিতে গাছ বোপিত হয় এবং তত্রস্থ মৃত্তিকা নীরস বশতঃ যদি গাছেব কোন ক্ষতি বোধ হয, তাহা হইলে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বৃক্ষেব মূলে জোল কাটিয়া জল সিঞ্চন করা উচিত। নীরস স্থানের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা কবিলে মুকুলোদ্গমের বিশেষ অনুকুলতা হইযা থাকে। এক নিয়মে অর্থাৎ এক সময়ে সকল স্থানে মুকুল নির্গম হয় না। সচরাচর পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্যান্ত মুকুলোদ্গমেব সময়। কোন কোন জাতীয গাছে বৎসরের মধ্যে দুই বার ফলিতে দেখা যায়, এই জাতীয় গাছকে দোফলা কহে।

এক জাতীয লতা আছে, তাহার পাতা দেখিতে আম্র পাতাব ন্যায এবং আম্র পত্রের যে রূপ গন্ধ, ঐ পত্রেও সেইরূপ আঘ্রাণ। আম্র পাতা সদৃশ পত্রের আকার এবং গন্ধ তজ্জন্য তাহাকে লতা আম্রের গাছ বলিয়া থাকে। কিন্তু লতায় কখন আম্র ধবিতে দেখা যায় না। অনেকে সখ করিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্যানে এই লতা বোপণ করিযা থাকেন। লতা বড হইলে মাচায় উহা তুলিয়া দিতে হয়। আর এক প্রকাব আম্রের গাছ আছে, ঐ গাছের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু গাছ সম্পূর্ণ লতাব আকাব বিশিষ্ট নহে, বকম-বিলিয়া ফুলের গাছেব ন্যায় কতক লতাব ভাবে পরিণত। এই জাতীয় গাছে আম্র ফলিযা থাকে, গাছ ছোট এবং শাখা সরু ও লম্বা এজন্য ডাল মাচাব উপব তুলিয়া দিতে হয়। অনেকে এই গাছকেও লতা আম্রের গাছ কহে।

কলম নানা প্রকাব, তন্মধ্যে জোড় ও গুল কলমই আম্র চারা প্রস্তুত করার পক্ষে প্রধান উপায়। জোড কলম বাঁধিতে হইলে, পূর্ব্ব বৎসরের চারাব সহিত জোড বাঁধাই প্রশস্ত। ভাল আম্রেব চারার সহিত ভাল ভাল গাছে জোড বাঁধা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব বৎসরীয সতেজ চারা, একটী টব বা গামলায় বসাইয়া বাঁশের মাচা কিম্বা অন্য কোন আশ্রয়ে উহা তুলিয়া এরূপ

উচ্চে স্থাপণ করিবে যে, যে ডালে জোড় বাঁধিতে হইবে, ঐ চারাও যেন তাহার পাশাপাশী হইয়া সমউচ্চ স্থানে থাকে। চারার অবস্থার সহিত ঐ শাখার অবস্থা কত দূর নিকটবর্ত্তী তাহা দেখা উচিত। কারণ চারার বয়স অপেক্ষা শাখা যদি অধিক দিনের হয়, তাহা হইলে জোড় ভাল হইবে না। চারার অঙ্গ যেমন কোমল, শাখাও সেই রূপ কোমল হইলে সহজেই জড়িত হইয়া যায়। ফলতঃ চারার ও শাখার অঙ্গ একরূপ হইলে কলম ভাল হয়। শাখার গোড়া অপেক্ষা অগ্রভাগ অধিক কমল, এজন্য অগ্রে-ভাগে কলম বাঁধিতে হইলে চারারও অগ্রভাগের সহিত বন্ধন করা উচিত। ফলতঃ চারার অঙ্গের যে অংশের সহিত শাখার মিল বোধ হইবে, সেই অংশের সহিত কলম বাঁধিলে গাছ ভাল হইবে। যে শাখার সহিত কলম বাঁধিতে হইবে, তাহার পার্শ্বে গামলায় কিম্বা টবে করিয়া চারা সমুচ্চ ভাবে স্থাপন করিবে। অনন্তর তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা ঐ শাখার ৩। ৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দশ আনা অংশ ছুলিবে, এবং চারারও ছয় আনা পরিমাণে ঐ রূপ ছুলিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া জোড় বাঁধিবে। জোড় বাঁধার পর সর্ব্বদা তাহা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। চারার গোড়ায় প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে আবশ্যক বোধে জল দেয়া কর্ত্তব্য। জোড় বাঁধার পর যদি বৃষ্টি হইয়া উহাকে সতেজ রাখে, তবে জল না দিলেও অধিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু বৃষ্টি সর্ব্বদা হয় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। চারা সতেজ থাকিলে, তাহার শরীরস্থ রস দ্বারা উক্ত শাখা পরিপুষ্ট করিতে পারে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চারা ও মূল গাছে উভয়েরই গোড়ায় জল সিঞ্চন করা বিহিত, কারণ উভয়ে তেজস্কর হইলে পরস্পরের রস সংযোগ দ্বারা কলম বাঁধা শাখার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রায় এক মাস হইতে চারি মাসের মধ্যে কলম প্রস্তুত হইয়া উঠে। যে দিন কলম কাটিবে, তাহার অন্ততঃ এক মাস অগ্রে যে স্থানে জোড় বাঁধা হইয়াছে, তাহার দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে চারার অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিবে। এরূপ কাটি-বার কারণ এই যে, যে রস উর্দ্ধে উঠিয়া চারার অগ্রভাগ পরিপুষ্ট করিত, মাথা কাটিয়া দিলে, ঐ রস কলম বাঁধা শাখায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দেহ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উভয় অঙ্গ এক অঙ্গের ন্যায় পরিণত হইয়া

পরস্পরের শরীরস্থ রস সমূহ এক গাছে সংযোজিত হইতে থাকিবে। তদ্দ্বারা ঐ কলম বিলক্ষণ তেজবান হইয়া উঠিবে। অনন্তর জোড় বন্ধের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, শাখা ছেদন করিয়া নাবাইলে কলমের গাছ প্রস্তুত করা হইল।

গুলকলম, জোড়কলম হইতে স্বতন্ত্র বিভিন্ন। গুলকলম করিতে হইলে আম্রশাখার মধ্যে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ঠিক করিয়া তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রদ্বারা ঐ স্থানের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে গোলাকার করিয়া একটী দাগ দিতে হইবে। ঐ দাগ দ্বারা কেবল যেন শাখার ত্বক চ্ছেদিত হয়, কাষ্ঠে যেন আঘাত অর্থাৎ তাহা কর্ত্তিত না হয়। অনন্তর বিশেষ সাবধানতার সহিত ঐ দাগ পরিমিত স্থানের ত্বক তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অর্থাৎ ছালের নিম্নে কাষ্ঠে যেন অস্ত্র প্রবেশ না করিতে পারে। ছাল তুলিবার পূর্ব্বে কলমেব উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ভাল রকম পরিষ্কৃত মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য পচাইয়া সার মিশ্রিত করিতে হইবে। এই মৃত্তিকার জল দিয়া কর্দ্দম কবিতে হইবে। কর্দ্দম যেন অধিক জলাক্ত না হয়। উহা এরূপ হওয়া উচিত যেন কোন দ্রব্যে লাগাইয়া দিলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। এই মৃত্তিকার, একটী দলা করিয়া ঐ ত্বক কর্ত্তিত স্থানে চাপিয়া ধরিতে হইবে ; তাহাতে সমুদায় স্থানটী মৃত্তিকা আবৃত হইবে। একখণ্ড চট দ্বারা, মৃত্তিকা লেপিত স্থান জড়াইয়া বাঁধিয়া তাহার উপবে জল দিবার জন্য একটী ছিদ্র বিশিষ্ট ভাঁড কিম্বা কোন পাত্র ঝুলাইয়া রাখা উচিত। সর্ব্বদা জল পাইলে শীঘ্র কলম লাগিয়া যায়। এইরূপ নিয়মে রাখিলে কিছুদিনের মধ্যে ঐ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় সকল বাহির হইবে। প্রথম বারের শিকড় কিছু বড় হইয়া আপনা হইতে শুখাইয়া যায় ; যদি শুষ্ক না হয় তবে ছিড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বার যে শিকড় নির্গত হইবে, তাহা ছিঁড়িবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয়বারের শিকড কিছু বড হইলে ঐ শাখা কাটিয়া ভূমিতে রোপণ করিয়া দিলে গুল কলমে চারা তৈয়ার করা হইল। এক নিয়মে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল গাছের সকল চারায় কলম প্রস্তুত হয় না। কোন কোন শাখায় সত্বর কলম লাগিয়া থাকে, কোন কোন শাখায় অধিক বিলম্ব আবশ্যক

করে। জোড় কলম অপেক্ষা, গুলকলমে ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ ফল হইয়া থাকে। জোড়কলমে ভিন্ন ভিন্ন গাছের সংযোগে চারা প্রস্তুত করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে গুণের অন্যথা হওয়া বিচিত্র নহে। এজন্য অনেকে গুল কলমেই চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। গুল কলমকে, গুটি কলমও কহিয়া থাকে।

এইরূপে কলম প্রস্তুত হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে বাগানে রোপণ করা উচিত। বাগানে এক জাতীয় গাছ রোপণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলম রোপণ করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছ থাকিলে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে ফল ভোগ করিতে পারা যায়। নানা জাতীয় গাছ থাকিলে বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সুপক্ক আম্র খাইতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে কত প্রকার আম্র আছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। ফার্মিংটন্ সাহেব বলিয়াছেন "এদেশে যে কত প্রকার আম্র আছে, তাহার সংখ্যা গণনা ও প্রত্যেক জাতির স্বরূপ বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" বাস্তবিক এদেশে যেরূপ আম্র হইয়া থাকে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশে সেরূপ জন্মে না। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা অবসর ক্রমে ঐ সকল আম্রের পরিচয় কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করিব ইচ্ছা আছে।

বোম্বাই ও মালদহ আম্র ব্যতীত দেশীয় নানা প্রকার উত্তমোত্তম আম্র আছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের বিষয় লিখিত হইলে বৃহৎ একখানি পুস্তক হইয়া উঠে। এদেশে ভাল ভাল যত প্রকার আম্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে এক এক জাতীয় আম্র এক একটী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। চুঁচড়াতে বাবু জীবনকৃষ্ণ পালের বাগানে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম্র আছে। আবার এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, এক জাতীয় আম্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আনীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, বিশ্বনাথ মুখো বা গোপালে ধোপা স্বতন্ত্র জাতীয় আম্র নহে, ঐ দুই ব্যক্তি মালদহ আম্রের কলম আনাইয়া এদেশে গাছ করে, অনন্তর তাহাদিগের নিকট হইতে কিম্বা ঐ সকল গাছের কলম লইয়া অন্যান্য যাহারা উহার চারা করিয়াছে, তাহারা "মালদহ" নাম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদিগের নামানুসারে

আম্রের নাম করণ করিয়াছে। আল্‌ফন্স্‌ নসিঃরুদ্দীন হাইদর, পরাণকলে প্রভৃতি নামও এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এতদ্দেশে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ আম্রই মালদহ ও বোম্বাই হইতে আনীত।

উদ্যান প্রিয় ব্যক্তিদিগের আম্র চারা সংগ্রহ করিবার এই প্রশস্ত সময়। কারণ জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত নানা প্রকার আম্র খাইয়া উহা মনোনীত করিতে পারেন। আঁঠি রাখিবার এই উপযুক্ত সময়। যে আম্রের চারা করিতে হইবে, তাহা না খাইয়া এককালে রোপণ করা ভাল। প্রথমতঃ আঁঠি সকল একটী স্থানে রোপণ করিবে। অনন্তর চারা দেড়হাত বড় হইলে, প্রত্যেক চারা ভিন্ন ভিন্ন টবে রাখিতে হয়। এ বৎসরের চারা দ্বিতীয় বৎসরে কলম বাঁধিতে হইবে, বর্ষার শেষে যেন কলম বাঁধা শেষ হয়। কলম কাটিয়া যদি স্থায়ীরূপে চারা রোপণ করিতে বিলম্ব থাকে, তবে উহা ছায়াযুক্ত স্থানে পুঁতিয়া রাখিলে চলিতে পারে। উদ্যানস্থ বৃক্ষ সমূহের গোড়া সকল অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে দুই তিন সপ্তাহের জন্য আল্‌গা করিয়া দিতে হয়, অর্থাৎ মূল দেশের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া শিকড়ে বাতাসাদি লাগাইয়া সার নূতন মাটি (অর্থাৎ যে মাটি গোড়া হইতে খনিত হইয়াছে, তাহা যেন না হয়) উহার দ্বারা তাহা পুনর্ব্বার উত্তম করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে।

ক্রমশঃ

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কৃষি বিষয়ে মন্তব্য।

" আষাঢ় নবমী শুকল পখা।
তাতে আছে জলের লেখা॥
যদি বর্ষে ইমি ঝিমি।
শস্যের ভাব না সহে মেদিনী॥
যদি বর্ষে কণা।
পর্ব্বত গালে সমুদ্রের ফেণা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে॥
যদি সূর্য্য হেলে বসে পাটে।
চাষার গরু বিকায় হাটে॥ "

ইতি পরম্পার স্মৃতি সংগ্রহ। *

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারত কৃষিতত্ত্বে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণ কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি জ্যোতিষ, কি কৃষি বিদ্যা সকল বিষয়েই যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। কৃষিকার্য্যের সম্যক উন্নতি ব্যতীত যে লোকস্থিতি রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারা সুন্দররূপ বুঝিয়া ছিলেন। কৃষি জগতে তাঁহাদিগের যে সকল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দর্শন করিলে বিমোহিত হইতে হয়। তাঁহারা সামান্য তৃণ হইতে মহোচ্চ বৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থই জ্ঞান চক্ষে দর্শন করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জাদির গুণ নির্ব্বাচনে তাঁহারা যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত

* এই প্রবাদ কএকটী, জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী চুয়াডাঙ্গার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

আছে? তাঁহারা যে কেবলমাত্র উদ্ভিদ্ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, কোন্ উদ্ভিদ্ কোন্ সময়ে রোপণ করিতে হয়, কি নিয়মে বীজ রক্ষা করিলে উহার অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি অব্যাহত থাকে, বৃক্ষাদিতে জলসেচন ব্যবস্থা, প্রভৃতি কৃষিবিষয়ে যাবতীয় তত্ত্বে তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বশিষ্ট পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা ভারত ক্ষেত্র সর্ব্বদাই শস্য পূর্ণ থাকিত। তাঁহারা জল ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানিয়া কৃষি সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জল ও মৃত্তিকার প্রকৃতি না জানিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই সফল যত্ন হইতে পারা যায় না। এজন্য কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল পদার্থের অবস্থা বিশেষরূপ জ্ঞাত থাকা একান্ত আবশ্যক। কোন্ বৎসর কি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইবে, তাহা আর্য্যেরা অগ্রে গণনা করিয়া দেখিতেন। বৃষ্টিপাতের সহিত কৃষিকার্য্যের যে অতি নিকট-তর-সম্বন্ধ তাহা সকলেই অবগত আছেন। কাল সহকারে কৃষিবিদ্যার অবনতি হওয়াতে ঐ সকল গণনা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। পঞ্জিকাকারগণ জল ও শস্যের পরিমাণ যেরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তদ্দারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্বে উহার সম্যক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এক্ষণে যেমন কৃষিকার্য্য কৃতবিদ্যগণের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং পরিত্যজ্য কিন্তু পূর্ব্বে আর্য্যগণের নিকট কৃষি সেরূপ নীচ কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল না। তাঁহারা কৃষিসম্বন্ধে যে সকল উদার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে তাঁহাদিগকে অতি পারদর্শী কৃষক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাস্তবিক আবাস-ভূতা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে জীবনোপায়ের অসংখ্য দ্বার উন্মুক্ত থাকিতে উদরান্নের জন্য অন্যের দাসত্ব ভার বহন করা যে কতদূর নীচ প্রবৃত্তির কার্য্য তাহা কেহ একবার স্বপ্নেও বিবেচনা করেন না। রত্নাগর্ভা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় জীবন যাপন করা যারপর নাই লজ্জার বিষয়। কৃতবিদ্যগণ পেটের ভাতের জন্য দিন দিন বিজাতীয় দ্বারে যেরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন, তাহা দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? যে আর্য্য জাতি কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা সমস্ত সংসার প্রতিপালন করিতেন,

যাঁহাদিগের সদাব্রতের দ্বার প্রতি গৃহেই উন্মুক্ত ছিল, যাঁহারা অন্নদানকে ধর্ম্মের সজীব গৌরব জ্ঞান করিতেন, সেই দেব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত সন্তানগণ উদর পোষণ জন্য, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া দাসত্বকে একমাত্র আরাধ্য দেব জ্ঞান করত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মহার্হ-মণির ন্যায় দাসত্ব পাদুকা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন! দাসত্ব পাপস্পর্শরহিত বিশুদ্ধ আর্য্য শোণিত পরপদ সেবায় ক্ষয় করিতেছেন! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা, তত্রাপি ভারতবাসিদিগের চৈতন্য হইল না। পেটে ভাত নাই, আত্মীয় স্বজন দারিদ্র্য দাবানলে দগ্ধ, জীবন দাসত্ব সেবায় নিযুক্ত তথাপি কৃতবিদ্যগণ স্বাধীন কৃষিতে প্রবৃত্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন না। জগৎ বিখ্যাত গ্রীকপণ্ডিত সক্রেটিস্ বলিয়া গিয়াছেন "কৃষিকার্য্য স্বাস্থ্য, সামর্থ, স্বচ্ছলতা, ধন এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের উৎসস্বরূপ।" বাস্তবিক সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারিলে যে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয় না তাহা বলা বাহুল্য। কৃষিকার্য্যের পক্ষে ভারতক্ষেত্র যেমন উপযুক্তস্থল, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান আর নাই। ভারতের মৃত্তিকা যেরূপ উর্ব্বরা, সেইরূপ আবার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর সঞ্চার যেরূপ সুনিয়মে হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় জগৎপাতা জগদীশ্বর ভারতকে সমস্ত জগতের শস্যাগার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋতু ভিন্ন ভিন্ন কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুকূল। সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে যে যে নিয়ম অবগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কৃষক সফল মনোরথ হইতে পারে, তদ্বিবরণ এই প্রস্তাবে উল্লিখিত হইল।

শির্ষ লিখিত প্রবাদ কএকটীর অর্থ জ্ঞাত হওয়া কৃষকের একান্ত আবশ্যক। আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে [অর্থাৎ উল্টা রথের পূর্ব্বদিন] বৎসরের বৃষ্টি গণনা স্থির হইয়া থাকে। ঐ দিবস যদি অল্প পরিমিত ধারাযুক্ত মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয় তবে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। যদি বাষ্পাকারে (Like Snowfall) বহুক্ষণ স্থায়িনী বৃষ্টি হয় তবে জল-

প্লাবন হইবে। যদি মুষল ধারে বৃষ্টি হয় (Heavy Shower) তবে অনাবৃষ্টি হেতু নদী প্রভৃতি শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তথায় বক প্রভৃতি সামান্য জলচর পক্ষী সকল বিচরণ করে। সূর্য্য অস্তগমন কালে প্রখরতেজ প্রকাশ পূর্ব্বক যদি মেঘাচ্ছন্ন না থাকে, তবে সে বৎসর নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা এবং সে জন্য কৃষকদিগের গরু হাটে বিক্রয় করিতে হয়।

কোন্ মাসে কি কার্য্য করিতে হয় তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা কৃষকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সময়ের যে কাজ তাহা না করিলে কৃষক কখনই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারে না।

কৃষক দিগের মধ্যে একটী প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আষাঢ়ে ধুলি। শ্রাবণে গুঁড়ি॥ অর্থাৎ আষাঢ় মাসে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত না হইয়া মধ্যে মধ্যে জল ও রৌদ্র হওয়া আবশ্যক। শ্রাবণ মাসে সর্ব্বদা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত শস্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আষাঢ়ে ধুলি অর্থাৎ মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে ক্ষেত্রস্থ তৃণাদি জঙ্গল পরিষ্কারের পক্ষে সুবিধা হয়। সকল ঋতু অপেক্ষা বর্ষাকালে অত্যন্ত তৃণাদি জন্মিয়া শস্যের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। শস্য ক্ষেত্রে তৃণাদি জন্মিতে না দেওয়া এই সময়ের প্রধান কার্য্য। ক্ষেত্রে তৃণাদি জঙ্গল হইলে, মৃত্তিকার সারাংশ তাহারা গ্রহণ করিয়া শস্যাদির পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত জন্মায়। এবং জঙ্গলাদি প্রবল হইলে তাহাদের আওতায় শস্যাদি সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ফলতঃ মনুষ্যাদির পক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যেমন আবশ্যক, শস্যাদির সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম।

বৃষ্টির জল উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই সময় সর্ব্বদা বৃষ্টি হয় বলিয়া উদ্ভিজ্জাদি অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা অধিক তেজস্কর ও বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। জগৎ কানন এক প্রকার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। তরু, লতা, গুল্মাদি নবীন শোভায় শোভিত হইয়া প্রকৃতীকে মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগের জীবনোপায় স্বরূপ ধান্য এই সময় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ধান্যাদি পাইটের ত্রুটি হইলে মহা অনিষ্ট হয়। এই সময়ে আউশ ধান্য ক্ষেত্রে যাহাতে তৃণাদি জন্মিতে না পারে, তদ্‌পক্ষে মনোযোগী

হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসের মধ্যে রোয়া ধান্তের রোপণ কার্য্য শেষ করা উচিত। শ্রাবণ মাসে সর্ব্বদা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইলে ধান্যাদি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। শস্যাদির পক্ষে বৃষ্টির জল যেমন উপকারী, অতিরিক্ত বৃষ্টিও আবার সেইরূপ অপকার সাধন করে। ফলতঃ আবশ্যকের অতিরিক্ত হইলেই যে অনিষ্ট জনক হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন বৎসর এরূপও দেখা যায়, অতি বৃষ্টিতে সমুদায় শস্যাদি ডুবিয়া গিয়া কৃষকের সমুদায় আশা ভরসা ও পরিশ্রম সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দেয়। বাস্তবিক অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই শস্যের পক্ষে অপকারী। এই অপকার হইতে শস্যাদি রক্ষা করিবার বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না। অনাবৃষ্টি হইলে শস্য ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু উক্ত উপায় দ্বারা শস্যাদি রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশে মিসর দেশের ন্যায় দেশ মধ্যে তাদৃশ জলাশয়াদি নাই যে উহার জল দ্বারা এই অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং অনাবৃষ্টি হইলেই দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া অসংখ্য মানবজীবন অন্নাভাবে কালগ্রাসে কবলিত হইতে থাকে। অনাবৃষ্টি যেমন দেশের অপকার সাধন করে, অতি বৃষ্টিও সেইরূপ আবার নানা প্রকার দুর্ঘটনা আনয়ন করিয়া দেশের শোচনীয় অবস্থা করিয়া তুলে। অতি বৃষ্টি জনিত অপকার নিবারণের একমাত্র উপায় শস্য ক্ষেত্রের জল নির্গম করা। কিন্তু সকল স্থলে ইহাও সহজ নহে। তবে চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা যতদূর হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। এক্ষণে জল নির্গমনের পক্ষে একটী মহা অনিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ মধ্যে রেলওয়ে চলিত হওয়াতে অনেক স্থানে জল নিকাশের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে, পূর্ব্বে যেমন স্বাধীন ভাবে জল সমূহ নিষ্কাসিত হইত, এক্ষণে সেরূপ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অতি বৃষ্টি দ্বারা এখন অধিক পরিমাণে অপকার হইয়া থাকে। দেশের জল নির্গত না হইলে কেবল যে শস্যের অনিষ্ট করিয়া থাকে এরূপ নহে, ইহা দ্বারা আর একটী ভয়ানক অপকার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতিরিক্ত জলে শস্যাদি নষ্ট করিয়া খাদ্যের অপ্রতুল করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় এরূপ নহে। উক্ত জল একস্থানে সঞ্চিত হইয়া মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়া

থাকে, এবং জলসংযোগে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া ম্যালেরিয়া নামক এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়।* এই বাষ্প অত্যন্ত অনিষ্টকারী। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল হইয়া দেশের শোচনীয় অবস্থা সংঘটন করিতেছে, একমাত্র জল নির্গম না হইয়াই যে ইহার প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৃত মহাত্মা রাজা দিগম্বর মিত্র এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়ার পর হইতেই দেশ মধ্যে এই জীবননাশক ভয়ানক জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ষার জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকিলে দেশের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, এবং শস্যাদি সুরক্ষিত হইয়া খাদ্যেরও অভাব ঘটিতে পারে না। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্রে জোল কাটিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। জোল কাটিয়া দিলে, ক্ষেত্রস্থ জল সমূহ অনায়াসেই নির্গত হইতে পারে এবং শস্য মূলে জল সঞ্চিত হইয়া তাহাদিগকে পচাইতে পারে না। এই সময় ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে আর একটী বিশেষ উপকার এই যে দাঁড়া বাঁধিতে হইলে গাছের উভয় পার্শ্বের মৃত্তিকার চাপ কাটিয়া তাহা উলটাইয়া মূলে ধরাইয়া দিতে হয়, ইহাতে ঐ চাপের তৃণাদি পচিয়া সারের কার্য্য করিয়া থাকে। সার পচাইবার এই প্রশস্ত সময়। কপি, শালগম প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই সময় খৈলের সার দিতে হয়। বৃষ্টির জলে উহা সুন্দররূপ পচিয়া উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। মাঠে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া "সার কুড" করা উচিত, * গোময় এবং অন্যান্য আবর্জ্জনাদি নিত্য উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, এই সময় সার প্রস্তুত করিয়া রাখিলে কার্ত্তিক মাসে তাহা অনেক শস্যের পক্ষে উপকার জনক হইবে। সার যে উদ্ভিদ্দিগের জীবন তাহা কৃষকমাত্রেরই মনে রাখা উচিত। গোবরের সার কার্ত্তিক মাসে গোলাপ প্রভৃতি অনেক গাছের গোড়ায় দিতে হয়, এদেশে যত প্রকার চাস হইয়া থাকে, তাহাতে গোবর সারই অধিক ব্যবহার হয়, সুতরাং এই সময় তদ্পক্ষে মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কৃষকের

* অনেকে বাড়ীতে সার কুণ্ড করিয়া থাকেন, আবর্জ্জনাদি দূষিত পদার্থ—বাসবাটীর দূরে রাখাই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রশস্ত।

প্রধান গুণ পনা। যে কৃষক যে পরিমাণে ভবিষ্যৎ কার্য্যে মনোযোগী হইবে, সে সেই পরিমাণে যে লাভের মুখ দর্শনে সমর্থ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আম্র নিচু প্রভৃতির কলম বাঁধিতে আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ বর্ষাকালে কলম বাঁধিলে সত্বরই তাহা লাগিয়া থাকে। আঁম্র কাঁঠালের বাগানে আঁটি রোপণের এই উপযুক্ত সময়। কাঁঠাল আঁটি অধিক দিন ঘরে রাখিয়া পুঁতিলে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না। কাঁঠালের টাট্‌কা বীজ রোপণ করা আবশ্যক। এই সময় অনেক ফলের গাছ রোপণ করিতে হয়। কেহ কেহ শ্রাবণ মাসে কলার গাছও পুঁতিয়া থাকেন, এই সময় উহা পুঁতিলে বৃষ্টির জলে অনেক গাছ পচিয়া যাইবার সম্ভব। কিন্তু কলা পোঁতা সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—

"ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা পোঁত আষাঢ় শ্রাবণ॥"

কলা বাগানে আম্র কাঁঠালের আঁটি রোপণ করা ভাল। কারণ কলাগাছের একটী গুণ এই যে উহারা অনেক দূর হইতে মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা রসাল থাকে, ক্ষেত্রস্থ চারা সমূহ সেই রস লইয়া স্বীয় স্বীয় জীবন রক্ষা করে।

শ্রাবণ মাসে বিদেশীয় তরকারী ক্ষেত্রের জমী তৈয়ার করিতে অর্থাৎ সারাদি দিয়া উহা এরূপ করিয়া রাখিতে হইবে ভাদ্র মাসে যেন উহাতে বীজ ফেলিতে পারা যায়। দেশীয় তরকারী প্রভৃতির রোপণ ও সম্যক প্রকারে পাইট করিতে মনোযোগ রাখা আবশ্যক। শোণ, পাট, মেস্তা প্রভৃতি কাটিয়া জলে পচাইয়া তাহা হইতে সূত্র বাহির করিবার এই উত্তম সময়। এই সময় লঙ্কা রোপণ করিতে হয়। ফলতঃ এই সময় কৃষকের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য যে সকল বীজ সংগ্রহ থাকে, তদ্‌সমুদায় মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। বর্ষার জলীয় বায়ু লাগিয়া এবং স্যাঁতা ঘরে উহা রাখিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য সাবধানতার সহিত উহা রক্ষা করা উচিত।

উদ্যান প্রিয় ব্যক্তিগণ এই সময় উদ্যান কার্য্যে মনোযোগী না হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। তৃণাদি জঙ্গল উদ্যানের পরম শত্রু। যাহাতে উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। গোলাপ ভিন্ন দেশীয় নানা জাতি ফুলের কলম বাঁধিবার এই প্রশস্ত সময়। শরৎকালে ও শীত ঋতুতে যে সকল ফুল উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিবে, সেই সকল গাছ এই সময় প্রস্তুত করিতে হয়। গাঁদা, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি বহুবিধ মনোহর পুষ্প এই সময় রোপণ করিলে কিছুদিন পরে উদ্যানের অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হইবে। ফলতঃ এই সময় কি শস্য ক্ষেত্র কি উদ্যান সর্ব্বত্রেই কৃষকের তত্ত্বাবধারণ করা আবশ্যক। কৃষিকার্য্য এরূপ গুরুতর যে সামান্য মাত্র উপেক্ষা করিলে প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

বিদেশীয় তরকারী।

এদেশে যত প্রকার তরকারী আছে তন্মধ্যে কতকগুলি দেশীয় অপর কতকগুলি বিদেশ হইতে আনীত। দেশীয় তরকারীর রোপণ প্রণালী অনেকেই অবগত আছেন, এবং তাহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত কৃষিতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল তরকারীর বীজ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিত হইতেছে।

দেশীয় তরকারীর ন্যায় প্রতি বৎসর দেশ মধ্যে বিদেশীয় অনেক তরকারীর আবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল তরকারীর বীজ এদেশে ভাল উৎপন্ন হয় না, এজন্য প্রতি বৎসর আমেরিকা, কেপ অপ গুড়োপ ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ হইতে ঐ সকল বীজ আনীত হইয়া থাকে। দেশীয় তরকারী হইতে ঐ সকল তরকারীর রোপণ প্রণালী যে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন তাহা অনেকে অবগত নহেন। এই জন্য দেখা যায় অনেকে ভাল রূপে উহা উৎপন্ন করিতে না পারিয়া বীজের দোষ দিয়া থাকেন। আমরা এজন্য পাঠকবর্গদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা অগ্রে রোপণ প্রণালী শিক্ষা করিয়া যেন চাসে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সফল যত্ন হইবেন।

কপি——বিদেশীয় তরকারীর মধ্যে বিলাতী আলু ও কপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক্ষণে দেশমধ্যে গোলআলুর যেরূপ চাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর কিছুদিন পরে উহা এই দেশীয় তরকারী বলিয়াই লোকের বিশ্বাস হইবে। আলুর চাস যে পরিমাণে দেশমধ্যে বিস্তারিত হইয়াছে, কপির আবাদ তত বিস্তার হয় নাই। কিন্তু বৎসর বৎসর যে উহার চাস বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কপি, অতি উৎকৃষ্ট তরকারী, শীতকালে উহা উৎপন্ন হয় এবং সেই সময়েই সুখাদ্য থাকে, গরম পড়িলে খাইতে তত ভাল লাগে না ও গাছে পোকা লাগিয়া থাকে। কপি নানা জাতীয়; তন্মধ্যে ফুল, বাঁধা, ওল, নল, কাফ্রি প্রভৃতিই প্রধান। ইহাদিগের যথার্থ নাম লার্জ ড্রমহেড্, সুগার লোফ্, আরলি ইয়র্ক, এন্‌ফ্লিডেল আরলি, এন্‌ফ্লিডেল লেট, বেড্‌ ডচ্, বেটাসির্না, জার্সি ওয়েক্ ফিল্ড ব্রোকলি, ব্রসেলস্‌ স্প্রাউট্‌স্ ইত্যাদি। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইয়ুরোপের উপকুলস্থিত অরণ্য সমূহে স্বভাবতঃ বিস্তর কপি উৎপন্ন হইত, এবং উহা দ্বারা যে সুখাদ্য তরকারী হয়, তাহা কেহ অবগত ছিল না। ওয়েলস্ বাসীরা অগ্রে উহার ব্যবহার আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কপির ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সকল জাতীয় কপির বীজ এদেশে উৎপন্ন হয় না। কেবল ফুলকপির বীজ এদেশে জন্মে। বাঁধা কপির বীজ শীত প্রধান দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজের দোষে যে চাসের বিস্তর ব্যাঘাত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য, অতএব যে কোন চাসে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে বীজ পরীক্ষা করা আবশ্যক। কপির বীজ নূতন কি পুরাতন তাহা জানিবার সহজ উপায় এই বীজ ভাঙ্গিলে উহার মধ্যে যদি প্রথমে পীত ও পরে সোনার ন্যায় রং হয়, তবে উহা উৎকৃষ্ট। উহার অন্যথা হইলে সে বীজে ভাল গাছ হয় না। প্রত্যুতঃ সমুদায় পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। বাস্তবিক বীজ মধ্যে যখন সমুদায় আশা ভরসা ও পরিশ্রমের পুরস্কার নিহিত আছে, তখন সর্ব্বাগ্রে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মৃত্তিকা ও সার——দোঁয়াস মৃত্তিকায় কপি ভাল হয়। সকল জাতীয় কপিই একরূপ মৃত্তিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কপি রোপণের পূর্ব্বে মাটি তৈয়ার করিয়া রাখিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাস দিয়া ঘাস মুথা

প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বিঘা প্রতি কুড়িমণ খৈল ক্ষেত্রে দিতে হয়। খৈল ভূমিতে ছড়াইয়া না দিয়া দেড় হাত অন্তর এক একটী খুপি কাটিয়া তাহাতে দেওয়া উচিত। অগ্রে খৈল দিয়া রাখিলে তাহা পচিয়া মৃত্তিকার সহিত উত্তম মিশ্রিত হইতে পারে, যে কোন সার না পচিলে উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয় না। অনন্তর আশ্বিন মাসের প্রথমে উক্ত খুপি সকলের দুই পাশে দাঁড়া ও মধ্যে জোল করিয়া প্রত্যেক খুপিতে এক একটী চারা পুঁতিতে হয়। ক্ষেত্রে চারা কিছু বড় হইলে পুনরায় অন্ততঃ পাঁচ মণ খৈলের গুঁড়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত। সকল কপির পক্ষে সমান খৈলের সার আবশ্যক করে না। যে পরিমাণে সারের কথা লিখিত হইল, তাহা বাঁধা কপির পক্ষে প্রশস্ত। ফুল কপির ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি প্রথমে ১৬৴০ মণ পরে চারি মণ খৈল দিতে হয়। ওল কপিতে প্রত্যেক বিঘায় মোট দশমণ খৈলের সার দিলে যথেষ্ট হয়। অনেক স্থলে এরূপও করিতে দেখা গিয়াছে, কপি ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার সার না দিয়া মাঘ মাসে পলিমাটি তুলিয়া দিয়া থাকে। এবং ভাদ্রমাসে ছাপোরে চারা তৈয়ার করিয়া আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন ও গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য পাইট করে না।

রোপণ প্রণালী——ভাদ্রমাসে কপির বীজ ফেলিতে হয়। উহা ক্ষেত্রে না ফেলিয়া প্রথমে গামলায় বপন করা ভাল। গামলায় বপন করিলে বিশেষ সুবিধা এই যে বৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ উত্তাপের সময় অনায়াসেই উহা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। বীজ বপণের পর অধিক বৃষ্টির জল পাইলে উহা পচিয়া যায়, এবং অন্য স্থানে ভাসিয়া যাইতেও পারে। এজন্য প্রথমে গামলায় চারা প্রস্তুত করা উচিত। দোঁয়াস মাটিতে গামলা ভর্ত্তি করিতে হয়। এবং উপরিভাগের দুই ইঞ্চ্ পরিমিত মাটি চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম চালনী দ্বারা চালিয়া দিতে হয়। চালনীর অভাব হইলে হাতে করিয়া ভাল রূপ গুঁড় করিলেও চলিতে পারে। বীজ বপণের পর ঐ ধূলিবৎ মৃত্তিকা তাহার উপরে ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ বুনিয়া দুই দিন জল না দিয়া, তৃতীয় দিন হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সরু ধার বোমা করিয়া অল্প

পরিমাণে গামলায় জল দিতে হইবে। জলের ধারায় যদি বীজ কিম্বা চারার গোড়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে উক্ত প্রকার গুঁড় মাটি আস্তে আস্তে ছড়াইয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে বীজ বপণ করিলে প্রায় ৩।৪ দিনের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। লাল ও ওল কফি প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত গামলায় চারা বাহির না হয়, ততদিন উহা আবৃত স্থানে রাখা উচিত। এবং চারা বাহির হইলে এরূপ স্থানে রাখা উচিত যে স্থানে অধিক রৌদ্র কিম্বা ছায়া না পায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বীজ বপণ ও চারার অবস্থায় বৃষ্টির জলে বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য গামলায় যাহাতে বৃষ্টি না লাগে, তদ্‌পক্ষে বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক।

যখন দেখিবে গামলায় চারা সকল ৩।৪ টী পাতা ধরিয়াছে, এবং সতেজ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তখন অন্য গামলায় উহা তুলিয়া পাতলা করিয়া রোপণ করিতে হইবে। এই গামলার মৃত্তিকা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ প্রস্তুত করিতে হয়। গামলার অভাব হইলে উত্তমরূপ চাস দেওয়া মৃত্তিকায় সার দিয়া চৌকা করিতে হইবে এবং পাতলা করিয়া অর্থাৎ চারি অঙ্গুলি অন্তর উক্ত চারা সমূহ তাহাতে রোপণ করিলে চলিতে পারে। বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য চৌকা ৩।৪ ইঞ্চ উচ্চ করা আবশ্যক। চৌকার সর্ব্বদা সরু ধারায় বোমা করিয়া জল দিতে হয়। এবং মধ্যে মধ্যে উহা খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক; যে দিন মাটি খুসিয়া দিতে হয় সে দিন জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। এইরূপ নিয়মে চারা সকল কিছুদিন চৌকায় থাকিলে, যখন তাহারা পরিপুষ্ট হইবে, তখন তাহাদিগকে অতি সাবধানতার সহিত তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত খৈলের সারযুক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। চারা রোপণের পূর্ব্বে উক্ত খুপি সকল খুঁড়িয়া অল্প পরিমাণে জল দিয়া এক হাত অন্তর পুঁতিতে হইবে। যতদিন চারার ৮।১০ টী করিয়া পাতা বাহির না হয় ততদিন এই নিয়মে রাখিতে হইবে। অনন্তর দাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া ৭। ৮ দিন অন্তর জল দেওয়া আবশ্যক। এই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, তৃণাদি জঙ্গল পরিষ্কার রাখা এবং মাঝে মাঝে জল দেওয়ার প্রয়োজন। ভালরূপ পাইট করিলে ৫। ৬ সপ্তাহের মধ্যেই

কপি খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে বীজ গামলায় না ফেলিয়া একেবারেই চৌকা বা হাপোরে ফেলিয়া চারা তৈয়ার করিয়া থাকে। চৌকায় বীজ বপণ করিলে, তাহা দিবসে কোন রকম আবরণে ঢাকিয়া রাখা এবং রাত্রিকালে তাহা খুলিয়া দেওয়া উচিত। রাত্রিকালে আচ্ছাদন খুলিয়া দিলে, শিশির পাতে চারার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বাঁধা, ওল, ফুল প্রভৃতি যাবতীয় কপির রোপণ ও পাইট প্রণালী প্রায় একরূপ। এই সকল কপির মধ্যে ফুলকপি শীঘ্র উৎপন্ন হয়। বিঘা প্রতি বাঁধা কপি প্রায় ১৭৫, টাকা, ফুল কফি ১৫০, টাকা এবং ওল কফি ৭৫, টাকার হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। কপির চাসে লাভ নিতান্ত কম নহে।

কীটাদিতে কপির বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, উহার অনিষ্ট নিবার জন্য অঙ্গার চূর্ণ চারার উপরে ছড়াইয়া দিলে নিবারণ হইতে পারে। ভাদ্র হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া রোপণ করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত কপি ব্যবহার যোগ্য থাকে। ফুল কপির ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে পটাশ জলে গুলিয়া সিঞ্চন করিলে ফুল বড় হয়। কপি-মাত্রেরই চারা রোপণ করিয়া কিছু চারা চৌকায় মজুত রাখা উচিত, কারণ ক্ষেত্রস্থ কোন চারা যদি নিস্তেজ ও মরিয়া যায়, তবে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে সতেজ নূতন চারা বসান কর্ত্তব্য।

বীজ রক্ষা——পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ফুল কপির বীজ ভিন্ন আর কোন কপির বীজ এদেশে উৎপন্ন হয় না। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে মালীরা ফুল কপির বীজ ধরিয়া থাকে। উহার বীজ ধরিবার নিয়ম এই যে গাছের ফুল অত্যন্ত সতেজ এবং সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই গাছের ফুল না তুলিয়া বীজের জন্য গাছ রাখিতে হয়। কিছুদিন পরে ঐ ফুল ফুটিয়া সরিষার ন্যায় ডাল বা শিশের চারিদিকে সোঁটা ধরিতে থাকে। এবং প্রত্যেক সোঁটার মধ্যে সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা জন্মে। এই অবস্থায় অতি সাবধানের সহিত গাছের গোড়ায় অধিকদূর মাটির চাপের সহিত উহা তুলিতে হয়। এবং ঐ চাপ পরিমিত একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে উক্ত গাছ পুঁতিতে হয়। গাছ পুঁতিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া

ফেলা আবশ্যক। এইরূপ কাটাকে "খাসি কাটা" বহে। "খাসি কাটা" গাছে বীজ সুপক্ক হইলে উহা তুলিতে হয়। বীজ তুলিয়া শুঁটি হইতে পৃথক্ করিয়া বোতল মধ্যে রাখা উচিত। যে বোতলে বীজ থাকিবে তাহার মুখ উত্তমরূপ বন্ধ থাকা আবশ্যক। বৎসবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত বোতল রৌদ্রে দিয়া রাখিলে বীজেব কোন অনিষ্ট হয না। পাটনায় ফুল কফির উৎকৃষ্ট বীজ জন্মিযা থাকে। চেষ্টা করিলে শীতকাল ভিন্ন অন্যান্য সময়েও ফুল কপি হইতে পারে, কিন্তু শীতকালেব ন্যায় উহা তত সুখাদ্য হয না।

শালগম——ইহা তরকারীতে ব্যবহাব হয়। আকার ও বর্ণ ভেদে নানা প্রকার শালগম দেখা যায। কোন কোন জাতীয় শালগমেব পত্র সুখাদ্য, কোন কোন শালগমের মূল উত্তম। ফলতঃ যাহাব মূল সুখাদ্য তাহাব পত্র তত ভাল নহে, আবাব যাহাব পত্র সুখাদ্য তাহার মূল সুস্বাদু নহে। আর্লি হোযাইট্, ব্লাকস্কিন, হুপব্স্-ইম্প্রুবড্ নন্সচ, প্রভৃতি শালগমেব মূল সুখাদ্য। আব সুইড্ জাতীয শালগমেব পত্র উৎকৃষ্ট।

হাল্কা বেলে মাটিতে এই সবজী ভাল হইযা থাকে। ভাদ্রমাসে বিঘা প্রতি চারি মণ খৈল দিয়া রাখিতে হয। ভাদ্রেব শেষে কিম্বা আশ্বিন মাসে যো হইলে চৌকায় কিম্বা আলির উপব বীজ বপণ করিতে হয। অনূ্যন দেড় ছটাক বীজ হইলে এক কাঠা ভূমির উপযুক্ত হয়। মৃত্তিকায় কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া চাস করিলে ফসল ভাল হয়। চৌকায চারা সকল ৩।৪টী পত্রবিশিষ্ট হইলে, তখন তাহা তুলিযা আট আট অঙ্গুল অন্তর ক্ষেত্রে রোপণ কবা আবশ্যক। এই সময হইতে সর্ব্বদা ক্ষেত্র পরিষ্কার, গাছের গোড়ায মাটি ধবান ও অল্প অল্প খুঁড়িযা দেওযা এবং জল সেচন করা কর্ত্তব্য। কীট ও পতঙ্গাদি লাগিলে কাষ্ঠের ছাই গাছে ছড়াইয়া দিলে উহারা মরিযা যায়। সচরাচর অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত শাল-গম পাওযা যায়। প্রত্যেক বিঘায় প্রায ৫০৲ টাকার সব্জী বিক্রয় হইয়া থাকে।

গাজর——ইহা ব্রীটন্ দেশে প্রচুব জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে এদেশেও উহার চাস হইতে আবম্ভ হইয়াছে। গাজর এক প্রকাব মূলা জাতীয়।

বালি মিশ্রিত ঝুরা মৃত্তিকায় ইহা ভাল হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসে বিঘা প্রতি তিন মণ খৈলের সার দিয়া জমী প্রস্তুত করিতে হয়। গাজরের ক্ষেত্র যত গভীর করিয়া খনিত হয় ততই ভাল। ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গাজর চাসের সময়। ইহার বীজ অত্যন্ত লঘু, যে দিন বাতাসে জোর থাকে, সে দিন উহা বপণ করিলে, বায়ু ভরে স্থানান্তরে উড়িয়া যাইতে পারে। এজন্য স্থির বাতাস দিনে বীজ বপণ করা উচিত। দেড ছটাক বীজে এক কাঠা জমীর চাস হইতে পারে। গাছ বড হইতে আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে মাটি খুসিয়া দেওয়া ও জল সেচন করা আবশ্যক। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত গাজর পাওয়া যায়। ফসল ভাল হইলে বিঘা প্রতি ৯০, টাকা বিক্রীত হইতে পারে।

এত্তা ও স্বরতি মূলা——ইংরাজী ভাষায় ইহাকে রেডিস কহে। ইহাও এক প্রকার মূলা জাতীয়। রেডিস চাসে বিঘা প্রতি চারি মণ খৈল দিতে হয়। ক্ষেত্র যত গভীর করিয়া খনিত হয় ততই ভাল। বীজ বপণের পূর্ব্বে ক্ষেত্র উত্তমরূপ পাইট করিতে হয়. অর্থাৎ ঘাস মুথা প্রভৃতি বাছিয়া মৃত্তিকা সুন্দররূপ চূর্ণ করিতে হইবে। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত রেডিস্ চাসের প্রশস্ত সময়। এই সবজীর ক্ষেত্রে সর্ব্বদা জল সেচন দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত রাখা আবশ্যক। ইহার অন্যান্য পাইট শালগম চাসের ন্যায়। ফসল ভালরূপ জন্মিলে বিঘা প্রতি ৪০, টাকা বিক্রীত হইতে পারে।

বিদেশীয় পলাণ্ডু——পিয়াজ মাত্রেই এদেশে উত্তম জন্মে। সচরাচর শ্বেত, পীত ও লোহিত এই তিন প্রকার পলাণ্ডু দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের মধ্যে শ্বেত পলাণ্ডুর আকার অতি বড। এদেশে উহা মাদ্রাজী পিয়াজ বলিয়া বিখ্যাত। দোঁয়াস মাটিতে পিয়াজ ভাল হয়। ভাদ্রমাসে পিয়াজের জমীতে কুড়ি মণ খৈলের সার দিতে হয়। প্রথমতঃ আশ্বিনমাসে ছাপোর করিয়া তাহাতে পিয়াজ বসাইতে হয়, চারা কিছু বড হইলে আশ্বিনের শেষ অথবা কার্ত্তিকের প্রথমে ৪।৫ অঙ্গুলি অন্তর পাটির উপর এক একটী চারা রোপণ করিতে হয়। পাইটের মধ্যে ক্ষেত্রে জঙ্গল হইতে না দেওয়া, মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুসিয়া মাটি আলগা রাখা এবং সর্ব্বদা জল সিঞ্চন দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্র রাখা আবশ্যক। পৌষ মাস হইতে উহা

তুলিতে আরম্ভ হয়। বিঘা প্রতি অন্যূন ৮০,০ মণ পিয়াজ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মণ গড়ে ২॥০ টাকা হইতে ৩, টাকা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

লীক——ইহাও পলাণ্ডু জাতীয় এক প্রকার মূল. তরকারীতে ব্যবহার হয়। ইহার চারা উৎপাদন করিতে হইলে একটু টিকোল জমীতে হাপোর প্রস্তুত করিতে হয়। হাপোরের মাটিতে উত্তমরূপ সার মিশ্রিত করা আবশ্যক। আশ্বিনের শেষ অথবা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বীজ ফেলিতে হয়। হাপোরে চারাগুলি এক বিঘত বড় হইলে তাহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

বিটপালং———ইহার মূল তরকারীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। নানা জাতীয় বিট্ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে লাল ও সাদা বিটই অত্যন্ত সুখাদ্য। লোনা জমিতে এই সব্জী উত্তম জন্মে। বিট্ বড় হইলে তরকারীর তত উপযুক্ত হয় না. কারণ তখন উহা কঠিন ও আঁশ বিশিষ্ট হইয়া উঠে। যে মৃত্তিকায় বালির ভাগ অধিক এরূপ দোঁয়াস মাটিতে ইহার চাস ভাল হইয়া থাকে। মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে খনিত হইলে মূল বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। ভাদ্রমাসে বিঘা প্রতি অন্যূন পাঁচ মণ হিসাবে রেড়ি বা সরিষার খৈলের সার দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আশ্বিন মাসের প্রথমেই বীজ বপণ করিতে হয়। শীঘ্র গাছ করিতে ইচ্ছা হইলে ভাদ্র মাসে গামলায় অথবা অন্য কোন পাত্রে বীজ বপণ করিয়া চারা তৈয়ার হইলে তাহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলে হইতে পারে। চারা তুলিবার সময় যাহাতে শিকড় না ছিঁড়িয়া যায়, তদ্‌পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সচরাচর ভাদ্র মাসেই বিট্ রোপণের সময়। অগ্রহায়ণ মাসে উহা খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। বিটের অন্য কোন প্রকার বিশেষ পাইট করিতে হয় না, মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সেচন এবং ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে হয়। এই সবজীর চাসে লাভ মন্দ নহে। ভালরূপ ফসল হইলে প্রত্যেক বিঘায় ৭০।৮০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে।

ছালাদ———ইহা শাক জাতীয়, রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। সাহেব দিগের নিকট ছালাদের অত্যন্ত আদর। বিঘা প্রতি প্রায় ৫০। ৬০ টাকার সবজী বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মালীগণ ইহার চাসে

বিলক্ষণ লাভ করিয়া লয়। প্রত্যেক বিঘায় অন্যূন ১১। ১২ মণ খৈলের সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়, ভাদ্রমাস ক্ষেত্র প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। ছালাদের বীজ হাপোরে বপণ করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়। একেবারে বীজ বপণ না করিয়া ভাদ্র হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত অগ্রে পশ্চাৎ করিয়া আবাদ করা ভাল। হাপোরে চারা ৩। ৪ অঙ্গুল বড় হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। চারা পুঁতিবার পূর্ব্বে ক্ষেতে পটি ধরাইতে হয় এবং প্রত্যেক পটিতে অন্ততঃ আধ হাত অন্তর চারা রোপণ করা আবশ্যক। গাছ ঘন হইলে ঝাড় হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। সচরাচর এক মাসের মধ্যেই ছালাদ আহারের উপযুক্ত হইয়া উঠে। এই সবজীর চাসে বিশেষ কোনরূপ পাইট করিতে হয় না। অন্যান্য শাকের জমি যেমন ঘাস মুথা তুলিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুসিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে, ইহার পক্ষেও সেইরূপ নিয়ম প্রতি পালন করা উচিত। ক্ষেতে সর্ব্বদা জল না দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, তবে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন দ্বারা ক্ষেত্র রসাল রাখা আবশ্যক।

বীজ———ছালাদের বীজ অতি ক্ষুদ্র চেপ্টা সাদা। বীজের উৎকৃষ্টতানুসারে চাসের ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে ভাল বীজ সংগ্রহ হয়, তদ্‌পক্ষে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। বিদেশীয় অধিকাংশ সবজীর বীজ সঁ্যাতা স্থানে রাখিলে অথবা জলীয় বাতাস লাগিলে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বীজ রক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অতীব আবশ্যক। এণ্ডিব ও কস্‌ নামক আর দুই জাতীয় ছালাদ আছে। কিন্তু উহাদিগের চাস ও পাইটাদি ছালাদ চাসের ন্যায়। কেবল কস্‌ ছালাদের গাছ কিছু বড় হইলে খড় জড়াইয়া দিতে হয়। খড় জড়াইয়া দিলে গাছের বর্ণ সাদা হইয়া থাকে। গাছ ও পাতা সাদা হইলে আহারের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ।

কৃষি-কার্য্য।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।"

ভারত কৃষি-প্রধান দেশ, অত্রস্থ কৃষিজাত দ্রব্যই ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্পত্তির এক মাত্র কারণ। ভারত ক্ষেত্র যে পৃথিবীর সকল জাতির একমাত্র প্রার্থনীয় কৃষিই তাহার প্রধান মূল! যে দেশে সহজে অন্ন বস্ত্রের সংকুলান হয়, মৃত্তিকা অনন্ত রত্ন রাজী প্রসব করে সে দেশ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। ভারতের সুখ সমৃদ্ধি, ভারতের অন্নের স্বচ্ছলতা নিবন্ধন পৃথিবীতে এমন কেহই ছিলেন না যিনি ভারতের লোভে আকৃষ্ট না হইয়াছেন! ভারত উর্ব্বরা ক্ষেত্র, ভারত পৃথিবীর অন্নদাতা, ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য সংসারকে প্রতিপালন করিতেছে। বাস্তবিক সংসারে যত কিছু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র কৃষিই যে তাহার প্রধান কারণ ইহা কে না স্বীকার করিবেন। সংসারের যাহা কিছু উন্নতি অবনতি এক মাত্র কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে ধনাগমের যদিও অসংখ্য দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষি কার্য্য না থাকিলে সমুদায় যে চির দিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। এক মাত্র কৃষিই এই সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করিতেছে। জগদীশ্বর কৃষিকার্য্যের উপর জগতের জীবন নির্ভর করিয়া রাখিয়াছেন। রাজার প্রাসাদ হইতে সামান্য দরিদ্রের পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত দেখ কৃষিজাত দ্রব্য জনিত সর্ব্বত্রই আনন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। পণ্ডিত প্রবর ওয়েবেষ্টর মহোদয় বলিয়াছেন "কৃষির সহিত আমাদিগের অতি নিকটতর সম্বন্ধ, কৃষিই আমাদিগকে পোষণ করিতেছে; কৃষি ব্যতীত আমরা কখনই শিল্প কিম্বা বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইতাম না"। বাস্তবিক কৃষিকার্য্যই দেশের ধনবৃদ্ধির এক মাত্র ফল প্রসূ উৎস, ইহারই উপর দেশের স্বচ্ছলতা ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, কৃষিজাত দ্রব্য দেখিয়াই দেশের উন্নতি অবনতি বিচার করিতে পারা যায়।

পৃথিবীর সকল দেশের অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, বাণিজ্য দ্বারা অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইয়া থাকে।০ কিন্তু এস্থলে ইহা দেখা উচিত কৃষি না থাকিলে বাণিজ্য এই শব্দটী অবিধানে দৃষ্ট হইত না। কৃষি বাণিজ্যের সবিতা; কৃষিজাত দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্যের জীবন সংগঠিত হইয়া থাকে, অতএব বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে কৃষি জগতের উন্নতি ও সংস্কার করা আবশ্যক। কৃষি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলে বাণিজ্য ও সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্টব হয় না। যে দেশে বাণিজ্যের যে পরিমাণে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইযাছে, সে দেশের লোক সমূহ সেই পরিমাণে জ্ঞানী ও সুসভ্য এবং তাঁহারা কৃষি বিছারও উপকারিতা সম্যক অবগত হইয়া তাহার উন্নতি কল্পে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। পৃথিবীব মধ্যে আমেরিকা ও ইয়ুরোপ উন্নতিপদবীতে আবোহণ করিয়াছে, তত্রত্য অধিবাসিগণ বিদ্যা বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য দ্বারা জগতের শিরোভূষণ হইয়াছেন, তাঁহাদের বাণিজ্যের জযপতাকা সর্ব্বত্রই উড্ডীয়মান হইতেছে, তাঁহাদের শিল্প বিদ্যা প্রভাবে সংসাব অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, জাতীয় গৌরব, জাতীয় উন্নতি তাঁহাদেব দেশেব প্রত্যেক পরমাণু ঘোষণা করিতেছে, এই সকল উন্নতিব মুল দেশে দৃষ্টি কব কৃষি কার্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহারা কৃষি কার্য্যের উপকারিতা সম্যক বুঝিতে পারিযাছেন বলিয়াই উহাকে অপমানজনক নীচ বৃত্তি বিবেচনা করেন না। ঐ সকল দেশের মহাত্মাদিগের যত্নে কৃষি জগতের যুগান্তব উপস্থিত হইয়াছে'বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ভাবতে কৃষি কার্য্যের যে অতি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইযাছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুসভ্য দেশ মাত্রেই কৃষি কার্য্যের বহুল পবিমাণে উন্নতি হইতেছে। কৃষিজাত দ্রব্য সমুহের উপর সভ্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর হইয়া রহিয়াছে। ভারতাকাশে যখন সভ্যতা সূর্য্য সমুদিত ছিল, ভাবতের বিদ্যার জ্যোতিতে যখন পৃথিবী আলোকিতছিল, তখন ভারতেরও কৃষি কার্য্যেব প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইত। বাণিজ্যে বশতা লক্ষ্মীঃ অর্থ শাস্ত্রের এই বীজ মন্ত্র ভারত বক্ষঃ হইতেই প্রথমে উত্থিত হইয়াছিল। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে,

ভারতবাসিরা কখনই বাণিজ্যের আস্বাদন অনুভব করিতে পারিতেন না। ভারত ক্ষেত্র যেমন উর্ব্বরা, সেই রূপ পূর্ব্বকালে কৃষি কার্য্যেরও যার পর নাই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এক্ষণে কাল সহকারে কৃষিকার্য্য দিন দিন যে রূপ অবনতি পথে চালিত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যও সংকীর্ণ-ভাব ধারণ করিয়া ভারতের দুর্দ্দশার এক শেষ করিতেছে। যাহা দেশের ধন প্রাণ ও শোণিত, যাহার উপর সভ্যতার জীবন বায়ু সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সেই কৃষি কার্য্য বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন পশুবৎ সামান্য কৃষক-গণের উপর রাখিয়া ভারত বাসিরা নিশ্চিন্ত আছেন। ভারতের প্রতি ঈশ্বরের অত্যন্ত দয়া, ভারত ক্ষেত্রে নিতান্ত উর্ব্বরা সেই জন্যই এদেশে অন্নের স্বচ্ছলতা দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রস্থ লোক দিগের কৃষিকার্য্যের প্রতি যেরূপ অযত্ন, অন্য কোন দেশ হইলে অন্নাভাবে এতদিন যে কি ভয়ানক কষ্টের রঙ্গভূমি হইত, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

এদেশে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল দোষের মধ্যে কুসংস্কার একটী পরম শত্রু। অন্তর লিপ্ত কীটের ন্যায় এই শত্রু ভারতের দেহ পঞ্জর ক্রমে ক্রমে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ যে কৃষি তাহাতেও এই শত্রু প্রবেশ করিয়া মহা অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জাতি ভিন্ন সাধারণ লোকে কৃষিকার্য্য অর্থাৎ হলচালনা প্রভৃতি বিশুদ্ধ কর্ম্ম পাপজনক ভদ্র-লোকের পরিত্যজ্য বলিয়া দেশের লোকের সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভদ্রসন্তানগণ প্রাণান্তেও ইহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। সামান্য কৃষক শ্রেণী পরম্পরাগত সংস্কারের অধীন হইয়া দুর্ব্বল গো, অকর্ম্মণ্য লাঙ্গল লইয়া দেশের অন্নের সংস্থান জন্য ব্যস্ত। কৃষির উন্নতি যে বিজ্ঞান সাপেক্ষ তাহা তাহারা কস্মিন কালে স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। যে কার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে হয়, সেই গুরুতর কার্য্যভার সামান্য কৃষকগণের প্রতি অর্পিত হইলে, তাহা কখনই উন্নতি পথে গমন করে না। দেশ যতই উন্নতি পথে আরূঢ় হইবে, বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যার যতই আলোচনা হইবে, ততই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়া

দেশের ধনবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি, হইতে থাকিবে। সহস্র সহস্র মনুষ্য সমস্ত দিবসে যে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, বিজ্ঞান বলে সামান্য অঙ্গার জল ও অগ্নি দ্বারা সেই কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যে সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া সংসারের সুখবৃদ্ধি হইতে পারে। কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে বিজ্ঞান ও রসায়ণ শাস্ত্র অধ্যযন করা একান্ত আবশ্যক। আমেরিকা ইয়ুরোপবাসীরা কৃষি ব্যবহার্য্য বহুবিধ অস্ত্র যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া কৃষিকার্য্যের যার পর নাই উপকার করিয়া তুলিযাছেন, আমাদের দেশে উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া বিস্তর অনিষ্ট করিতেছে। কি কৃষি, কি শিল্প কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই ভারত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে। ভারতের সে জ্বলন্ত উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসা, স্বাধীন জীবিকার বলবতী ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইতেছে। ভারত এখন অধীনতা ব্রত আশ্রয় করিয়া পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীদিগের হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত শৈত্যভাব ধারণ করিতেছে। ভারতের যদি জীবনী শক্তি থাকিত, ভারতের যদি পুরুষত্ব লক্ষিত হইত, ভারত যদি বংশ মর্য্যাদা বুঝিত, ভারত যদি আত্মগৌরব রাখিতে যত্ন করিত তাহা হইলে এরূপ দুর্দ্দশা কখনই লক্ষিত হইত না। ভারতবাসীগণ যে পরিমাণে পরিশ্রম, যত্ন, উৎসাহ, চাকুরীর জন্য করিয়া থাকেন, তাহা যদি কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত হইত, তবে আজ ভারতের যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ঘটিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কৃষিকার্য্যে যদি এত উন্নতি, এত ধন বৃদ্ধি তবে এতদ্দেশীয় কৃষকগণের এরূপ দুরবস্থা কেন? কিন্তু যাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন অনেক ভদ্র চাকুরে অপেক্ষা অনেক কৃষকের গৃহে অন্নের স্বচ্ছলতা আছে। এতদ্দেশে কৃষকদিগের যে অবস্থা এত শোচনীয় তাহার প্রচুর কারণ আছে। একে তাহারা মূর্খ, নিজের বুদ্ধি পরিচালিত করিয়া কৃষিকার্য্যের কোন রূপ উন্নতি বিধান করিতে অসমর্থ। প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উৎপন্ন করিয়া থাকে, মহাজন ও জমীদারবর্গ আবার জলৌকার ন্যায় সেই নীরহ কৃষকদিগের হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ শস্যাদি সমুদায় শোষণ করিয়া থাকেন। মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশ সালা বন্দোবস্তে ভূমির সহিত কৃষকদিগের কোন সম্বন্ধ

নিরূপিত নাই। ভাড়াটিয়া গৃহের ন্যায় ভূমির সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ। তাহারা কায়িক পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয় করিয়া যেই ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে, অমনি জমীদারগণের চোক টাটাইয়া উঠে, তাঁহারা তাহার কর বৃদ্ধি করিয়া কৃষকের পরিশ্রমের পুরস্কার দিতে ক্রটি করেন না, ভূমির সহিত কৃষকদিগের যতদিন এরূপ সম্পর্ক থাকিবে, ততদিন ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির পথ কণ্ঠকাকীর্ণ থাকিবে। দেশীয় জমীদারগণ ভূমির প্রজননশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা যদি কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে খাল খনন, বাঁধ প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী হয়েন, এবং ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সুসভাজন পদে যে সকল উপায় অবলম্বন করাতে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উপকার হইয়াছে, সেই সকল উপায় স্বীয় স্বীয় জমীদারীতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের যে কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয় বলিযা শেষ করা যায় না। ভূমির প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি হইলে, সহজেই কর বৃদ্ধি হইয়া আয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। লাভ জনক শস্যের চাস দেশমধ্যে প্রচলিত করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধির উপায় করিতে হয়। ফলতঃ এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি যে জমীদারবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় জমীদারগণ এই মহৎ ভার গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কৃষিকার্য্য কিম্বা প্রজাগণের উন্নতি কল্পে তাঁহাদের কোন চেষ্টাই নাই। তাঁহারা প্রজা পেষণ যন্ত্রের ন্যায় প্রজাগণকে পেষণ করিয়া যাহা সংগ্রহ করেন, তাহা মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি নানা প্রকার সখে ব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে" বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। জমীদারবর্গ আবার বহু অংশীদার হইলে চটকস্ত মাংসের ন্যায় জমীদারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে দেশীয় জমীদার সমুহ অধিক দিন উন্নতাবস্থায় থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি আপনাদিগের অবস্থা উন্নতি, প্রজাদিগের উপকার সাধন করিতে নীলকর, চাকর, রেশমকর সাহেবদিগের ন্যায় স্বীয় স্বীয় জমীদারীতে নীল, চা, রেসম, কুইনাইন্ প্রভৃতি আয়জনক চাস ও তাহাতে শিল্প এবং বাণিজ্য যোগ করেন, তাহা হইলে প্রভূত ধনাগম হইতে পারে। বাস্তবিক কৃষিকার্য্যের সহিত শিল্প ও বাণিজ্যের যোগ না হইলে আশানুরূপ লাভ

হয় না। উক্ত সাহেবগণ এতদ্দেশে ইজারা, পত্তনী, জমদারী লইয়া নীল, চা, রেসম প্রভৃতি চাস ও বাণিজ্য দ্বারা যেরূপ আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, হিসাব করিয়া দেখিলে জমীদারীর আয় অপেক্ষা উহা সহস্রগুণে অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ওয়াটসন কোম্পানি প্রভৃতি কৃষকগণ যেরূপ ধনকুবের হইয়াছেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এইরূপে জমীদারীতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে জমীদারগণের আয় বৃদ্ধির সহস্র পথ উদ্ঘাটিত হয়।

এদেশে মূলধন না থাকাতে কি কৃষি কি শিল্প কি বাণিজ্য কোন বিষয়েই উন্নতি হইতে পারে না। ধন যে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি স্বরূপ তাহা কে না স্বীকার করিবেন। মূলধন বিহীন হওয়াতে ঐ সকল প্রত্যক্ষ লাভ জনক কার্য্যে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। আবার পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় যাহাদিগের ধন আছে, তাহাদিগের ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, এবং যাহাদিগের প্রবৃত্তি আছে তাহাদিগের ধন নাই। এই পরস্পর বিরোধী অবস্থা নিবন্ধন কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি লক্ষ্য হয় না। ধন ব্যক্তি বিশেষের হস্তে আবদ্ধ থাকিলে তদ্দারা কোন উপকার সাধিত হয় না। উহা যতদেশ মধ্যে নানা প্রকার কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, ততই দেশের অবস্থা উন্নত, এবং ধন ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে ধনী মহোদয়গণ সাধারণ হিতকর কৃষি, শিল্প কিম্বা বাণিজ্য কার্য্যে মূলধন প্রদান করেন না। ধন স্বজাতি স্বদেশের হিতকর কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন নাই। উহা যতই কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। এতদ্দেশে যদিও কোন কোন জমীদার স্ব স্ব জমীদারীর মধ্যে দুই একটী নীলের কুঠী করিয়াছেন, কিন্তু সুবন্দোবস্তের দোষে সাহেবদিগের ন্যায় তত লাভবান হইতে পারেন না।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধে আর একটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশের লোক সমূহ দুর্ব্বল প্রকৃতি, কোন কার্য্যে উপযুক্ত সাহস কিম্বা বিশ্বাস নাই। ইংরাজগণ যেমন বিশ্বাস ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া

জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানির আকারে লাভজনক নানা প্রকার স্বাধীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করেন, এতদ্দেশীয়েরা সে রূপ করিতে সমর্থ নহেন। দেশের উন্নতি পক্ষে ইহাও একটী মহৎ অন্তরায়। যেমন মৃত শরীরে হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিয়াও কিন্তু এক জীবন না থাকাতে সকলই বৃথা, সকলেই নিশ্চেষ্ট সেই রূপ ভারতের সমুদায় বর্ত্তমান থাকিতেও এক স্বাধীন ইচ্ছার অভাবে সকলই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের কতস্থানে কত উর্ব্বরা ভূমি শস্য পতিত রহিয়াছে, জল, বায়ু অনুকূল থাকিয়া পর্য্যায়ক্রমে সঞ্চারিত হইতেছে প্রভূত অর্থ ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, কিন্তু ভারতের উৎসাহ নাই, ভারতের স্বাধীন জীবিতার বলবতী প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ভারত জীবন থাকিতে মৃতপ্রায়, হস্ত পদ থাকিতে বিকলেন্দ্রিয়, মান সম্ভ্রম থাকিতে কাপুরুষ, এবং প্রভূত অন্নের সংস্থান থাকিতেও পরপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী। ভারত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় এক অঙ্গের বেদনা অন্য অঙ্গে স্পর্শিত হয না, ব্যক্তি বিশেষের অর্থজাত উপকার স্রোত জাতি সাধারণে সঞ্চারিত হয না। ধনীগণ অবিরা বালিকার ন্যায় পূর্ব্ব পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থরাশি সুখে উপভোগ করিতেছেন, দেশের জন্য স্বজাতির জন্য একবারও দৃষ্টি করেন না। তাহাদের বর্দ্ধ অর্থরাশি যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে সমর্পিত হইত, তাহা হইলে ভারত কখনই পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সম্ভ্রম, পূর্ব্ব মর্য্যাদা এবং পূর্ব্ব সম্পত্তি হারাইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতেন না। ভারতকে কামধেনুর ন্যায় দোহন করিয়া বিদেশীয়গণ উদর পূর্ণ করিতেছেন, ভারত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পৃথিবী ধন কুবের হইতে, ভারতক্ষেত্রের শস্যাদি লইয়া বন্য-জাতি লক্ষ্মীমান হইতেছে, এমন অন্নক্ষেত্র পাইয়াও ভারতে অন্নের অভাব, এমন রত্নের আকর পাইয়াও ভারত নির্ধন ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! যে দেশে পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ" সেই ধনধান্য পরিপূর্ণ ভারতক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের প্রতি এত অশ্রদ্ধা, এত অনুৎসাহ, এত ঘৃণা ইহা যারপর নাই আক্ষেপের বিষয় !!

অহিফেণ।

——oo——

বিহার প্রদেশে অহিফেণ চাস শ্রীযুক্ত মৌলবী আতাওল হক কর্তৃক লিখিত।

যদিও পৃথিবীর নানা স্থানে অহিফেণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষজাত অহিফেণের পরিমাণ ও গুণ তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বরং অনেক স্থলের অহিফেণ অপেক্ষা এখনকার অহিফেণ উৎকৃষ্ট।

অহিফেণ এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য, ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই জীবন নাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুস্থ শরীরে অহিফেণ অতি অনিষ্টকর। ইহা ব্যবহারে মনুষ্যদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। অহিফেণের মাদকতাশক্তি আছে, তজ্জন্য উহা দ্বারা বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রোগ বিশেষে অহিফেণ অত্যন্ত উপকারী। অহিফেণ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, আটার ন্যায়, অত্যন্ত তিক্ত। চীন দেশীয়েরা অত্যন্ত অহিফেণ প্রিয়, বাঙ্গালাদেশে তামাক ব্যবহার করা যেমন সামাজিক নিয়ম, চীন দেশেও সেইরূপ অহিফেণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অহিফেণ দ্বারা নানা প্রকার মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

বঙ্গদেশে অহিফেণের চাস নাই, বিহার প্রদেশে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'অন্যান্য শস্যের ন্যায় যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই অহিফেণের চাস করিতে পারে না। গাঁজা অহিফেণ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে ঐ সকল দ্রব্যের চাস করিলে আইন অনুসারে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইতে হয়। যদিও ইহা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কতকগুলি নিয়মাবদ্ধ হইয়া চাস করিতে হয়, কিন্তু অহিফেণ চাসে লাভ নিতান্ত অল্প নহে।

অহিফেণ গাছকে পোস্তা গাছ কহে। কুকুর শুঁকা গাছের সহিত এই গাছের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পোস্তা ফলকে ঢেড়ি কহে, উহার আকার কাগচী লেবুর ন্যায়। ঢেঁড়ির মধ্যভাগ মৎস্যের ডিমের ন্যায় ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র দানায় পরিপূর্ণ। পোস্ত দানা তরকারীর কার্য্য করিয়া থাকে। ঢেঁড়ির গাত্র হইতে খদিরের ন্যায় যে আঠা নির্গত হয় তাহাকে অহিফেণ কহে, অনেকে অহিফেণের সহিত খদির মিশ্রিত করিয়া ঠকাইয়া থাকে।

অহিফেণের দুই জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় গাছের ফুল লাল এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু ফল অতিশয় ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য অহিফেণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কৃষকেরা ইহার আবাদ করে না। এমন কি যদি কোন রকমে ক্ষেত্রে উহা উৎপন্ন হয় তবে তাহা তুলিয়া ফেলে। ইহার ফলের সৌন্দর্য্য জন্য অনেকে উহা উদ্যানে রোপণ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার গাছে শ্বেতবর্ণ পুষ্প হইয়া থাকে। এই জাতীয় গাছে প্রচুর অহিফেণ উৎপন্ন হয়। অহিফেণ চাসে অত্যন্ত পরিশ্রম, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পোস্ত রোপণের প্রশস্ত সময়। বীজ রোপণের পূর্ব্বে ভূমি ৮। ১০ বার কর্ষণ করিতে হয়, কর্ষণের পর যে সকল ঢেলা থাকিবে, মুদ্গার দ্বারা তদ্‌সমুদায় উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকা ধুলির ন্যায় করিতে হয়। বিঘাপ্রতি ১।০ কিম্বা ১॥০ সের পরিমাণে বীজ বপণ করিতে হয়। বীজ সকল ধুলার ন্যায় মৃত্তিকা চূর্ণে উত্তমরূপ মিশাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে জলের ছিটা দিয়া বুনিতে হয়। বীজ বপণের পর পুনরায় দুইটী চাঁসও মই দিতে হয। ক্ষেত্রে ৪। ৫ হাত অন্তর কাসারি করিয়া দিতে হয় এবং চারা বাহির হইলে ২। ৩ বার জল সেচন করিতে হয়। গাছ কিঞ্চিৎ বড় হইলে ঘাস মুথা প্রভৃতি নিড়াইয়া দিতে হয়। বীজ ঘন করিয়া বপণ করিলে গাছ সবল হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে এবং অহিফেণ ভালরূপ উৎপন্ন হয় না, এজন্য কৃষকেরা গাছ ঘন হইলে কতক চারা তুলিয়া ফেলে। অহিফেণ ক্ষেত্রে ৮। ১০ দিন অন্তর জল সেচন করা আবশ্যক। এবং "বাত" হইলে উহা খুঁড়িয়া দিতে হয়। যে স্থানে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ রসাল তথায় জলসেচন না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। মুঙ্গের ত্রিহুত, মতিহারী প্রভৃতি স্থান সমূহে তাদৃশ জলসেচন ব্যবস্থা নাই। পোস্ত ফুল স্বাভাবিক অতি সুন্দর, যে সময় সমুদায় ক্ষেত্র পুষ্পিত হয় তখন মাঠ আলো করিরা থাকে। পোস্ত ফুলেতেই ফল জন্মিয়া থাকে যখন দেখিবে

ফলের আর বৃদ্ধি-শক্তি নাই, উহা সম্পূর্ণ আকারে পরিণত হইয়াছে, তখন উহা চিরিয়া দিতে হয়। সন্ধ্যার পুর্ব্বে ঢেঁড়ি সকল পাঁচনী নামক যন্ত্রদ্বারা অতি সাবধানে চিরিয়া দিতে হয়; অর্থাৎ এরূপ সতর্কতা সহকারে চিরিতে হইবে যে অল্প পরিমাণে চিরিলে ভালরূপ অহিফেণ নির্গত হইবে না এবং অধিক গভীর করিয়া চিরিলে ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফল চিরিয়া রাখিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে দেখিবে ঐ চির হইতে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইয়াছে, ইহা কেই অহিফেণ কহে। প্রতিদিন অপরাহ্নে উক্ত প্রকারে ফল চিরিয়া রাখিতে হইবে এবং পর দিন সকালে পঁচনী দ্বারা তাহা তুলিয়া কোন পাত্রে এমত ভাবে রাখিতে হইবে যেন আঠা হইতে রস পৃথক্ হইয়া নির্গত হইয়া যাইতে পারে কারণ রস থাকিলে অহিফেণ উৎকৃষ্ট হয় না। কৃষকগণ ঐ রসে নেকড়া ভিজাইয়া শুষ্ক কবিয়া রাখে, অহিফেণ সেবীগণ উহা জলে ভিজ্জা-ইয়া সেই জল সেবন কবিয়া থাকে, অহিফেণ অপেক্ষা উহার অত্যন্ত তীব্র শক্তি।

ঢেঁড়ি বিশেষে তিনবার পর্য্যন্ত চিরিয়া অহিফেণ লওয়া যাইতে পারে। একবার অহিফেণ গ্রহণের পর কিছুদিন বিলম্বে পুনর্ব্বার চিরিতে হয়। অনন্তর চৈত্রমাসে ঢেঁড়ি সকল পরিপক্ক হইলে গাছ কাটিয়া ফল মাড়িয়া দানা পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। পোস্তদানা কেবল যে খাদ্যে ব্যবহার হয় এরূপ নহে, উহা ঔষধেও ব্যবহার হয়, এবং উহা হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, বাদাম তৈলের ন্যায় এই তৈলের প্রায় সমান মূল্য।

অহিফেণ চাসে বিঘা প্রতি ১০। ১২ টাকা ব্যয় পড়ে। সকল ভূমিতে সমান রূপ অহিফেণের ফসল হয় না। সচরাচর ১০। ১২ সের বিঘা প্রতি পড়ন হয় এবং দানাও ৮। ১০ মণ উৎপন্ন হয়। কৃষকগণ গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য কহার নিকট বিক্রয় করিতে পারে না।

নিচু।

নিচু চিন দেশীয় ফল ; তথা হইতে আনীত হইয়া এদেশে রোপিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই উদ্যানে নিচু দেখিতে [illegible] যায়। নিচু অতি সুখাদ্য ফল। কিন্তু সকল জাতীয় নিচু [illegible] জল বায়ুর গুণে যে আস্বাদনের তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা, [illegible] কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন বাগানে এবং চুঁচুড়া ও [illegible] অনেক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট নিচু হইয়া থাকে। বিহার প্রদেশে [illegible] মুজঃফর পুরের নিচু অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে [illegible] ফলের [illegible] শস্য অধিক, বীচি ছোট এবং মধুপ্রায় [illegible] [illegible] কোন কোন জাতীয় নিচু এত অধিক [illegible] অম্লবিশিষ্ট যে [illegible] খাইতে কষ্ট বোধ হয়।

আম্র গাছের ন্যায় নিচুর গাছ বড় হয় না। [illegible] শেষে মাঘ মাসের প্রথমে নিচু মুকুলিত হইয়া থাকে [illegible] হইলে উহা দেখিতে ঈষৎ সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট হয়। [illegible] মাসেই ফল পাকিয়া উঠে। সুপক্ক নিচু যখন গাছে ঝুলিতে [illegible] তাহার লোহিত বর্ণের ফল সমূহ দেখিতে অতি মনোহর। [illegible] থলোতে অনেকগুলি ফল ধরিয়া থাকে। সুপক্ক ফল পাক্ষীতে বিস্তর নষ্ট করিয়া থাকে, এজন্য উহা পাকিয়া উঠিলে জাল দ্বারা গাছ ঢাকিয়া রাখা উচিত।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নিচু হইয়া থাকে। শীত প্রধান দেশে গাছ ভাল হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে বৎসর অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, সে বৎসর অনেক গাছ মরিয়া থাকে। আমের ও নিচুর চারার অবস্থায় অধিক হিমপাত অনিষ্টকারী, এজন্য শীতকালে বিশেষ সাবধানতার সহিত উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক। বঙ্গদেশে যেরূপ শীত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের সম্ভব নাই। এ দেশে যে কএক প্রকার নিচু দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বোম্বাই, মেকুলিন, ইমাবসন্, গোলা, অতিশয়

ছোট বীজ, এই কএক জাতীয় সমধিক প্রসিদ্ধ। নিচুর আঁটিতে যে গাছ হয় তাহাতে প্রায় ফল ধরে না, যদিও কোন কোন গাছে ফল হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ১০। ১২ বৎসরের কমে ফলে না। কলমের চারা অপেক্ষা আঁটির চারাতে অধিক পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে শস্য অতি অল্প হইয়া আঁটি বড় হয়। এজন্য কলমের গাছ রোপণ করাই উত্তম, কলমের চারায় প্রায় ৩। ৪ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরিয়া থাকে। এঁটেল মাটিতে নিচু ভাল হয় দোঁআশ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। ছায়াযুক্ত স্থানে গাছ ভাল হইয়া থাকে এজন্য আম্র কাঁঠালের বাগানে যে স্থানে সর্ব্বদা প্রখর রৌদ্র লাগে না এরূপ স্থানে উহা রোপণ করা প্রশস্ত। নিচু গাছের পক্ষে খৈলের সার উত্তম। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গাছে জল সেচন না করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

গুল কলমে নিচুর গাছ তৈয়ার করিতে হয়। কলম বাঁধিবার নিয়ম শিখিলে একটী গাছ হইতে প্রতি বৎসর বহুতর চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। আম্র কলম অপেক্ষা ইহার কলম বাঁধিবার নিয়ম অতি সহজ। নিচুর ভাল রকম সতেজ ডালে কলম বাঁধা উচিত। যে ডালে কলম বাঁধিতে হইবে, তাহার অগ্রভাগে অর্থাৎ দেড়হাত নিম্নদিকে যে গাঁইট থাকিবে, তাহার নীচে তীক্ষ্ণ ধার ছুরি দ্বারা গোল ভাবে ডালের চারিদিকে একটী দাগ দিতে হইবে এবং উক্ত দাগের ৩। ৪ অঙ্গুলি নিম্নে ঐরূপ আর একটী দাগ দিতে হইবে। অনন্তর উভয় দাগের মধ্যে লম্বাভাবে ছাল চিরিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে, এরূপ সাবধানতার সহিত অস্ত্র বসাইতে হইবে, তাহা যেন কাঠে না লাগে। ছাল তুলিবার পূর্ব্বে দোঁয়াশ মাটির সহিত খৈলের সার দেওয়া মৃত্তিকায় অল্প জল দ্বারা কাদা তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে, এই কাদা যেন নিতান্ত জলাক্ত না হয় অর্থাৎ কিছু শক্ত থাকে। অতঃপর কাদার একটী কয়েৎ বেলের ন্যায় গোল দলা তৈয়ার করিতে হইবে, এই মৃৎপিণ্ড সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই হাতে দুই দলা লইয়া পূর্ব্বোক্ত ছাল তোলা স্থানে এরূপ ভাবে চাপিয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমুদায় স্থানটী উহা দ্বারা আবৃত হয়।

অনন্তর নারিকেল ছোবড়া বা চট দ্বারা সেই মৃত্তিকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। চট অপেক্ষা নারিকেল ছোবড়ায় [illegible] উপকার [illegible] উহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে [illegible] সর্ব্বদা বৃষ্টি হয় [illegible] উহাতে জল না দিলে চলিতে পারে, বৃষ্টির অভাব হইলে [illegible] সছিদ্র ভাঁড় কিম্বা অন্য কোন [illegible] ঝুলাইয়া তাহাতে জল দিতে [illegible] সর্ব্বদা জল পাইলে শীঘ্র কলম লাগিয়া থাকে। [illegible] করিবার ডালে [illegible] তুলিলে সেই স্থানে এক প্রকার [illegible] সঞ্চিত হয় [illegible] সেই [illegible] হইয়া তাহা হইতে শিকড় বাহির [illegible] প্রায় তিন মাসের মধ্যেই কলম লাগিয়া থাকে। [illegible] অর্থাৎ [illegible] চট জড়ান স্থান হইতে বহুতর [illegible] কাটিয়া হাপোরে আধহাত অন্তর [illegible] বের মাটি অধিক খনিত হইলে [illegible] হইয়া [illegible] কারণ মৃত্তিকা আলগা হইলে [illegible] জল প্রবেশ [illegible] ফেলে, এজন্য হাপোর করিতে [illegible] স্থলের [illegible] উপরিস্থ [illegible] ঘাস প্রভৃতি কেবল চাঁচিয়া [illegible] গর্ত্ত [illegible] চারা রোপণ পূর্ব্বক তাহার গোড়ার মাটি উত্তম রূপ চাপিয়া দিতে হইবে। হাপোরে যেন রৌদ্র না লাগে এজন্য চারার উপর একটী মাচা বাঁধিয়া নারিকেল কিম্বা অন্য কোন রূপ পত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় একবৎসর রাখিয়া দ্বিতীয় বৎসর তথা হইতে তুলিয়া বাগানে স্থায়ী রূপে রোপণ করা আবশ্যক।

অনেক স্থলে এরূপও দেখা যায় অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় লিচু কিছু দিন পরে তাহার গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অনেক বাগানে যে সকল লিচু অতি উপাদেয় বলিয়া খ্যাতি ছিল, এক্ষণে সেই সকল গাছে সেরূপ সুখাদ্য ফল জন্মে না। গাছের বয়স অধিক এবং মূল গাছের বংশ বৃদ্ধি সহকারে যে গুণান্তর উৎপত্তি হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কাঁঠাল।

——oo——

কাঁঠাল অতি উৎকৃষ্ট ফল। এই ফলের প্রত্যেক অংশই কাজে লাগিয়া থাকে। অপক্কাবস্থায় উহার দ্বারা উত্তম তরকারী প্রস্তুত হয়। চিকিৎসকেরা অপক্ক কাঁঠালের বায়ুকারী সুস্বাদু প্রভৃতি গুণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুপক্কাবস্থায় উহার আস্বাদন অত্যন্ত উপাদেয়; তখন উহা মধুর, রক্তবর্দ্ধক বায়ু পিত্তনাশক, রুচিকারক এবং বলজনক। এই ফল বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানের কাঁঠাল সুখাদ্য নহে। স্থান বিশেষে এক একটী কাঁঠাল এতবড় হয় যে একজন মনুষ্য উহা তুলিতে পারে না। কাঁঠালের বীচে নানা প্রকার তরকারী হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত গুরুপাক, সুস্বাদু, এবং চর্ম্মদোষ নাশক। যত্ন করিয়া রাখিলে কাঁঠাল বীজ বারমাসই খাদ্যের উপযুক্ত থাকে।

সচরাচর বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কাঁঠাল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই প্রচুর ফল পাকিয়া থাকে। অনেক গাছে বৎসরের সকল সময়েই কাঁঠাল পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছকে বারমেসে গাছ কহে। সকল বৎসর ফল সমান হয় না। প্রায়ই দেখা যায় আম্র কাঁঠাল এক বৎসর অন্তর ভাল জন্মিয়া থাকে। কাঁঠাল যেমন উপকারী সেইরূপ বৃহৎ আকারবিশিষ্ট বহুজনের খাদ্যের উপযুক্ত। এদেশে যত প্রকার ফল আছে, উহার ন্যায় বড় ফল আর দেখা যায় না।

আম্রের ন্যায় কাঁঠালও ৪।৫ বৎসরে ফল ধরিয়া থাকে। আম্রের যেমন কলমে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাঁঠালের তাহা হয় না, বীজ হইতে উহার চারা হইয়া থাকে। অনেকের মনে বিশ্বাস আছে, কাঁঠালের চারা তুলিয়া রোপণ করিলে ফল ভুয়া হয়, কিন্তু এ সংস্কার যে মিথ্যা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কি কারণে কাঁঠাল ভুয়া হইয়া থাকে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। ভুয়া কাঁঠাল অপক্কাবস্থায় তরকারীতে ব্যবহার করা ভাল।

আম্রের ন্যায় কাঁঠাল একস্থানে পাতো দিয়া কিম্বা যথা স্থানে বীজ রোপণ করিতে হয়। যে স্থানে জল সঞ্চিত হয়, তথায় কাঁঠালের বাগান

করা উচিৎ নহে। কাঁঠালের চারার গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায; বিশেষতঃ বন্যার জলে গাছের বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে। এমনকি বড বড ফলবান গাছেও বন্যার জল লাগিয়া অনতিবিলম্বে মরিয়া থাকে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন কাঁঠালের বীচি রোপণের পূর্ব্বে উহা জলে উত্তমরূপে ধুইয়া রোপণ করিলে বন্যার জল লাগিয়া গাছের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু এ কথা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কিছু উচ্চ ভূমিতে কাঁঠালের বাগান করা আবশ্যক। পলি ও দোঁযাস মৃত্তিকায় কাঁঠাল ভাল হইয়া থাকে। বীজ অধিক শুষ্ক হইলে অঙ্কুরোদ্গম শক্তি নষ্ট হইযা যায়, এজন্য সুপক্ক ফলের বীজ অধিক দিন ঘরে না রাখিয়া রোপণ করা উচিত। আম্রের গাছে যে পরিমাণে সার দিতে হয়, কাঁঠাল গাছে সে পরিমাণে সার আবশ্যক করে না। ইহার অন্যান্য পাইট আম্রের ন্যায়।

আম্র অপেক্ষা কাঁঠাল গাছ দ্বারা বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। উহার কাষ্ঠে উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। আড়া, বরোগা, বাকৃস প্রভৃতি বহুবিধ গঠন কার্য্যে এই কাষ্ঠের সমধিক আদর। ভাল রূপ সারবান গাছ হইলে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। যত দিন গাছ সারাল না হয় তত দিন ফল বিক্রয় দ্বারা লাভ হয়, এবং উহা সারবান হইলে মূল্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সচরাচর দুইজাতিয় কাঁঠাল দেখা যায় খাজা ও রসা, খাজা কাঁঠাল অত্যন্ত গুরুপাক সহজে পরিপাক হয না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল কাঁঠাল পাকিয়া থাকে তাহা প্রায় রসাল হয়। আর আষাঢ় শ্রাবন মাসের কাঁঠাল অধিকাংশই খাজা হইয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন আষাঢ় মাসের বৃষ্টির জল লাগিলে উহা খাজা হয়।

বাডিতে দুই চারিটী কাঁঠাল গাছ থাকিলে একটী গৃহস্থের ফলের সংকুলান হইতে পারে। কোন কোন গাছে এত ফল ধরিযা থাকে যে শিকড় পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাটির মধ্যেও কাঁঠাল হইতে দেখা যায়।

বিদেশীয় তরকারী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত পর)

টেম—ইহা বিদেশীয় তরকারী। টেম তরকারী ও মসলা উভয়বিধ ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। পুদিনা শাক যে রূপ কাঁচা অবস্থায় চাটনীতে ব্যবহার হয় ইহাও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। অনেকে মাংস প্রভৃতি রন্ধনের অবস্থায় মসলার ন্যায় বাটিয়া অথবা পাতা দিয়া রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন সুস্বাদু করিয়া থাকে। টেম শুষ্কাবস্থায়ও মসলাব কার্য্যে ব্যবহার হয়। এই সবজী অতি উচ্চ দরে বিক্রীত হইয়া থাকে, এমন কি ভালরূপ জন্মাইতে পারিলে বিঘা প্রতি ১২৫ টাকা বিক্রয় হইতে পারে। টেম চাষের পূর্ব্বে কপির ন্যায় ক্ষেত্রে অন্যূন ২০।২৫ মণ খৈল দিয়া মাটি তৈয়াব কবিতে হয়। শ্রাবন মাসের শেষে ভাদ্র মাসেব প্রথমে জমিতে খৈল দিয়া পচাইতে হয়। কপির ন্যায় হাপোরে চারা প্রস্তুত করিয়া উহা ৪।৫ অঙ্গুলি বড হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। প্রত্যেক লাইনে দেড় হাত অন্তর চারা পুঁতিলে ভাল হয়। চারার গোড়ায় পটি ধরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার আবাদে অন্য কোন রকম বিশেষ পাইট কবিতে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে গাছেব গোড়া খুসিয়া দেওয়া ঘাসাদি নিড়ান এবং আবশ্যক বোধ হইলে জল সেচন করা বিধেয়। পালন শাকের ন্যায় মধ্যে মধ্যে ইহাবও শাক কাটিয়া লইতে হয়। গাছ দেড় হাত পরিমাণে বড় হইলে ৩।৪ চারি অঙ্গুলি গোড়া রাখিয়া কাটিবার ব্যবস্থা; শাক কাটার পর পূর্ব্বোক্ত জল সেচন প্রভৃতি পাইট কবিতে হয়, এইরূপে তিন বার টেম কাটা যাইতে পারে। বাঁধা কপির ন্যায় এদেশে উহারও বীজ হয় না।

সেজ—টেমের ন্যায় ইহাও এক প্রকার মসলা, পিয়াজ সংযোগে যেমন মাংস সুসিদ্ধ এবং উপাদেয় হয়, এই মসলার দ্বারাও মাংস অল্পসময়েসিদ্ধ ও সুস্বাদু হইয়া থাকে ইহার পাতার সের আট আনা মূল্যে বিক্রীত হয় এই মসলার বীজ এদেশে উৎপন্ন হয় না। প্রতি বৎসর আমেরিকা ইয়ুরোপ

হইতে আনীত হইয়া থাকে। সেজের বীজ প্রথমতঃ হাপোরে ফেলিতে হয়, তথায় চারা ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমাণে বড় হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে দুই হাত অন্তর রোপণ করা আবশ্যক। অন্যান্য বিদেশীয় তরকারীর জমির ন্যায় ইহার জমিতেও খৈলের সার দিয়া অগ্রে মাটি প্রস্তুত করিতে হয়। ক্ষেত্রে চারা কিছু বড় হইলে পটি বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ও জল সেচন করা কর্ত্তব্য। ভালরূপ পাইট করিলে এক একটী গাছ ৫।৬ হাত বড় হইয়া থাকে। যত্ন করিয়া গাছ রাখিলে দুই তিন বৎসর মসলার কার্য্য চলিতে পারে। অধিক আবাদ না করিয়া অল্প পরিমাণে গাছ প্রস্তুত করিলে গৃহস্থদিগের নিত্য ব্যবহার যোগ্য মসলার সংকুলান হইতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সবজীওয়ালারা ইহার প্রচুর আবাদ করিয়া থাকে।

সেলারি—ইহা কাঁচা-ও মসলা উভয় প্রকারে খাদ্যে লাগিয়া থাকে। সাহেবদিগের নিকট ইহার এত আদর যে বিঘা প্রতি দেড়শত টাকার মসলা বিক্রয় হইতে পারে। যত্ন করিয়া গাছ রাখিলে সম্বৎসর জীবিত থাকে। ভাদ্র মাসে প্রত্যেক বিঘায় অন্যূন ১০।১২ মণ খৈলের সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ প্রথমতঃ হাপোরে ফেলিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হয়, চারা ৩।৪ অঙ্গুল পরিমিত বড় হইলে, হাপোর হইতে তুলিয়া আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। গাছ এক ফুট বড় হইলে উহা বাঁশের খোলা দ্বারা বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। বাঁধিবার কারণ এই যে উহাতে রৌদ্রাদি না লাগিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সেলারি খাদ্যের উপযুক্ত হয়।

ক্রেস বা হালিম—শুলফ মেতি প্রভৃতি শাক যেমন ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। জলের ধারে এই শাক ভাল জন্মে। পাটনাতে উত্তম হালিম জন্মিয়া থাকে, এজন্য এদেশে পাটনাই হালিম সমধিক প্রসিদ্ধ। ফুল কপির ন্যায় পাটনাই হালিমের বীজেরও অধিক আদর। এই সবজীর চাসে লাভ মন্দ নহে। বিঘা প্রতি অন্যূন ৪০।৫০ টাকার শাক বিক্রয় হইয়া থাকে। কপি চাসের ন্যায় ভাদ্র মাসে বিঘাকরা চারি পাঁচ মণ খৈল দিয়া মাটি তৈয়ার করিতে হয়। মাটি প্রস্তুত হইলে

আশ্বিন মাসে পটি করিয়া বীজ বুনিতে হয়। পাইটের মধ্যে ঘাস মুথা পরিষ্কার রাখা, গাছের গোড়া খুসিয়া দেওয়া এবং আবশ্যক বোধে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। এদেশে হালিম দুই নামে বিভক্ত; অর্থাৎ পাটনাতে যাহা জন্মে তাহাকে পাটনাই হালিম এবং অন্য প্রকারকে ওয়াটার ক্রেশ হালিম কহে। ওয়াটার ক্রেশ হালিম ডাল কাটিয়া রোপণ করিলেও গাছ হইতে পারে, ডাল কাটিয়া রোপণ করিতে হইলে, প্রথমে ছাপোরে উহা পুঁতিতে হয় এবং তথায় উহা লাগিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত সার দেওয়া জমিতে ১০।১২ অঙ্গুল অন্তর অন্তর রোপণ করিতে হয়।

টোমেটু অর্থাৎ গোট বেগুন—এদেশে ইহাকে বিলাতী বেগুণও কহে। দেশীয় বেগুণের ন্যায় ইহা সুখাদ্য নহে, এই বেগুণ অম্বলে ব্যবহার হইয়া থাকে। টোমেটুর আস্বাদন ঈষৎ অম্লরস-বিশিষ্ট, সাহেবদিগের নিকট উহার অধিক আদর। টোমেটু কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার হয় না, ফল পাকিলে রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, সুপক্ক টোমেটু গাছের অত্যন্ত শোভা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই তরকারীর ক্ষেতে গোবরের সার দিলে চলিতে পারে। ভাদ্র মাসে জমি তৈয়ার করিয়া আশ্বিন মাসে ছাপোরে বীজ ফেলিতে হয় এবং তথায় চারা ৫।৬ অঙ্গুল পরিমাণে বড় হইলে ক্ষেত্রে পটি ধরাইয়া এক বা দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। ইহার অন্যান্য পাইট দেশীয় বেগুণের ন্যায়।

পারসিলি—ইহা এক জাতীয় শাক বিশেষ। বৎসরের মধ্যে দুই বার বুনিতে হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার অপর আশ্বিন মাসে। দেশীয় শাক চাসের প্রণালী হইতে উহার চাস সম্বন্ধে কোন বিশেষ পাইট বা নিয়ম নাই। সুতরাং দেশীয় শাক যে নিয়মে বুনিতে হয়, পারসিলিও সেই নিয়মে বুনিলে ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে।

গোলআলু—এই আলুর চাস প্রণালী কৃষিতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। এদেশে আলুর চোক বা আলু পুঁতিয়া গাছ প্রস্তুত করার নিয়ম চলিত আছে। চোক ভিন্ন উহার যে স্বতন্ত্র বীজ হইয়া থাকে এবং সেই বীজ হইতে গাছ হইতে পারে ইহা অনেকেই অবগত নহেন। সম্প্রতি আমেরিকায় চোক না বসাইয়া বীজ হইতে চারা প্রস্তুত

করার প্রথা অনেক স্থানে চলিত হইয়াছে। চোক আলু রোপণ করা অপেক্ষা বীজ রোপণে বিশেষ একটী লাভ এই উহাতে বীজের জন্য আলু নষ্ট হয় না। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে পাইকপাড়া নর্শরিতে আলুর বীজআনীত হইয়াছে। আলুর বীজ দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিলের ন্যায় চেপ্‌টা, কিন্তু সম্পূর্ণ সাদা নহে, ঈষৎ শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট। বীজ রোপণ করিতে হইলে অগ্রে গামলায় কিম্বা অন্য কোন পাত্রে দোঁয়াশ মৃত্তিকা পূর্ণ করিতে হয় এবং তাহাতে কপি-বীজ যে নিয়মে ফেলিতে হয় সেই প্রণালী অনুসারে বীজ বপণ করা আবশ্যক। গামলা সর্ব্বদা রৌদ্রে না রাখিয়া দিবসে বারাণ্ডায় বা অল্প রৌদ্র লাগে এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে, রাত্রিকালে বাহিরে রাখিলে শিশির পাতে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এইরূপ নিয়মে রাখিলে সত্বর চারা বাহির হইবে। গামলার চারা অঙ্গুলি পরিমাণে বড় হইলে তাহা সাবধানতার সহিত তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে, আলুর ক্ষেত্র উত্তমরূপ কর্ষণ করিতে হয়, মৃত্তিকা যত কর্ষিত বা খনিত হয়, ততই উত্তম। ইহার অন্যান্য পাইট প্রথম খণ্ড কৃষিতত্ত্বে প্রকাশিত আছে, সুতরাং এস্থলে তাহা উল্লেখ করার কোন আবশ্যকতা নাই। পাঠকবর্গ, সেই নিয়মানুসারে চাস করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

কার্ডুন—বাঁধা কপির যেমন মধ্যস্থ পত্র খাদ্যের উপযুক্ত, ইহারও সেইরূপ মধ্যের পত্র ও কোঁড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্ডুন স্বভাবিক অবস্থায় যে আকারের থাকে, খাদ্যের পূর্ব্বে তাহাকে কোন আবরণ দ্বারা এরূপ ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয় তাহাতে যেন আলোক লাগিতে না পারে, এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন রাখিলে তাহা সাদা হইয়া থাকে, সাদা কার্ডুন অতি সুখাদ্য। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সবজীর চাস্ করিতে হয়। বেলে মাটিতে উত্তম কার্ডুন জন্মিয়া থাকে। কার্ডুনের বীজ হাপোরে ফেলিয়া চারা প্রস্তুত না করিয়া একেবারে ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে অন্যূন তিন হাত অন্তর এক একটী পাটি ধরাইয়া দুই কিম্বা আড়াই হাত অন্তর এক একটী গর্ত্তে দুইটী করিয়া বীজ বুনিতে হয়। দুইটী বীজ রোপণের কারণ এই যে একটী চারা নিস্তেজ বা মরিয়া গেলে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া অপরটী রাখিতে পারা যায়।

স্কোয়াস—ইহা এক প্রকার কুমড়া। টববান্, বোষ্টন ম্যারো, এবং ইয়র কোহাস। স্কোয়াসের মধ্যে এই কএক জাতীয় উৎকৃষ্ট। ইহার চাসে বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। বালুকা ও গোবরের সার সমান ভাগে একত্রিত করিয়া মাদা তৈয়ার করিতে হইবে এবং প্রত্যেক মাদায় ৩।৪টী বীজ রোপণ করিতে হয়। কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রোপণের প্রশস্ত সময়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা কিছু বড় হইলে কোঞ্চি কিম্বা অন্য কোন ডাল পালায় তাহার ডগা তুলিয়া দিতে হয়। প্রাচীর কিম্বা বেড়ার ধারে গাছ রোপিত হইলে ডগা সকল অনায়াসেই তাহাতে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন ভাবে বিস্তারিত হইতে পারে। এক একটী গাছে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে।

পিজ বা মটর—ইহা নানা জাতীয়, অতি সুখাদ্য, তরকারীতে ব্যবহার হয়। মটরের উৎকৃষ্ট দালি প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল মটরের বীজ আনীত হইয়া থাকে, তদ্ সমুদায় উৎকৃষ্ট। এই সকল মটরের মধ্যে ডোয়ার্ফ, ডিক্সন্, ইয়র্কসায়রহিরো, ব্রিটিস্কুইন, বড় সাদা ম্যারো, আর্লি এম্পারার, হুপার, ব্লুপিটার, ফার্টিফোল্ড, ব্লাক আইম্যারো, চ্যাম্পিয়ন অফ ইংলণ্ড, ভিক্টোরিয়া ম্যারো, ভিচপারফেক্সন এবং লেঙ্গ্রেথ আর্লি পিজ এই সকল সমধিক প্রসিদ্ধ। দেশীয় মটর অপেক্ষা বিলাতী মটর রোপণ প্রণালী কিছু বিভিন্ন। বিলাতী বা বিদেশীয় মটরের গাছ বড় বড় হয়, সুতরাং উহা কোন আশ্রয়ে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশে যে সকল মটর জন্মিয়া থাকে, তদ্ সমুদায় অপেক্ষা উপরি লিখিত মটর সকল, অতি বৃহৎ এমন কি এক এক জাতীয় মটর দেখিতে বড় বড় মুক্তার ন্যায়। হাল্কা বেলে মাটিতে এই সকল মটর উত্তম জন্মিয়া থাকে। বর্ষার শেষ হইয়া শিশির পাত আরম্ভ হইলে মটর বুনিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে বপণ করিলে শীঘ্র ফল ধরিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে ফল ভোগ করিতে হইলে ১০।১২ দিন অন্তর অন্তর রোপণ করা আবশ্যক। মটর বুনিতে হইলে ভুমি উত্তম করিয়া পাইট করিতে হয়। ক্ষেত্রে দেড় হাত এক একটী পটি ধরাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে কিছু জোল কাটা আবশ্যক, এই জোল পটি অপেক্ষা ৮ অঙ্গুলি নিম্ন হইলেই চলিতে পারে, এবং ঐ জোলে

লাইন করিয়া এক একটী মটর রোপণ করিতে হয়। জোলে মটর বুনিলে জল সেচনের বিশেষ সুবিধা হয়, মটর ক্ষেতে অধিক জল সিঞ্চন আবশ্যক। বিশেষতঃ ফুল ধরিবার সময় গাছের গোড়ায় প্রচুর জল দিতে হয়। দেশীয় মটর যেমন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া বপণ করিতে হয় এবং গাছ বড় হইলে মাটিতে লতাইয়া বেড়ায়, এই সকল মটর সে রূপ করিয়া বুনিলে চলে না। কারণ উহাদের গাছ অত্যন্ত বড় লতা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য উহা কিছু বড় হইতে আরম্ভ হইলে পটিতে কোঞ্চি, কিম্বা জাফ্‌রী পুঁতিয়া তাহাতে গাছ তুলিয়া দিতে হয়, কোন রূপ আশ্রয় পাইলে ডগা সকল স্ব ইচ্ছায় সঞ্চারিত হইতে পারে, লতা সকল স্বাধীন ভাবে বিস্তারিত না হইয়া পরস্পর জড়িত হইলে সুন্দর রূপ ফল জন্মে না। ক্ষেত্রে সবল ভাবে মটর বুনিয়া উহা জাফ্‌রীতে তুলিয়া দিলে দেখিতে অতি সুশ্রী হয়। দেশীয় মটরের মধ্যে ওলন্দা মটর অধিক বড় হইয়া থাকে। উহাকে কোন কোন স্থানে পাগলা মটরও কহে। বাঙ্গালাদেশে বিদেশীয় মটরের অধিক চাস হয় না। উপরি লিখিত মটর সকল শীতকালে অনেকে সখ করিয়া বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন, নতুবা অন্যান্য শস্যের ন্যায় দেশ মধ্যে উহার আবাদ হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক প্রকার বিদেশীয় মটরের বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। এদেশে এই মটরের আবাদ আরম্ভ হইলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। এই মটরের সুঁটি চারি আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত সের বিক্রয় হয়।

বিন—ইহা এক প্রকার শিম, এদেশে ইহাকে গৌছি শিম কহিয়া থাকে। বিন নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় শিম অপেক্ষা ইহার আকার বড় হইয়া থাকে। তরকারীতে বিন ব্যবহৃত হয়। বিদেশ হইতে যে সকল বিনের বীজ আসিয়া থাকে, তন্মধ্যে হোয়াইট ভ্যালানটাইন্, রেডফ্রেঞ্চ, হোয়াইট ফ্রেঞ্চ, রয়েল ডোয়ার্ফ, কুণ্ডিবুস্, রেডবুস্ লার্জলায়মা, উইনজার, অর্লিম্যাজেগান লংপট, বেড আই বুক্‌বিন ইত্যাদি প্রধান। দেশীয় শিম অপেক্ষা এই সকল শিম সুখাদ্য। ইহাদিগের গাছের দুই প্রকার আকার হইয়া থাকে; অর্থাৎ হোয়াইট ভ্যালানটাইন, লার্জলায়মা, উইনজার, আর্লিম্যাজেগান, লংপট ইহাদিগের গাছ তিন

গাছের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। অপর বিন মুগ গাছের ন্যায় কতক লতার আকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই সকল গাছ ছোট ছোট কাটিতে তুলিয়া দিলে ভাল হয়, কোন প্রকার আশ্রয় না পাইলে ভূমিতে লতাইয়া থাকে, তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। দাঁড়ান গাছ অপেক্ষা লতানিয়া গাছ সমূহে প্রচুর ফল হইয়া থাকে। যে বৎসর অধিক পরিমাণে কুয়াসা এবং সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সে বৎসর বিনের ভালরূপ ফলন হয় না। কারণ এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের কাল পোকা লাগিয়া গাছ বিনষ্ট করিয়া থাকে। গাছে এইরূপ পোকা হইলে, ঘুঁটের ছাই সর্ব্বদা দিলে পোকা নষ্ট হয়। বিন রোপণ করিতে হইলে কার্ত্তিক মাসে ভূমি তৈয়ার করিতে হয়। কিঞ্চিৎ এটেল মাটিতে উহা ভাল হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে এক হাত পরিসর এক একটী পটি ধরাইতে হয় এবং পটীর উভয় পার্শ্বে আট অঙ্গুল গভীর আধ হাত বিস্তার জোল কাটিয়া দুইটি করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়, দুইটী বীজ পুঁতিবার তাৎপর্য্য এই কোন কারণে একটী চারা মরিয়া গেলে, অপরটী দ্বারা ফললাভ করিতে পারা যায়।

আর্টি-চোক বা হাতি-চোক—ইহা তরকারীতে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই তরকারীর চাস এদেশে অধিক পরিমাণে হয় না। সামান্য পরিশ্রম ও অল্পব্যয়ে হাতি-চোকের চাস হইয়া থাকে। যে কয়েক জাতীয় হাতি-চোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জেরুজেলম্ আর্টি-চোকই উৎকৃষ্ট। আর্টি-চোক ও জেরুজেলম্ আর্টি-চোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং খাইবার প্রণালীও বিভিন্ন। আর্টি-চোক বা হাতি-চোকের ফল আতার ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন গাছের ফল গোল এবং কোন কোন জাতীয় সূচ্যাগ্র বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ফল পরিপুষ্ট হইলে তাহা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া উহার ভিতরের শস্য খাইতে হয়।

বচরাচর এদেশে আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে ইহার চাস করিয়া থাকে। হাতি-চোক বীজ কিম্বা গোড়ার শিকড় সমেত ফেঁকড়ী রোপণ করিলে গাছ হইতে পারে। গাছ একবার মরিয়া গেলে পুনর্ব্বার তাহার মূল হইতেও অঙ্কুর নির্গত হইয়া সতেজ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে উত্তমরূপ

চাস দিয়া অন্ততঃ এক হাত ব্যবধান করিয়া পটি ধরাইতে হয় এবং প্রত্যেক পটিতে অন্যূন ১৫। ১৬ অঙ্গুল পরিমাণে অন্তর অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহা দেড় বা দুই হাত বাড়িয়া উঠিলে ঐ পরিমাণে ব্যবধান করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। পাইটের মধ্যে ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা এবং সর্ব্বদা জল সেচন করা।

জেরুজেলম হাটি-চোকের আলুর ন্যায় গেঁড় হইয়া থাকে। এবং বিলাতী আলু যে প্রকার রোপণ করার নিয়ম ইহাও সেই প্রকার নিয়মে পুঁতিতে হয়। আলুর ন্যায় মাটির মধ্যে উহার গেঁড় হইয়া থাকে। এই গেঁড় তরকারীতে ব্যবহার হয়। এই জাতীয় আর্টি-চোকের গাছ আড়াই হাত তিন হাত পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিতে হয় এবং গাছ মরিতে আরম্ভ হইলে তাহার মূল হইতে গেঁড় সকল তুলিয়া লইতে হয়। আলু যেমন বালিমিশাইয়া রাখিলে নষ্ট হয় না ইহাও ঐরূপ নিয়মে রাখিলে অধিক দিন ব্যবহারযোগ্য থাকে। বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ইহার রোপণ কার্য্য শেষ করিতে হয়।

স্পিনাক—ইহা এক প্রকার শাক। অনেকে উদ্যানের শোভার জন্যও স্পিনাক রোপণ করিয়া থাকেন। এই শাক কাটিতে হইলে একেবারে সমুদায় না কাটিয়া মধ্যের শাক রাখিয়া পাশের পাতা কাটিতে হয়। স্পিনাক তরকারীর কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। লাল জাতীয় স্পিনাকের পত্র খাইয়া থাকে। ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহার রোপণের সময়। হাল্‌কা মাটিতে স্পিনাকের চাস করিতে হয়। চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী চৌকায় বীজ বপণ করা উচিত। এবং তথায় চারা কিছু বড় হইলে অন্যূন এক হাত অন্তর ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। পাইটের মধ্যে গাছের গোড়া খুসিয়া দেওয়া এবং সর্ব্বদা জল সেচন করা আবশ্যক।

ক্যাপ্‌সিকম্‌—ইহা এক প্রকার লঙ্কা। এদেশে নানা জাতীয় লঙ্কার চাস হইয়া থাকে, কিন্তু সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুবিধ লঙ্কা আনীত হইয়া দেশমধ্যে উহার ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লঙ্কার মধ্যে দুই এক জাতীয় অত্যন্ত তীব্র ঝাল বিশিষ্ট, অবশিষ্ট কএক প্রকার আদৌ ঝাল নহে, এমন কি আলু পটলের ন্যায় তরকারীতে ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই সকল লঙ্কার আকার অত্যন্ত বড ও সুখাদ্য। বিদেশীয় লঙ্কার মধ্যে ক্যাপ্‌সিকম্‌, বার্ডস্‌ আইচিলি, চেরিসেপ্‌ড্‌চিলি, লংরেডচিলি, লংরেড ক্যাপ্‌টিসকম্‌, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌, রেড্‌টোমাটো সেপড্‌ প্রভৃতি প্রধান। এই সকল লঙ্কার চাস করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী স্থানে বীজ বপণ করিয়া চারা পাতো দিতে হয়। এবং তথাস গাছ অন্যূন ৮ অঙ্গুল বড হইলে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। এক একটী গাছের চারিদিকে এক হাত পরিমাণ স্থান রাখিয়া উহা রোপণ করা উচিত। দেশীয় লঙ্কার ন্যায় এই সকল লঙ্কার পাইট এবং জমি তৈয়ার করিতে হয়।

ধান্য চাসের পক্ষে বৃষ্টির জল কিরূপ প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেব মাতৃক দেশ, এক বৎসর যদি যথা সময়ে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে অজন্মা নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনশনে অকালে মৃত্যু সদনে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে ভারতের কোন না কোন দেশে প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়া, অনেক প্রাণীর মৃত্যু হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মনুষ্যই অন্নভোজী, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে সুচারুরূপে ধান্য জন্মে না: বরং অন্যান্য শস্য অল্প বৃষ্টিতে জন্মিতে পারে, কিন্তু অধিক পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে কখনই ভাল ধান্য জন্মে না, ইহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়। যতদিন কেবল দেবতার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দেশে ধান্যের চাস হইবে, ততদিন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কোন ক্রমেই দূর হইবে না, ততদিন দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর আধিপত্য ও ন্যূন হইবে না। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে পুনঃ পুনঃ অনাবৃষ্টি ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া অনেকে কহিয়া থাকেন, তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। তাঁহারা কহেন "পূর্ব্বে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানই অরণ্যাবৃত ছিল, এবং সেই সকল অরণ্য এক্ষণে লোকালয়াদিতে পরিণত

হওয়ায়, আর তাদৃশ বৃষ্টি হয় না। তখন অধিকাংশ স্থানই অরণ্যাবৃত থাকায়, অধিক বৃষ্টির কারণ বলিয়া কহিয়া থাকেন। এক্ষণে দেশে আর তাদৃশ অরণ্য না থাকায় কোন কোন বৎসর অল্প বর্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে।” এক্ষণেই যে কেবল অনাবৃষ্টি ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এরূপ বোধ হয় না; পূর্বাকালে ও অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরণাদিতে পাওয়া যায়। বহু বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভি-ক্ষের বিষয়ও শ্রুত হওয়া যায়। এমন কি অনেক দিন ধরিয়া অনাবৃষ্টি হওয়ার বিষয় ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে।

কোন কোন বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়াও শস্যাদি উৎপত্তির বিলক্ষণ অনিষ্ট করে, কিন্তু তাহা অনাবৃষ্টি তুল্য অনিষ্টকর নহে, অতি বৃষ্টিতে কতক পরিমাণে ধান্যাদি জন্মিযা থাকে, কিন্তু অনাবৃষ্টিতে ধান্যাদি প্রায় জন্মে না। হাজার সার দিলেও বৃষ্টি ধারা ব্যতীত কখন ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় না। যে ধান্য আমাদের জীবনের উপায়, তাহা জল ব্যতীত কখন জন্মে না। ধান্য চাসের পক্ষে বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার।

যদিও সময়ে সময়ে জল সিঞ্চনের দ্বারা ধান্যের আবাদ করা যায়, তাহা বৃষ্টির জলের ন্যায় উপকারী নহে বটে; কিন্তু জলসিঞ্চনের দ্বারাও সময়ে সময়ে ধান্যের আবাদ করিয়া চারি পোযার স্থলে তিন পোয়া ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। এক্ষণে যেরূপ সময় উপস্থিত, তাহাতে কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। সকল স্থানে সহজে জল সিঞ্চ-নের উপায় হইলেও আমরা কতক পরিমাণে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা ও খাল খনন করাইলে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম হইতে পারে। স্থানে স্থানে দীর্ঘিকা ও খাল খনন করা কিছু সামান্য কার্য্য নহে যে, অল্পায়াসেই খাত হইতে পারে। তাহা কেবল দেশীয় লোকের যত্নে ও ব্যয়ে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে রাজ পুরুষ দিগের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তাঁহাদিগের দ্বারাও একবারে দেশের কৃষি-কার্য্যোপযোগী সমস্ত খাল খনিত হওয়া বড় সহজ নহে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রিলিফের কার্য্য জন্য যে লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে, তাহা খাল খনন কার্য্যে ব্যয় করিলে,

দুর্ভিক্ষের জন্য আর তাদৃশ অর্থ ব্যয় করিতে হইবেনা। সন্তোষের বিষয় এই যে, রাজপুরুষগণও তদ্বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন নাই। সময়ে সময়ে তাঁহারা স্থানে স্থানে খাল খনন কার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। সম্প্রতি জুজুটী হইতে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ দামোদর নদের বাঁদের নীচে দিয়া বরাবর জামালপুরের কানানদী পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করা হইতেছে। ইহার দ্বারা এ প্রদেশে কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

ধান্য চাসের পক্ষে বৃষ্টির জল কিরূপ আবশ্যকীয় চাসী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ধান্য বপণের পূর্ব্ব হইতে ধান্য পক্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল আবশ্যক করে। যদিও জল সিঞ্চনের দ্বারা ধান্যের আবাদ হইতে পারে বটে, কিন্তু বৃষ্টির জলে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে; জল সিঞ্চনের দ্বারা তদপেক্ষা অনেক কম ধান্য জন্মিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস হৈমন্তিক ধান্য বপণের প্রকৃত সময়। উহার পূর্ব্বে,—অভাব পক্ষে চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে চাস দিয়া, পাইট করিয়া রাখিতে হয়। এমন কি মাঘ ফাল্গুন হইতে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে, ধান্য চাসের পক্ষে অনেক উপকার হইয়া থাকে। আমাদের এখানকার অনেক কৃষকে কহে "মাঘ ফাল্গুন মাস হইতে বৃষ্টি হইয়া জমির মৃত্তিকা কর্ষণোপযোগী হইলে, তাহাতে লাঙ্গল দিয়া জমির পাইট করিলে, বিনা সারেই মৃত্তিকা উর্ব্বরা হয়, এবং প্রচুর পরিমাণে ধান্য ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ' প্রাচীন কৃষকদের মুখে কয়েকটী বচনও শুনা যায়। আবশ্যক বোধে তাহা লিখিত হইতেছে;—ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥' এবং "মাঘের মাটী, সোণার পাটী"।

কোন্ কোন্ মাসে বৃষ্টি হইলে ধান্য চাসের কিরূপ উপকার হইয়া থাকে, কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন দিকে বায়ু প্রবাহিত হইলে বৃষ্টি হয় না, এবং কোন্ কোন্ মাসে কোন্ দিকে বায়ু প্রবাহিত হইলেই বা বৃষ্টি হইয়া থাকে; আমাদের এখানকার বিজ্ঞ কৃষক দিগের তৎসম্বন্ধে অনেক বচন আছে। সেই বচনগুলি অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হয়, বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। একারণ তৎসমুদায় বারান্তরে প্রকাশ করিবার মানস রহিল। (ক্রমশঃ)

তিল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের এখানে ঐ সময়ে (তিলের আবাদ কালীন) প্রায় সমস্ত জমিই পতিত থাকে, ঐ সকল জমিতে কৃষকেরা যদি তিলের চাস করে, তাহা হইলে তাহারা যে বিলক্ষণ লাভ-বান হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিল কাটিয়া লওয়ার পর পুনরায় সেই জমিতে ধান্য রোপণ করা যাইতে পারে। তিল গাছে প্রায় জমির সমস্ত সার ভাগ টানিয়া লয়, একারণ তিল কাটা হইলে পর জমিতে উত্তম রূপে সার দিয়া ধান্য চারা রোপণ করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত 'কৃষ্ণতিল' নামক এক প্রকার তিল আছে, তাহার আবাদ আমাদের এখানে মোটেই হয় না। সুতরাং তাহার চাসের বিষয় অদ্যকার প্রস্তাবে লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

কৃষিকার্য্যে এরূপ লাভ সত্ত্বেও আমরা কৃষি কার্য্যে মনোযোগী না হইয়া যে, চাকরীর জন্য এত লালায়িত হই, ইহা অপেক্ষা আমাদের মূঢ়তার বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা ২০, কি ২৫, টাকার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলি' এবং দাসত্ব শৃঙ্খল বহন করি, সেইরূপ পরিশ্রমের সহিত স্বাধীন ভাবে যদি আমরা কৃষি বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহা হইলে সামান্য চাকুরী অপেক্ষা অধিক লাভবান হইয়া, সুখ-সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হই। আমরা ভারত গর্ভের নিহিত রত্ন উদ্ধৃত করিতে সক্ষম নাই, কিন্তু দাসত্ব ভার বহন করিতে বিলক্ষণ মজবুত! যতদিন আমাদের স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না জন্মিবে, ততদিন আমাদের উন্নতি ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

আম্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রোপণের দোষেও অনেক আমের চারা অসময়ে মরিয়া থাকে। কলমের ও আঁটির চারা পুঁতিবার একরূপ নিয়ম নহে। চারার যে স্থানে জোড়বাঁধা থাকে, তাহা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া দিলে, মৃত্তিকস্থ রস বসিয়া পচিতে কিম্বা পোকা বসিয়া গাছ নষ্ট করিতে পারে এজন্য কলম বাঁধা স্থান সমুদায় না পুঁতিয়া উহার কিয়দংশ মাটির মধ্যে পুঁতিতে হয়। পরন্তু কলমের যোড় অধিক উপরে রাখিয়া রোপণ করিলে ঝড়ে ঐ যোড় পৃথক হইতে পারে, যোড একবার চিরিয়া পৃথক হইলে গাছ বাঁচান বড় কঠিন। মালদহ অঞ্চলে যেরূপ আমের যোড কলম বাঁধিয়া থাকে, তাহাতে ঐ কলম পুঁতিলে যোড় মাটি হইতে অনেক উপরে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অধিক উপরে যোড় বাঁধিলে, উহা চিরিয়া যাইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর একটি অনিষ্ট হইয়া থাকে, মূল শাখা অর্থাৎ গাছের যে ডালে জোড় বাঁধা হয়, তাহা হইতে শিকড বাহির হইয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে, গাছ যেরূপ দৃঢ় হয়, যে চরায় যোড বাঁধা যায় তাহার শিকড় তত দৃঢ় হয় না। ফলতঃ গাছ দৃঢ় করিতে হইলে যোড় অধিক উপরে রাখা উচিত নহে। যোড় অধিক উপরে রাখা এবং সমুদায় বন্ধন স্থান মৃত্তিকার মধ্যে রোপণ করা উভয়ই অনিষ্ট কর।

ল্যাংড়া প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল আমের সকল আঁঠিতে চারা হয় না। এজন্য ঐ সকল গাছের কলম বাঁধাই প্রশস্ত। অনেক স্থানে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কোন একটী উৎকৃষ্ট গাছে কলম বাঁধিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া, কিছু দিন পরে আবার ঐ চারা হইতে কলম তৈয়ার করিয়া নূতন গাছ তৈয়ার করা হইল, এইরূপ বংশ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মূল আমের মিষ্টতা ও আকার এতদূর পৃথক হইয়া উঠে যে উহা এক জাতীর বলিয়া বোধ হয় না।

কলম বাঁধা সম্বন্ধে আর একটী দোষ প্রবিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের গুণান্তর করিতেছে। কলম সম্বন্ধে বিশেষ একটী নিয়ম এই যে,

যে আঁঠির চারার সহিত যোড বাঁধিতে হইবে, ঐ চারা ভাল আমের হওয়া আবশ্যক। কারণ টক কিম্বা অন্য দোষ যুক্ত চারার সহিত কলম বাঁধিলে ক্রমে ক্রমে মূল আমের অর্থাৎ যে গাছের কলম বাঁধা হইয়া থাকে, তাহার গুণের অন্যথা করিয়া তুলে। এইরূপ দোষে অনেক ভাল ভাল জাতীয় আম্র মন্দ অবস্থায় পরিণত হইতেছে।

কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবসায়ী মালীগণ অন্য একটী উপায়ে আমের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। যোড় কলম বাঁধিতে হইলে, গাছে মাচা বা ভারা বাঁধা, চারা রাখিতে টব বা গামলা খরিদ প্রভৃতি নানা কারণে কিছু ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়া থাকে, এজন্য অনেকে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিস্তর আমের আঁটি রোপণ করিয়া থাকে, এই ছাপোবে বা চৌকায চারা কিছু বড হইলে দুই দুইটী চারা পরস্পর সংযোগ করিয়া যোড় বাঁধিয়া দেয। চারার বয়োবৃদ্ধি সহকারে যোড লাগিয়া যায়, অনন্তর চারার কাট কিছু শক্ত হইলে তাহা কাটিয়া যোড় কলমের চারা বলিয়া বিক্রয় করিয়া ক্রেতা দিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে। এজন্য কলমের চারা খরিদ করিতে হইলে কোন বিশ্বাস যোগ্য স্থান হইতে লওয়া আবশ্যক অথবা স্বয়ং গাছে কলম দেখিয়া কাটাইয়া আনা কর্ত্তব্য।

কোন কোন কলমের গাছে অধিক দিন বিলম্বে ফল হইতে দেখা যায়, আবার গাছ বিশেষে আদৌ ফল হয় না। ইহার কারণ অনেকে অবগত নহেন। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কলম বাঁধার দোষে এই অনিষ্ট হইয়া থাকে। গাছের সকল ডালে কলম বাঁধিলে ফল ভাল হয় না। যে সকল ডাল নীচে থাকে এবং যাহাদিগের অগ্রভাগ উপরের দিকে মুখ করিয়া না থাকে, এরূপ ডালে কলম বাঁধিলে, সেই কলমের চারা ফলিতে অধিক দিন সময় লাগে, এমন কি আঁঠির চারার ন্যায় ৭।৮ বৎসরে ফল ধরিতে সময় লাগিয়া থাকে। এবং অনেক চারা অফলাও হয়। এজন্য কলম বাঁধিবার সময় ডাল নির্ব্বাচন করা একান্ত আবশ্যক।

সচরাচর প্রায় দেখা যায় জলাশয়ের উত্তর দিকে যে আমের বাগান থাকে, তাহাতে অধিক পরিমাণে ফল হয়। সাধারণতঃ বাগানের উত্তর দিকের গাছে সকল বৎসর সমান আম হয় না, যে বৎসর বাগানে অধিক

পরিমাণে ফল হইয়া থাকে, সে বৎসরও উত্তরদিকস্থ গাছে ফল অল্প হয়। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে অধিক আম্র হইয়া থাকে :

এ দেশে যে সকল আম্র দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ল্যাংড়া, ফজলী ও বোম্বাই এই গুলিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও বিস্তর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম্র আছে। দেশীয় আমের মধ্যে অনেক আম্র ঐ সকল আম্রের তুল্য দেখা যায়। বোম্বাই আম্রের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা প্রায় টক হয় না। ভাল ভাল আমের আঁঠি অত্যন্ত পাতলা, এজন্য সকল আঁঠিতে এক নিয়মে চারা জন্মে না। এবং অনেক চারাও মূল গাছের ফলের ন্যায় গুণ প্রাপ্ত হয় না। এজন্য উহাদিগের কলম বাঁধাই প্রশস্ত। যে কোন আমের আঁঠি পুঁতিতে হইলে, তাহা চীৎ করিয়া মাটির উপর রোপণ করাই কর্ত্তব্য।

অনেক গাছের পাতা দেখিয়া বলিতে পারা যায় উহা কোন্ জাতীয় আম্র। আম্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ জাতীয় আম্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা বলা বড় কঠিন, কারণ এক এক জাতীয় আম্র এক একটী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। এদেশে এক্ষণে যে সকল আম্র রোপিত হইতেছে, তন্মধ্যে, ল্যাংড়া, ধূম বোম্বাই, ফরাস বোম্বাই, সুরত বোম্বাই, আলফন্স, কপাটভাঙ্গা, নসিরুদ্দিন হাইদার, বেলখাস, সুন্দরসা, ক্ষীরপুলি, হিমসাগর, কালাপাহার, গোপাল ধোপা, বৃন্দাবনী, তোয়াসেক, জাভা, ফজলি, বিষমটক, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, মেডেম মরিচসহরের, দোফলা, কাঁচামিঠা, ফুল্লি, চালতাখাস, ঘোড়াবাটা, জাঙ্গালে, বিশ্বনাথ মুখো, ক্ষীরসাপাতি, কুমড়াজালি, বড় মালদহ, আন্দারমাণিক, খেজুরি, বোড়াই, মরিচসাল, মোচাখাস, কালাপাহাড, ওযাটগঞ্জ, প্রতাপপুরে, আজভো, গোপাল ভোগ, ছাতারে, খেজুর গুড, জালিবাঁধ, গোলাপগন্ধ, সরিখাস, পেয়ারিখাস, কইমুড়, পরাণকসে, আসমানতারা, ধুমখাস, গোলাবখাস প্রভৃতিই প্রধান *। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এই সকল আম্রের কলম প্রস্তুত করিতে হয়।

---

* এই সকল আম্র বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চলে এবং মালদহ হইতে আনীত হইয়া এদেশে চলিত হইয়াছে। পাইকপাড়া নর্শরিতে উপরি লিখিত সমুদায় আম্রের কলম পাওয়া যায়।

ইক্ষু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এইরূপে রোপণ কার্য্য শেষ হইলে পর একদিন অন্তর কলসী করিয়া রোপিত স্থানে অল্প অল্প জল দিতে হইবে। এইরূপে ১০।১২ দিন জল দিলে পর চারাগুলি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। তৎপরে জমিতে একবার অধিক পরিমাণে জল সিঞ্চন করিয়া, ৪।৫ দিন পরে বাত (যো) হইলে পর, উত্তম রূপে জমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দিতে হইবে। পুনরায় কলসী করিয়া ২।১ দিন অন্তর ইক্ষু চারায় জল দিতে হইবে। এইরূপ জল দেওয়াকে আমাদের এখানে "আক হেকণী" কহে। ১০।১৫ দিন পরে আবার জমিতে ভাল করিয়া জল সিঞ্চন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবার ৫।৭ দিন পরে বাত হইলে পর খনন করিতে হইবে। যতদিন ইক্ষু চারা সকল একটু বর্দ্ধিত না হয়, ততদিন চারায় অল্প অল্প করিয়া জল দিতে হইবে। বর্ষাকালে প্রায়ই জল সিঞ্চনের আবশ্যক হয় না। মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ও জমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দিবে। ইক্ষুর জমিতে আমাদের এখানে প্রায়ই তিন বার করিয়া খইল দিয়া থাকে, প্রথমতঃ রোপণ কালীন, দ্বিতীয়তঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার, তৃতীয়তঃ ভাদ্র মাসে একবার দিলেই যথেষ্ট হইবে। খইল দিবার কালীন যেন ইক্ষু গাছের গোড়ায় উহা চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। জমিতে খৈল দিবার সময় ঢেঁকিতে চূর্ণ করিতে হয়।

ইক্ষুর গাছ একটু বড় হইলেই ৪।৫টা গাছ একত্র করিয়া ইক্ষু পাতা দ্বারা গাছ গুলি জড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে গাছ গুলিতে অধিক রৌদ্র লাগিতে পায় না এবং শীঘ্রই ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। এই রূপ পাতা দ্বারা গাছ গুলি বান্ধিয়া দিলে, সামান্য ঝড় ইত্যাদিতে গাছ গুলি রক্ষা পায়। ইক্ষু ক্ষেতে যো পাইলে খনন করিয়া দেওয়া এবং মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন করিয়া দেওয়া ব্যতীত আর অন্য কোন পাইট নাই। ইক্ষু গাছ গুলি যদি অধিক উচ্চ হয়, তাহা হইলে ৫।৭ ঝাড় ইক্ষু একএকটা বাঁসের খোঁটা

দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রবল ঝড়েও গাছ গুলিকে রক্ষা কবিতে পারে।

মাঘ কিম্বা ফাল্গুন মাসে ইক্ষুব গাছ সকল কাটিয়া, যন্ত্রবিশেষ দ্বারা ইক্ষুদণ্ড হইতে রস বাহির করিয়া লইতে হয়, এবং সেই রস পাত্রে রাখিয়া, অগ্নির জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। গুড় প্রস্তুত কালীন বিশেষ সাবধানের সহিত গুড় প্রস্তুত না করিলে, ভাল গুড় উৎপন্ন হয় না। ইক্ষু হইতে রস বাহির কালীন বিস্তর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এক্ষণে অনেক স্থানে কলের দ্বারা রস বাহির করা হয়। তাহাতে অনেক পরিশ্রমের লাঘব হয়। আমাদের এখানকার কৃষকেরা ইহার উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। এক্ষনে একটি কল ক্রয় করিয়া ভাড়া দিলে এসময় বিলক্ষণ লাভ হয়। যদি স্থানে স্থানে এক একটি কৃষি সমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই সমাজের সভ্যগনের মধ্যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া যদি কৃষি কার্য্যের যন্ত্র সমুদয় ক্রয় করিয়া ভাড়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কৃষকদিগের যেমন উপকার হয়, সমাজেরও সেই রূপ মূল ধন বৃদ্ধি পায়।

ইক্ষু গাছের উপরিভাগ তিন পোয়া থাকিতে কর্ত্তন করিয়া সেই কর্ত্তিত ডগাগুলির উপরিস্থ পাতা গুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, এবং কোন আর্দ্র স্থান কিঞ্চিৎ খনন করিয়া, সেই খনিত স্থানে ডগা গুলি লম্বভাবে রাখিয়া ইক্ষু পাতা কিম্বা বিচালি আচ্ছাদন দিতে হইবে। কোন ক্রমে যেন ডগা গুলিতে রৌদ্র না পায়। ২।১ দিন অন্তর সেই ডগাগুলিতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মাঘ কিম্বা ফাল্গুন মাসে ইক্ষুর ডগা কর্ত্তন করা হইলে, সেই ডগা গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য ঐ ডগাগুলিকে এক মাস কখন কখন দেড মাস, দুই মাস হাপরে রাখিতে হয়। অনেক কৃষক আবার পৌষ মাশে ইক্ষু কাটিয়া থাকে, তাহাতে যেমন কম গুড় হওয়ার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, অপর দিকে তেমনি অধিক মূল্যে গুড বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়া থাকে। পৌষ মাসে ইক্ষু কাটিলে দুই মাস অপেক্ষাও অধিক দিন হাপরে ডগা রাখিতে হয়। যদি চৈত্র মাসে ইক্ষু কাটিয়া, সেই সময়েই ইক্ষুর ডগা রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ডগা গুলিকে হাপরে রাখিবার আবশ্যক নাই।

ক্রমশঃ

কার্ত্তিক মাসে কৃষি বিষয়ে মন্তব্য।

সকল কার্য্যেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপিত আছে, যে সময়ে যে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা, সেই সময় তাহা না করিলে সফল যত্ন হইতে পারা যায় না। সময় অতীত করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক ব্যয় করিয়াও ফললাভে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মে। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্য যেরূপ কঠিন এবং সময়ের সহিত ইহার যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে অসময়ে অনুষ্ঠান করিলে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া কৃষকের যারপর নাই অপকার সাধন করে। এজন্য সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কৃষকের সম্পূর্ণ আবশ্যক।

ঋতু পরিবর্ত্তের সঙ্গে কৃষিকার্য্যেরও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ভারতে যে কৃষি বিষয়ে এত উন্নতি একমাত্র ঋতুভেদই তাহার মূল কারণ। প্রকৃতির কেমন নিয়ম, ঈশ্বরের কেমন দয়া এক একটী ঋতু পরিবর্ত্তের সহিত পৃথিবীর আবার নূতন ভাব ও নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়া অশেষ প্রাণির খাদ্যের উপায় অবধারিত হয়। এই ঋতু পরিবর্ত্তের মধ্যেও সেই সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার অনুপম দয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক একটী ঋতু পরিবর্ত্তিত হইয়া শস্যোৎপাদিকা শক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। এক নিয়মে এবং এক উপাদানে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না। বর্ষার জল যে সকল শস্যের পক্ষে পরম উপকারী হৈমান্তিক শস্যের পক্ষে উহা আবার সেইরূপ অনিষ্টজনক। এজন্য এক ঋতুর বপনোপযোগী শস্যাদি অন্য ঋতুতে চাস করিলে অর্থাৎ পৌষ কিম্বা মাঘ মাসে যদি ধান্য রোপণ করা যায়, তাহা হইলে কখনই উহা উৎপন্ন হইবে না। প্রত্যেক জাতীয় শস্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারিত আছে।

এদেশে যে ছয়টী ঋতুর সঞ্চার হইয়া থাকে, তন্মধ্যে হেমন্ত ঋতু কৃষিকার্য্যের পক্ষে প্রধান অনুকূল। বর্ষাকালে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত থাকে, মৃত্তিকায় অধিক রস থাকিলে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না,

কার্ত্তিক মাসে বর্ষা শেষ হয়। পৃথিবী নীরস হইতে থাকে, মৃত্তিকার নূতন ভাব সঞ্চারিত হয়। এই সময় হইতে রবি শস্য চাসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে বহুবিধ আগাছা জন্মিয়া ক্ষেত্র ঢাকিয়া ফেলে, কার্ত্তিকমাস হইতে ঐ সকল গাছ মরিতে আরম্ভ হয়। ফলতঃ জঙ্গল পরিষ্কারের এই উপযুক্ত সময়। ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার ও মাটির পাইট করিবার জন্য কৃষকদিগের মনোযোগী হওয়া সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য। এই সময় মাটি খুঁড়িয়া না দিলে তাহার রস যত শুষ্ক হইতে থাকিবে, উহা ততই কঠিন হইয়া গাছের শিকড় সকল ততই সঙ্কোচ করিয়া তুলিবে। শিকড় সমূহ মৃত্তিকা মধ্যে শিথিল ভাবে থাকিতে না পারিলে, উহা গা মেলাইয়া বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য কার্ত্তিকমাসে অধিকাংশ গাছের মূল খুঁড়িয়া দিয়া রৌদ্র ও বাতাস খাওয়ান আবশ্যক। বায়ু ও উত্তাপ উদ্ভিদ্দিগের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর; প্রাণিগণ যেমন আলোক ও বায়ু প্রাপ্ত না হইলে, কোন ক্রমে জীবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না, উদ্ভিদ্দিগের পক্ষেও ঐ সকল পদার্থ সেইরূপ উপকারী। ফলতঃ জল, বায়ু ও উত্তাপ উদ্ভিদ্গণের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে উহাদিগের মূল-দেশ খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিলে, আর একটী বিশেষ উপকার এই হয়, বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত দ্বারা মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে আর্দ্র থাকে, বৃক্ষাদি সেই মৃত্তিকাস্থ রস সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে, নিয়ত রস আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদ্দিগের শিকড়াদি এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে অবশেষে অতিরিক্ত রস সংযোগে শিকড় সমূহ পচিয়া উঠে। পাকস্থলীতে ক্রমাগত খাদ্য দ্রব্য প্রবিষ্ট করিলে যেমন তাহা পরিপাক করিতে অসমর্থ হয়, উদ্ভিদ সকলও সেইরূপ বর্ষার কয়েক মাস ক্রমাগত মৃত্তিকাস্থ রস আকর্ষণ করিয়া শেষে এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে সেই রস সমূহ তাহাদিগকে পচাইতে থাকে। অতিরিক্ত জল প্রবিষ্ট হইলে বৃক্ষাদি পচিয়া যায় তাহার এই কারণ। গাছের চারার অবস্থায় অধিক পরিমাণে জলসেক করিলে অনেক গাছ যে অসময়ে পচিয়া মরিয়া থাকে তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণ নিবন্ধন। শিশু সন্তানদিগকে অধিক খাদ্য প্রদান করিলে যেমন নানা প্রকার রোগ হইয়া

স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মায় উদ্ভিদ্‌দিগেরও বাল্যাবস্থায় সেইরূপ প্রচুর খাদ্য স্বরূপ জল ও সার দিলে তাহাদিগের প্রভূত অনিষ্ট হয়। আমাদিগের শরীরস্থ শিরা, কৈশিকা, ধমনী প্রভৃতি পথে যেমন সর্ব্বদা রক্ত সঞ্চারিত হইয়া জীবন সংরক্ষণ হইয়া থাকে, উদ্ভিদ্‌দিগেরও সেইরূপ অসংখ্য শিকড় দ্বারা প্রতিনিয়ত রসের সঞ্চার হয়। এই রসের আধিক্যই ক্ষতিজনক। কার্ত্তিক মাসে বৃক্ষমূলে রৌদ্র লাগাইলে সেই রসের অনিষ্টজনক অংশ শুষ্ক হইয়া উদ্ভিদ্‌দিগের স্বাস্থ্য রক্ষণে সহায়তা করিয়া থাকে।

বৃক্ষাদির গোড়া খুঁড়িয়া রৌদ্র ও বাতাস লাগাইবার নিয়ম এই যে কোন বৃক্ষের মূল দেশের চতুর্দ্দিকস্থ কতকদূর ব্যাপিয়া মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ৮।১০ দিন আল্‌গা রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ মৃত্তিকা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃক্ষমূলে ঢাকিয়া দিতে হয়।

মৃত্তিকা খনিত করিবার দুইটী সময় বৎসরের মধ্যে নিরূপিত আছে; অর্থাৎ কার্ত্তিক ও মাঘ মাস। এই দুইটী সময়ের দুইটী উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাস হইতে মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া কঠিন হইতে থাকে, সুতরাং এই সময় উহা খনিত হইলে কাঠিন্যজনিত অনিষ্ট হইতে পারে না; আর শীতের কয়েকমাস, নিয়ত মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, সুতরাং মাঘমাসে তাহা খুঁড়িয়া দিলে মৃত্তিকার কাঠিন্যভাব বিদূরিত হইয়া শিকড়াদি যথেচ্ছ সঞ্চারিত হইতে পারে।

কার্ত্তিকমাস কৃষকদিগের একটী প্রধান কার্য্যের সময়, যাবতীয় রবি শস্য ও বিদেশীয় শাক শবজী প্রভৃতি রোপণ ও পাইট করিতে হইলে এই সময় মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের ব্যবহার্য্য অধিকাংশ শস্যই (ধান্যব্যতীত) এই সময় বপণ করিতে হয়। সর্ষপ, মশুর, ছোলা, মটর, মুগ, খেঁসারি, বরবটি, যব, গম, পলাণ্ডু, বিলাতী কুমড়া, কাঁকুড়, পটল, উচ্ছে, তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, মৌরি, সুলপা, মেথি, কাল জিরে, ধনে, পালং প্রভৃতির চাসের এই প্রশস্ত সময়। এই সকল শস্য যে নিয়মে বপণাদি করিতে হয়, তাহা কৃষিতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং তদ্ সমুদায় এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

কপি, সালম, গাজর, প্রভৃতি বিদেশীয় তরকারীর পাইট অর্থাৎ গাছের

গোড়া খুসিয়া দেওয়া, জল সেচন, সার প্রদান ঘাসমুথা ইত্যাদি পরিষ্কার করা আবশ্যক। ফলতঃ কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার তরকারীর চাসে মনোযোগের ত্রুটি হইলে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এই সময় তামাকের চারা রোপণ করিতে হয়।

শীতের সঞ্চার আরম্ভ হইলে আর একটী প্রধান কার্য্যে কৃষক-দিগের মন দিতে হয়। এই সময় খেজুর গাছে চাঁচ দিয়া গাছ কাটিতে হয়। যে নিয়মে উহার রস গ্রহণ করিতে হয় তাহা অন্যস্থানে লিখিত হইল।

কার্ত্তিক মাস কি কৃষিকার্য্য কি উদ্যান কার্য্য সকল প্রকার কার্য্যের পক্ষেই অনুকূল। কৃষকগণ যেমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই সময় নানা প্রকার চাসে মন দিয়া থাকে, মালীদিগেরও সেইরূপ আবার উদ্যান কার্য্যে সমধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কৃষক অপেক্ষা মালীর কার্য্য কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং কোন কোন বিষয়ে মালীর কার্য্য অপেক্ষাকৃত কঠিন স্বীকার করিতে হইবে। কৃষককে প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জমিতে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাস করিতে হয়। কিন্তু মালীর তাহা ঘটিয়া উঠে না। বাগানের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে, সেই এক জমি হই সকল সময়ের সকল প্রকার শাক সবজী প্রস্তুত করিতে হয়। বর্ষাকালে বাগানে অধিক জঙ্গল হইয়া থাকে, এজন্য তাহা পরিষ্কার করা উচিত। ঐ সকল জঙ্গল কাটিয়া একটি স্থানে পুঁতিয়া রাখিলে, তদ্বারা সারের কার্য্য হইতে পারে। ফুল ফলের গাছ ছাটিয়া দেওয়া এই সময়ের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। বিশেষতঃ গোলাপ গাছের পাইট পক্ষে কার্ত্তিক মাস যেমন উপযুক্ত সময়, বৎসরের মধ্যে একপ সময় আর দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট ফুল লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, এই সময় গাছের গোড়া আল্‌গা করিয়া রোদ ও হাওয়া লাগাইয়া পুনর্ব্বার গোবরসার দ্বারা তাহা উত্তমরূপ ঢাকিয়া দিতে হয়, সাধারণতঃ অধিকাংশ ফুলগাছের পক্ষে পাতার সার উপকারী, কেবল গোলাপ গাছের পক্ষে গোবরসার অত্যন্ত পুষ্টিকারক।

কার্ত্তিক মাস শস্যাদি চাসের প্রবেশদ্বার স্বরূপ, সম্বৎসরের আশা ভরসা এই সময়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। হৈমান্তিক শস্যাদির

পক্ষে শিশির অত্যন্ত উপকারী। কার্ত্তিক মাস হইতে শিশিরপাত আরম্ভ হইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ্‌ কেবল মাত্র শিশির দ্বারা সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতে পারে না এজন্য জল সেচন তাহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শস্য বিশেষে জলসেচন প্রণালীও একরূপ নহে। কোন কোন শস্যে সপ্তাহ অন্তর, কোন কোন শস্যে দুই সপ্তাহ অন্তর কোন কোন শস্যে আবার প্রতিদিন অপরাহ্নে জল সেচন করিতে হয়। এই সময়ে কোন উদ্ভিদেই দিবসে দুই বার জলসেক আবশ্যক হয় না। হৈমান্তিক চাসের মধ্যে কপি, বেগুণ শাক প্রভৃতি চাস করিলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। অন্যান্য শস্য প্রায় শিশির সিক্ত হইয়াই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

খর্জ্জুর।

আজ কাল খেজুরগাছ একটী প্রধান লাভের আওলাত হইয়া উঠিয়াছে। নদীয়া যশোহর প্রভৃতি কএকটী জেলাতে প্রচুর পরিমাণে খেজুরের আবাদ হইয়া থাকে। খেজুর অতি উপকারী, উহার রস হইতে গুড, চিনি, মিছরি প্রভৃতি যাবতীয় মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পাকা খেজুর খাইতে সুমিষ্ট, কিন্তু উহাতে শস্য অল্প। দেশীয় খর্জ্জুর অপেক্ষা পিণ্ডি খর্জ্জুর অতি সুখাদ্য। পীড়িত অবস্থায় খেজুরের মাথি রোগীর পথ্যের জন্য চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সকলেই নিত্য নানা প্রকার মিস্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য কি উপায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং গুড ও চিনির মূল যে খেজুর গাছ, তাহার রোপণ প্রণালী ও লাভালাভ অনেকেই অবগত নহেন। চাকুরীপ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বাধীন কৃষিকার্য্যের লাভ দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, সামান্য বেতনে জীবন বিক্রয় করিয়া অপমান সহ্য করা অপেক্ষা কৃষিকার্য্য কতদূর লাভজনক। বাস্তবিক এদেশের ভূমির উপর ঈশ্বর

যেরূপ সদয় তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অত্রত্য অধিবাসিগণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইলে কখনই উদরান্নের জন্য এত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতেন না।

কোন সময় হইতে এদেশে খেজুর গুড় ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যে খেজুর চাস অধিক হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ কাল খেজুর গুড় ও চিনি একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য রবিনসন্স সুগার প্লাণ্টার্স হইতে খেজুর সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় এস্থলে সংগৃহীত হইল। ইংরাজী ১৭৯১ সালে কলিকাতার বোর্ড অব্ ট্রেড ৫৪ কেকৃটরি মণ খেজুরিয়া চিনি বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু উহা অল্প পরিমাণ বশতঃ তখনও কেহ ঐ বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। এবং কি প্রকার দরে বিক্রয় হয় তাহাও উল্লিখিত হয় নাই। উক্ত বোর্ড ইংরাজী ১৭৯২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাণিজ্য বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশক যে রূপ লেখেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালা দেশে বৎসর বৎসর যত খেজুরিয়া চিনি জন্মিত তদ্‌সমুদায়ের পরিমাণ ১৫০০০ পোনের হাজার মণ মাত্র। ইহাতে বোধহয় ঐ সময়ে এদেশে খেজুরের চাস অল্প পরিমাণে ছিল। পরেও ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ এই যে উহা কোম্পানির এক চেটিয়া ব্যবসা থাকাতে অনেকে উহার চাস করিতে বিমুখ হইত এবং এদেশ হইতে যে সকল চিনি আমদানী হইত তাহার মাস্তুলও অধিক ছিল। এদেশের লোক সকল অনেক পূর্ব্ব হইতে খেজুরিয়া চিনির ব্যবহার জানিত, কিন্তু ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে বিলাতের বাজারে কেহ এমত জানিত না যে খেজুরিয়া চিনি একটা বাণিজ্য দ্রব্য।

তাহার পরে ঐ চিনি বৎসর বৎসর কত পরিমাণে অধিক হইতে লাগিল এবং বর্ত্তমান সময়ে কত অধিক হইয়াছে, তাহা যথার্থরূপে নিশ্চয় করিবার যদিও কোন উপায় নাই, তথাপি ইয়ুরোপের লোকেরা যত চিনি লইয়া রিফাইন্ অর্থাৎ পরিষ্কার করে, এবং এদেশীয়েরা যত চিনি রিফাইন করিয়া কলিকাতার বাজারে গরপাট্টা বা দোবরা নাম দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে ঐ দুইয়ের পরিমাণ একত্র করিয়া যে হিসাব প্রস্তুত হয় তাহাতে বোধহয় ৯৫০০ সাড়ে নয় হাজার টন অবধি ১০০০০ দশ হাজার টন পর্য্যন্ত ঐ চিনি

বৎসর বৎসর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এখন ইংলণ্ডে যত চিনি আমদানী হয় তাহার সমুদায়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ খেজুরিয়া চিনি।

ইংরাজেরা এখন খেজুরিয়া চিনির বিষয় মনোযোগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা খাঁড় ও দোলো লইয়া রিফাইন্ করিয়া থাকেন, খেজুর গাছের চাস দ্বারা গুড় প্রস্তুত করিতে মনোযোগ করেন নাই। ইক্ষু গুড়ের খাঁড় অপেক্ষা খেজুরিয়া খাঁড় রিফাইন্ করিতে অধিক লাভ আছে, কারণ ইহাতে দানাদার ও উত্তম রঙ্গের চিনি হয় এবং পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়। ইক্ষুগুড় রিফাইন্ করিলে তদ্রূপ হয় না। কিন্তু খেজুরিয়া গুড় হইতে ঐরূপ চিনি হওয়াতে তাহার যেমন গুণ আছে তেমনি একটা দোষও আছে অর্থাৎ ঐ গুড় শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় পরন্তু চিনি করিয়া রিফাইন্ করিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। খেজুরিয়া গুড় যে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় তাহার কারণ এই, ঐ গুড়ে মিষ্টতা ও আঠা এই দুই পদার্থ থাকে, অনেক দিন ঘরে রাখিলে আঠার ভাগ মিষ্টতার সঙ্গে মিশিয়া যায় তাহাতেই পচিয়া উঠে। ইক্ষুগুড়ে ঐরূপ আঠা নাই সুতরাং তাহা মিষ্টতার সঙ্গে মিশে না এবং শীঘ্র পচিয়াও যায় না।

ইক্ষু ও খেজুরিয়া গুড় যে পরস্পর ভিন্ন তাহার ঐ মাত্র কারণ। খেজুরিয়া গুড়ে যে আঠা থাকে তাহা রেফাইন না করিলে যায় না, দোলো বা চিনি যাহা কর তাহাতেই উহা থাকিবে। অপর খেজুরিয়া চিনি ইক্ষু চিনি অপেক্ষা অল্প মিষ্ট এবং রঙ্গে কিছু ময়লা হয়, ইহার কারণ এই বোধহয় যে যখন রস জ্বাল দিয়া গুড় করে তখন উত্তাপ ও খার দ্বারা আঠার কতক অংশ নষ্ট হইয়া যায় তাহাতেই ঐরূপ হয়। ইক্ষু চিনি খেজুরিয়া চিনি ভিন্ন হইবার অপর একটী কারণ এই যে ইক্ষু গুড়ে এক প্রকার তৈল থাকে ইহাতে তাহা নাই। এই তৈল থাকাতে ইক্ষু গুড়ের রম নামক মদ খেজুরিয়া গুড়ের মদ অপেক্ষা সুস্বাদু হয়।

খেজুরিয়া চিনি ইক্ষু চিনি অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে তৈয়ার হয় এবং ইহার চাসে কোন ঝোঁক নাই। ভালরূপে গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলে বাঙ্গালা পরিমাণের ফি বিঘা জমিতে পৌনে উন আশী মণ পর্য্যন্ত গুড় পাওয়া যায় তাহাতে ইংরাজী পরিমাণ ফি একর জমিতে পাঁচ টন চিনি উৎপন্নের জন্য

হয়। খেজুরিয়া ও ইক্ষু চিনি তৈয়ার করিতে গেলে খেজুরিয়া চিনি ইক্ষু চিনির খরচের তিন ভাগের দুইভাগ লাগে। অপর খেজুরিয়া চিনি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকসান আশঙ্কা নাই এবং উহার চাসও অল্প ব্যয়ে হইতে পারে।

কি নিয়মে খেজুরের চাস করিতে হয় এবং ইহার চাসে যেরূপ লাভ হইয়া থাকে তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত প্রকাশ জন্য যশোহর জেলার খেজুর চাস সম্বন্ধে ডেপুটী কলেকটার শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ীতে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড় খেজুর গাছের নীচে যে খেজুর পড়ে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া কৃষকেরা বাড়ীর নিকটে একটী স্থানের মাটী সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ বীজ রোপণ করে। তিনি চারি সপ্তাহ মধ্যে [আর বৃষ্টি হইলে ইহারও পূর্ব্বে] ঐ সকল বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। তখন ইহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়। তাহা না হইলে গো মেষাদি আসিয়া অঙ্কুরের নূতন পাতা খাইয়া ফেলিতে পারে। অঙ্কুর হইতে দুইটী পাতা বাহির হইলেই ইহার চারিদিকে নিড়ানি [Weeding] আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় না নিড়াইলে চারিদিকের জঙ্গলে অঙ্কুরকে এত জড়াইয়া ধরে যে, অঙ্কুর আর বাড়িতে পারে না। দুই তিন বার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, ও দুই তিন বৎসর এইরূপে চলিতে থাকে। এই সময়ের পর খেজুর চারাগুলি ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। চারি পাঁচ বার ক্ষেতে চাস করিয়া চাস দিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে গোবর, ছাই ও খৈল দিলে ভাল হয়। উর্ব্বরা অথচ যাহাতে বর্ষাকালে জল উঠে না, এইরূপ জমি খেজুরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জলা জমি বা লোনা জমিতে খেজুর ভাল হয় না।

সাত আট হাত অন্তর সারি সারি করিয়া চারাগুলি রোপিত হয়। সুতরাং এক বিঘাতে ১০০।১২৫টী গাছ অনায়াসেই জন্মিতে পারে। এত-দূর করিয়া চারা রোপণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাতে সকল গাছেই যথেষ্ট আলো ও বাতাস পাইতে পারে, আর দুই সারির মধ্যে অনায়াসেই

চাস করিতে পারা যায়। আমাদের দেশের অনেক লোকের সংস্কার যে শস্যাদি যত ঘন হয় ততই ভাল। এই জন্য তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক শস্য বীজ বপন করে। এইরূপ করিলে প্রথমতঃ অনেক অঙ্কুর হয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট আলো ও বাতাস না পাইয়া চারাগুলি নিস্তেজ হইয়া যায়; সুতরাং অবশেষে অতি অল্প ফল হয়। *

চারা গাছের চারিদিকে উলু ঘাস জন্মিয়া অত্যন্ত অনিষ্ট করে; এই জন্য প্রতি বৎসর দুইবার গাছের চারিদিকে কোদাল দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া দিতে হয়। গাছের পাতাগুলি যতই বড় হইতে থাকে, ততই দুই সারির মধ্যবর্ত্তী স্থান ঢাকিয়া যায়। এই জন্য এই পাতাগুলি কাটিয়া সেই স্থানে কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন করে। যতদিন পর্য্যন্ত গাছ বড় না হয় অর্থাৎ ইহার পাতার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় স্থান ঢাকিয়া না ফেলে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ চাস চলিতে পারে। কারণ ভালরূপ আলো না পাইলে গাছের ছায়ায় কোন শস্য ভাল হয় না। দুই সারির মধ্যবর্ত্তী স্থলে শস্য জন্মে বলিয়া খেজুরের কোন অনিষ্ট হয় না, বরং ভালই হয়। কারণ তাহাতে ভূমি পরিষ্কার থাকে, জঙ্গল জন্মিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। চারা অবস্থায় থাকিতেই ভূমির উপর বর্ষার জল উঠিলে, অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। কারণ, বর্ষার জল হইতে নূতন পাতাতে অতি পাতলা মাটী পড়ে, সুতরাং পাতাগুলি শীঘ্র মরিয়া যায়। জল যত উচ্চ ও ঘোলা হয়, খেজুর গাছের তত অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা।

সাত বৎসরের হইলে রসের জন্য খেজুর গাছ কাটা হয়। সাধারণতঃ গাছের পূর্ব্ব কি পশ্চিম দিকে কাটা হয়। কারণ তাহা হইলে ক্ষত স্থানে সম্পূর্ণরূপ রৌদ্রের তাপ পায়। কিন্তু গাছে উঠিবার ও গাছ হইতে নামিবার বিশেষ সুবিধা অনুসারে উত্তর বা দক্ষিণ দিকেও ক্ষত করা হয়। কখন এইরূপ হয় যে পূর্ব্বদিকে ক্ষত করা হইয়াছে, কিন্তু গাছটি পরে ঝড়ে এত বাঁকিয়া পড়িয়াছে যে তখন গাছে উঠিবার সুবিধার জন্য উত্তর বা দক্ষিণ দিকেও ক্ষত করা হয়। বৎসর বৎসর এইরূপে ক্ষত করা হইয়া

* ইংলণ্ডে অনেকে এক বিঘা জমিতে বিশ সের মাত্র গোধূমের বীজ বপন করে। তাহা হইতে প্রতি বিঘায় ৯।১০ মণ গোধূম হয়।

থাকে। এইরূপে এক এক গাছে ৪২। ৪৩। ৪৪ টি পর্য্যন্ত ক্ষত স্থান দেখা যায়।

আশ্বিন মাস গাছ কাটিবার সময়। গাছের এক ধার কাটিয়া একটি ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে নলি [নল] বসাইতে হয়। গর্ত্ত অধিক গভীর হইলে গাছের অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, আবার গর্ত্ত অধিক গভীর না হইলে রস অধিক পাওয়া যায় না।

খেজুর গাছ দুই ভাগে বিভক্ত, পুরুষ জাতীয় ও স্ত্রী জাতীয়। পুরুষ জাতীয় গাছে ফল হয় না, কিন্তু অতি শীঘ্রই রস বাহির হইতে আরম্ভ করে। স্ত্রী জাতীয় গাছে তত শীঘ্র বাহির হয় না।

বাগানের গাছগুলি সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত [পালা] করা হয়। সকল গাছ এক সময়ে কাটা হয় না। প্রতি সপ্তাহে এক একটি গাছ তিন বার কাটা হয়। প্রথমবার কাটিলে যে রস পাওয়া যায়, তাহাকে 'জীবান' দ্বিতীয় বারের রসকে "দো-কাট" আর তৃতীয় বারের রসকে " তেকাট " বলে। প্রত্যেক গাছই তিন দিন কাটা হয়, পরে তিন দিন বিশ্রাম পায়।

দিন	বাগান অংশ		রস
প্রথম দিন	১ ম	অংশ	জীবান
দ্বিতীয় দিন	১ ম	,,	দোকাট
	২ য়	,,	জীবান
তৃতীয় দিন	১ ম	,,	তেকাট
	২ য়	,,	দোকাট
	৩ য়	,,	জীবান
চতুর্থ দিন	১ ম	,,	বিশ্রাম
	২ য়	,,	তেকাট
	৩ য়	,,	দোকাট
	৪ র্থ	,,	জীবান
পঞ্চম দিন	১ ম	,,	বিশ্রাম (দুই দিন)
	২ য়	,,	বিশ্রাম (এক দিন)
	৩ য়	,,	তেকাট
	৪ র্থ	,,	দোকাট
	৫ ম	,,	জীবান

দিন	বাগান অংশ		রস
ষষ্ঠ দিন	১ ম	অংশ	বিশ্রাম (৩ দিন)
	২ য	,,	বিশ্রাম (১ দিন)
	৩ য়	,,	বিশ্রাম (১ দিন)
	৪ র্থ	,,	তেকাট
	৫ ম	,,	দোকাট
	৬ ষ্ঠ	,,	জীবান
সপ্তম দিন	১ ম	,,	জীরান
	২ য	,,	বিশ্রাম (৩ দিন)
	৩ য	,,	বিশ্রাম (২ দিন)
	৪ র্থ	,,	বিশ্রাম (১ দিন)
	৫ ম	,,	তে-কাট
	৬ ষ্ঠ	,,	দো-কাট

বাগানে বা বাগানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রস জ্বাল দেওয়া হয়। জ্বাল দিবার সময় যে বুদ্বুদ উঠে, তাহাকে মাকড়াসা, শর্ষাফুলী বাঘাই ও গুড়িয়া বলে। শেষোক্ত প্রকার বুদ্বুদ্ উঠিলেই রসের যথেষ্ট জ্বাল হইয়াছে, মনে করিতে হইবে।

সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রস সংগ্রহ করা যায়। ইহাতে ১১০ দিন হইবে। ইহা হইতে শীত কুয়াসাদি দৈব ঘটনার জন্য ১০ দিন বাদ দিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক গাছ ৫০ বার মাত্র কাটা হয়। অগ্রহায়ণ মাস অপেক্ষা পৌষ ও মাঘমাসে অধিক রস পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ	মাসের	১৩	দিনে গড়ে	দুই	সের	কুড়িয়া	——২৬ সের
পৌষ	,,	১৪	,,	,, ৫	"	"	——৭০ "
মাঘ	,,	১৫	,,	,, ৮	"	"	——১২০ "
ফাল্গুন	"	৮	,,	,, ৩	"	,,	——২৪ "
							২৪০ ,,

বৎসরে একটি গাছ হইতে ৬/ মণ রস পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দশ সের রসে এক সের গুড় হয়, সুতরাং ৬/ মণ রস হইতে ২৪ সের গুড় হইবে।

যেস্থানে গুড় তৈয়ার হয়, তথায় ইহার এক মণের দাম ২৲ টাকা হইবে। সুতরাং একটি গাছ হইতে অন্ততঃ ১ টাকা মূল্যের গুড় পাওয়া যায়।

রস একত্র করিয়া ও জ্বাল দিয়া গুড় করিতে যত ব্যয় পড়ে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া যাইতেছে।

দুই বিঘা জমিতে অনায়াসে ২০০ শত গাছ জন্মিতে পারে। ইহাতে এই সকল ব্যয় পড়িবে।

রস একত্র করা—

গাছী	২২৲
তাহার খাওয়া পরা (৫ মাস)	১৪৶০
	৩৬৶০
একজন খেবি [সাহায্যকারী]	৯৲
তার খাওয়া পরা	১৪৲
	২৩৲

গুড় তৈয়ার করা—

জ্বালানি কাঠ	১০৲
হাঁড়ি	৫।/০
ভূমির কর	৫৲
বাইন [চুল্লী] করিবার অনুমতি	১৶০
অন্যান্য ব্যয়	১৲
	২২।৶০
সমষ্টি	৮১৸/০

দুই শত গাছে ৮১৸/০ অর্থাৎ প্রতি গাছে ।৶১০ ব্যয় পড়িবে, আর তাহা হইতে ১ টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং ব্যয় বাদ দিয়া প্রত্যেক গাছে ৸/১০ খাটি লাভ থাকিবে। এক বিঘা জমিতে অনায়াসে ১০০ গাছ জন্মিতে পারে। সুতরাং এক বিঘা হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৫০৲ টাকা লাভ হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খেজুর গাছ সাত আট বৎসরের না হইলে কাটা উচিত নয়। যদি একটি বাগান করিয়া সাত আট বৎসর, অপেক্ষা করা যায়, তাহা হইলে পরে খেজুরে যে অনেক লাভ হয়, তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারেন এজন্যই যশোহরে দিন দিন খেজুরের চাস বাড়িতেছে।

ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের অনেক প্রদেশে খেজুর গাছ বিনা যত্নেই জন্মে। যত্ন করিলে নিশ্চয়ই অন্যান্য অনেক স্থানে ইহার চাস আরম্ভ করা যাইতে পারে। চাস করিতে গিয়া ভূমিতে সার না দেওয়া অথবা দিলেও অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া, এ দেশের লোকের এই বিষম রোগ। সার দিলে অতি অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয়, আর অতি উর্ব্বরা ভূমিতেও সার না দিয়া অধিক কাল চাস করিলে অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে।

লঙ্কা।

লঙ্কা একটী প্রধান ব্যবসার দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার চাসে লাভ মন্দ নহে। কোন্ শস্য চাসে কিরূপ ব্যয় পড়ে এবং দিন দিন উহার চাস প্রণালীর উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সঠীক সংবাদ পাওয়া বড় কঠিন; কারণ যে সকল ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত আছে, তাহারা প্রায় বর্ণজ্ঞান শূন্য মূর্খ, কোন বিষয়ের উন্নতি অবনতির কারণ অনুসন্ধান করা তাহারা আবশ্যক জ্ঞান করে না। এজন্য অনেক প্রকার শস্যাদির চাস ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা সবডিবিজনে পূর্ব্বে যে পরিমাণে লঙ্কার চাস হইত এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এই হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কৃষি অনুরাগী তত্রত্য সুযোগ্য ডেঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু মহোদয় একটী পুরস্কার ঘোষনা করিয়া দেন, যে ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গা বিভাগে লঙ্কা চাসের অবনতির কারণ লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, তিনি ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। এই পুরস্কার

প্রত্যাশায় যে সকল ব্যক্তি তত্রত্য লঙ্কা চাসের অবনতি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রবন্ধের স্থুল স্থুল বিবরণ প্রকাশিত হইল।

এ দেশে ঝালের জন্য গোল মরিচ, চৈ, পিপুল প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে। এ দেশে পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে লঙ্কার ব্যবহার হইত না, তজ্জন্য উহার চাসে লোকের তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। তখন লঙ্কার মণ (কাঁচি) পাঁচ ছয় আনা দরে বিক্রীত হইত। নদীয়া জেলার মধ্যে হলদহ পরগনার এবং যদুপুরে লঙ্কা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। তদনন্তর চুয়াডাঙ্গা, কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর—ঝিনাদহ প্রভৃতি বহুতর স্থানে লঙ্কার প্রচুর চাস হইতে আরম্ভ হয়। কৃষকগণ উহার চাসে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া অনেকেই আবাদে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে দিন দিন উহার আবাদ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্তিকার যে যে পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে লঙ্কা উৎপন্ন হয় কিন্তু অধিককাল ধরিয়া এক জমিতে উহার চাস করিলে লঙ্কার পুষ্টিজনক পদার্থের অভাব হইয়া উঠে। বিশেষতঃ লঙ্কার অত্যন্ত ঝাজ, উহার তীব্রতেজে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। এজন্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এক স্থানে উহা ভালরূপ উৎপন্ন হয় না।

মৃত্তিকা কর্ষণাদি ও রসের দ্বারা যত কোমল হইবে, ততই উদ্ভিদের কেশবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলগুলির কোমলাঙ্গ অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়াদ্বারা মৃত্তিকাস্থ পোষনোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদের এই পোষণ কার্য্য সম্পাদন জন্য কৃষকেরা লঙ্কার জমিতে সম্বৎসর চাস দিয়া থাকে এই চাসকে "বারমেসে চাস" বলে। শ্রাবণের শেষ ভাগে লঙ্কা রোপণের উপযুক্ত সময়। এবং এই সময় হইতে ঘাস মুথা পরিস্কার করিবার জন্য আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ক্ষেত্র নিড়ানি দ্বারা খুসিয়া দিতে হয়, এইরূপ নিড়ানি ব্যবহার দ্বারা মৃত্তিকার কোমলতা সম্পাদিত হইয়া লঙ্কার বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। কৃষকেরা ইহাকে "মরিচ চালা" কহে। আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিক মাসে জল না হইলে যথেষ্ঠ লঙ্কা উৎপন্ন হয়।

এক জমিতে অধিক দিন লঙ্কার চাস করিলে গাছগুলির অগ্রভাগ

ক্রমে সূক্ষ্ম ও পাতাসমূহ লাল হইয়া ঝরিয়া পড়ে। নিস্তেজ গাছে দুই একটি ফল হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু গাছের এইরূপ অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে যদি সে বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে গাছ সমূহ কতক পরিমাণে রস গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সবল হয় এবং প্রতি গ্রন্থির পত্রকক্ষ হইতে লঙ্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জমিতে ক্রমাগত লঙ্কার চাস হয়, সেই জমির গাছের পর্ব্বে রসের অভাব হইয়া ফলোপযোগী পদার্থের সংকুলান হয় না, তন্নিবন্ধন পুষ্প বহির্গত হইয়া ফল প্রজননে ব্যাঘাত জম্মে এবং ফুল ঝরিয়া পড়ে। আবার এরূপও হইয়া থাকে যে পর্ব্বস্থ রস চারিদিকে সমভাবে সঞ্চারিত হইতে না পারিয়া এক স্থানে সঞ্চিত হইয়া সে স্থানটি পচাইয়া ফেলে, ইহাকে "ডানাভাঙ্গা" রোগ বলে। এই রোগে লঙ্কার বিশেষ অনিষ্ঠ সাধন করিয়া থাকে।

লঙ্কার প্রধান মূলটী লম্বভাবে প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত মৃত্তিকা মধ্যে প্রথিত থাকিয়া উদ্ভিদ্‌কে সোজা রাখে। কিন্তু ঐ মূলে আবশ্যকীয় তাঁপ ও আলোক না পাইয়া রসায়ণক্রিয়ার ব্যাঘাত নিবন্ধন শরীর পোষনোপযোগী পদার্থ মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, এই সময় প্রকৃতির নিয়মানুসারে মৃত্তিকার এক ইঞ্চ নিম্ন হইতেই আড়া আড়ি ভাবে কতকগুলি মূল বহির্গত হয়, ঐ মূলগুলি হইতেই অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় বহির্গত হইয়া তাপ আলোক ও বায়ুর সাহায্যে, নিকটস্থ প্রয়োজনীয় পরমাণু স্ব শরীরে চালিত করিয়া উদ্ভিদ্‌কে বর্দ্ধিত করিতে থাকে।

লঙ্কার জমি মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিয়া পুনর্ব্বার উহার চাস করিলে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। গোবর ছাই প্রভৃতি আবর্জ্জনা ক্ষেত্রে দিলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ দেশের কৃষকেরা জমি পতিত রাখে না তাহার কারণ এই তাহারা ভাবিয়া থাকে পতিত রাখিয়া জমীদারকে অনর্থক খাজনা দেওয়া অন্যায় অপর অধিক পরিমাণে জমি পতিত থাকিলে মহাজনেরা অল্প আবাদ দেখিয়া অধিক পরিমাণে টাকা কর্জ্জ দেয় না।

জমির চাস শেষ করিয়া প্রতি বিঘায় ।৫ বিটলবন ২/০ গোবরের সার একত্রে মিশাইয়া জমিতে ক্ষেপণ করতঃ মৈ দিয়া লঙ্কা রোপণ করিবে।

ভাদ্রের শেষে অথবা আশ্বিনের প্রথমে যে দিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ঐ দিন বৃষ্টিপাত সময়ে প্রতি বিঘায় ॥০ গোময় ৮৯ সের গোবরের সার একত্রে গুলিয়া তরল করত সমস্ত গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, এই সময় /১ বিটলবর্ণ ও /১ সের গুঁড়া চূণ দিলে ভাল হয়। বৃষ্টির জলে গাছ ধুইয়া ঐ সমস্ত সার মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়। অধিক বৃষ্টিতে সার ধুইয়া ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইলে কোন ফল হয় না। সার যাহাতে স্থানান্তরিত হইতে না পারে এরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। বৃষ্টির সময় ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত গুঁড় সার দিলে, উহা পাতায় লাগিয়া শুষ্ক হইলে গাছ দুর্ব্বল হইবে, কারণ পত্রই উদ্ভিদ্‌দিগের পাকযন্ত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের নাসিকা স্বরূপ। অতএব পত্র পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া বিধেয়।

এ দেশে ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিবার জন্য লঙ্কা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমূহ নষ্ট হয় এবং কোন কোন রোগ বিশেষে ঔষধের কার্য্যে লাগিয়া থাকে, লঙ্কার গুণও যেমন দোষও বিস্তর, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে পিত্ত বৃদ্ধি করে।

লঙ্কার আবাদ অত্যন্ত পরিশ্রম-সাধ্য। কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে চাস দিয়া জমিতে হিম খাওয়াইতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে পর বৎসর ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত মাসে মাসে চাস দিতে হয়। ফলতঃ লঙ্কার জমিতে বারমাসেই চাস দিতে হয়। ভাদ্রমাসে চারা রোপণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত নিড়াইয়া ভূমি পরিষ্কার রাখিতে হয়। ফাল্গুন মাসে ফল তুলিয়া উহা রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।—এ দেশে বিঘা প্রতি কুড়ি পঁচিশ মণ লঙ্কা পাওয়া যাইত, এক্ষণে ফলনের সংখ্যা হ্রাস ও আবাদ অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লঙ্কা চাসে অমনোযোগের কয়েকটী কারণও দেখা যাইতেছে, ফলন কম হওয়াতে কৃষকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হওয়ায় অনেকে উহার চাসে মনোযোগী হয় না। ডেনাভাঙ্গা রোগে প্রচুর ক্ষতি হওয়াতে অনেকেই আবাদে প্রবৃত্ত হয় না, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস এই সকল কারণে এদেশে লঙ্কার আবাদ ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

ক্রমশঃ

কৃষি প্রদর্শিনী মেলা।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের পক্ষে অনুকূল। দেশের প্রকৃতি অনুসারে নানা দেশে নানা কার্য্যের উন্নতি হইয়া থাকে। কার্য্যানুসারে দেশের অবস্থা উন্নতি পথে গমন করে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ক্ষেত্র কৃষি-কার্য্যের পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত স্থল, অন্য কোন দেশ সেরূপ দেখা যায় না। অত্রস্থ মৃত্তিকা অকাতরে শস্যাদি প্রসব করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। জল বায়ু উত্তাপ সম্পূর্ণ কৃষিকার্য্যের সহকারী দেখা যাইতেছে। স্বল্প ব্যয়ে এদেশে যেমন কৃষিকার্য্য চলিতে পারে অন্য কোন দেশে সেরূপ সুবিধা দেখা যায় না। স্কটলণ্ড দেশের ন্যায় এখানে প্রস্তর ভেদ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে হয় না। যে প্রভূত পরিশ্রম ও প্রচুর ব্যয় আবশ্যক করে। সামান্য পরিশ্রম করিলেই এদেশে যথেষ্ট শস্য লাভ করা যায়। জননীর ন্যায় ভারত মৃত্তিকা ভারত সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতেছে। ভারতে যে কৃষি-কার্য্যের এত অবনতি হইয়াছে, তত্রাপি ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্য এখনও পৃথিবীর নানাদেশে নানা জাতিকে প্রতিপালন করিতেছে। অত্রস্থ শস্যাদি বিদেশে প্রেরিত না হইলে দেশের এত অন্নকষ্ট হইত না।

প্রত্যেক দেশের কৃষিজাত দ্রব্য তত্তদ্দেশে আবদ্ধ থাকিলে, ধন বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি হয় না। কৃষিজাত দ্রব্য বাণিজ্যে পরিবর্ত্তিত না করিলে অভিলষিত ফললাভ হয় না। ভারতের শস্যাদি যতই বিদেশে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইবে, ততই দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা তণ্ডুলের যে এত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদেশে রপ্তানীই ইহার মূল কারণ। তবে ইহাদ্বারা এক অপকার এই দেখা যায়, দেশীয় শস্যাদি অধিক পরি-মাণে বিদেশে প্রেরিত হইলে, দেশ মধ্যে শস্য সঞ্চিত থাকে না, এক বৎসর যদি কোন কারণে অজন্মা হয়, তাহা হইলে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি হইয়া উঠে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অনিষ্ট নিবারণে উপায়ও বর্ত্তমান আছে। যে পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা

অপেক্ষা যদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায় তাহা হইতে সে অপকার নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু সমধিক দুঃখের বিষয় এই দেশীয় লোক-দিগের কৃষিকার্য্যের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা ও অযত্ন তাহাতে শস্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা দূরে থাকুক প্রত্যুতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে উৎপন্নের হার দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ভারত মৃত্তিকা অপেক্ষা যে সকল দেশের মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা কৃষিকার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কৃষি বিদ্যার সম্যক শ্রীবৃদ্ধিজনিত সেই সকল দেশে উৎপন্নের হার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারত মৃত্তিকা উর্ব্বরা হইয়াও শস্য প্রসবে দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়ি-তেছে। যেমন দুগ্ধবতী পয়স্বিনীকে আবশ্যকীয় খাদ্য ও উপযুক্ত নিয়মে প্রতিপালন না করিলে ক্রমে ক্রমে তাহার দুগ্ধ দান শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে সে ইরূপ উপযুক্তরূপ সার প্রদান এবং কর্ষণাদির অভাব হইলে সুচারু রূপ শস্য উৎপন্ন হয় না। ১৮৭৬ অব্দে এপ্রেল্ মাসের ইণ্ডিয়ান এগ্রিকল্-চারিষ্ট" নামক কৃষি বিষয়ক পত্রিকার এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে "সমস্ত ইয়ুরোপে গড়ে প্রতি বিঘায় ৬৸৹ মণ আর ভারতবর্ষে গড়ে ২৸৹ মাত্র গোধূম হয়। ইটালীতে প্রতি বিঘায় ১০৷৹, আমেরিকায় প্রতি বিঘায় ৮৷৹ আর ভারতবর্ষে গড়ে ৩ মণ ধান হয়। আমেরিকায় প্রতি বিঘায় ৩৩ [তেত্রিশ] সের, মিসর দেশে ১৷৷৹ হইতে ২ মণ, আর ভারতবর্ষে গড়ে ।৹ দশ সের মাত্র তুলা হয়। এই দেশে যে এত অল্প শস্য জন্মে, তাহা ভূমির দোষে না কৃষিকার্য্যের দোষে?"

উপরি লিখিত তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভারতে উৎ-পন্নের হার ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যে ভারত সহজেই প্রচুর শস্য প্রদান করিত, যে ভারত মৃত্তিকা পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক শস্যশালিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই সুখ্যাতি ক্রমেই খর্ব্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে, যদিও এদেশে সেই প্রণালী সর্ব্বোতোভাবে উপযোগী নহে, কিন্তু তাহার কোন কোন অংশ দেশমধ্যে প্রচলিত করিলে যে প্রভূত উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য। ইয়ুরোপের মৃত্তিকা শস্য প্রসবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও কৃষিবিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে উক্ত মৃত্তিকা

হইতে এদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইতেছে। এখনও যদি ভারতে আবার সম্যক্‌রূপে কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়, কৃষির উন্নতি সাধনে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেখা যায় এবং দেশীয় কৃত বিদ্যগণের ইহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে ভারত আবার মস্তক উন্নত করিয়া পূর্ব্বগৌরব ধারণ করে, ভারতের মৃত শরীরে পুনর্ব্বার জীবন সঞ্চারিত হয়, ভারতের শস্য ভারত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে পরিপোষণ করিতে পারে। যে পেটের ভাতের জন্য আমরা দাসত্বের ভার মস্তকে বহন করিতেছি, মানাপমান, জাতীয় গৌরব ভারত হৃদয় হইতে চির-দিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়াছি, অমূল্য পরমায়ু পর্য্যন্ত প্রভুর পদে উৎসর্গ করিয়াছি কিন্তু সেই ভাতের মূল যে কৃষি তাহার উন্নতি, তাহার আভ্যন্তরিক দোষ পরিহারে অণুমাত্রও চেষ্টা কিম্বা যত্ন করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন। ভারতবাসিদিগের কেমন একটা রোগ হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা স্বয়ং অবলম্বন করিতে বিমুখ এই জন্যই ভারতের যারপর নাই দুর্দ্দশা। ভারত যদি আজ আপন কর্ত্তব্যে যত্নশীল হইত তাহা হইলে উদরা-ন্নের জন্য এত শোচনীয় অবস্থা হইত না।

যে কোন কার্য্যে আন্তরিক উৎসাহ না থাকিলে তাহা সুন্দররূপ সম্পন্ন হয় না। যে সকল কার্য্য অবলম্বন করিলে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় সেই সকল কার্য্য অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি স্বাধীন কার্য্য সমূহে দেশীয় ব্যক্তিদিগের আদৌ উৎসাহ নাই। এই উৎ-সাহ অভাব নিবন্ধন দেশের এত দুরবস্থা। কএক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে দেশীয় কৃষির উৎসাহ দান জন্য স্থানে স্থানে এক একটী কৃষি প্রদর্শিনী মেলা সংস্থাপিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠানের যে অতি মহৎ উদ্দেশ্য তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু যে আকারে উক্ত মেলা হইয়া থাকে, তদ্দারা অভীষ্টসিদ্ধ হওয়া কঠিন। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মেলার উপলক্ষে কেবল কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। মেলাতে স্থায়ী উৎসাহ-জনক কোন পুরস্কার প্রদত্ত হয় না। যে দুই চারি টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, তদ্দারা কোনমতেই অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না। মেলার উদ্দেশ্য কৃষিজগতের উন্নতি অর্থাৎ বর্ত্তমান কৃষি প্রণালীতে যে সকল দোষ আছে,

তাহার পরিহার ও দেশমধ্যে নানা প্রকার লাভজনক নূতন নূতন কৃষির অনুষ্ঠান এবং শস্যাদির উৎপন্নের হার বৃদ্ধির সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি বিধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মেলাতে ইহার একটীও উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে মেলা উপলক্ষে কতক আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে।

যে সকল দ্রব্য মেলাতে আসিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক কৃষকের পরিশ্রম ও দক্ষতা হইতে উৎপন্ন কি স্বাভাবিক সেইরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেখা উচিত। স্বাভাবিক যে সকল দ্রব্য বৃহৎ আকারে জন্মিয়া থাকে, যাহার উন্নতি জন্য কিছুমাত্র যত্ন করিতে হয় না। সেই দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। আমরা দেখিয়াছি, অনেকে গ্রাম মধ্যে কাহার বাড়ীতে কোন ফল কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য বৃহৎ আকার বিশিষ্ট কি আশ্চর্য্য-জনক উৎপন্ন হইলে, তাহা চাহিয়া লইয়া মেলাতে উপস্থিত করিয়া থাকে, মেলাকারকগণ উপস্থিত কারীকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া থাকেন। মেলার দ্রব্য সংগ্রহ জন্য দেশমধ্যে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, সেই বিজ্ঞাপনুসারে কতকগুলি দ্রব্য মাত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় যদি যথার্থই কৃষিজগতের উৎসাহ দান ও শ্রীবৃদ্ধি বিধান মেলার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কৃষকদিগকে এরূপ উৎসাহ দান করা আবশ্যক, যাহাতে বাস্তবিক দেশের উপকার হয়।

আজ কাল গ্রামে গ্রামে প্রায় স্কুল, পোষ্ট অফিস্, থানা, ফাঁড়ি, ডাক্তারখানা, সবরেজেষ্টারি অফিস্ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যালয় স্থাপিত হইতেছে, ঐ সকল কার্য্যে অনেক ভদ্রলোক নিযুক্ত আছেন এবং গ্রাম মধ্যেও সুশিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, ঐ সকল লোক লইয়া স্থানে স্থানে এক একটী কৃষি-বিষয়ক সভা সংস্থাপিত হউক। মেলায় যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে, অর্থাৎ মফঃস্বল হইতে যাহা যাহা আসিয়া থাকে, তদসমুদায় উক্ত সভার বিশ্বাস যোগ্য পত্রসহ গ্রহণ করা আবশ্যক। সভা দেখিবেন বাস্তবিক কৃষকগণ আন্তরিক পরিশ্রম করিয়া মেলার প্রদর্শিত দ্রব্যাদি উৎপাদন করেন কি না। যে সকল ব্যক্তি অর্থাভাবে কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম, মেলা হইতে তাহাদিগকে গো, কৃষি ব্যবহার্য্য দ্রব্য এবং বীজ খরিদ করিয়া দিলে যথার্থ উৎসাহ দান করা হয়। নতুবা দুই এক বৎসর

অন্তর চারি পাঁচ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। বিদেশীয় যে যে দ্রব্যের চাসে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্‌সমুদায়ের চাসে উৎসাহ দান এবং যে উপায়ে চাস করিতে হইবে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এক্ষণে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইয়া আসিতেছে, তাহার উন্নতি বিধান না করিলে শস্যাদির উৎপন্নের হার বৃদ্ধি হইবে না। বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপর নির্ভর করিলে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন অনিষ্টসাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে নিরীহ কৃষকদিগকে কোন দোষ দিতে পারা যায় না; কারণ একে তাহারা নিঃস্ব মূলধন বিহীন তাহাতে আবার ঘোরতর মূর্খ। যে যে উপায় অবলম্ব করিলে কৃষির উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে অদূরদর্শী তাহার উপর সেই কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হইলে, কোন ফলই হয় না। অন্ধকে চিত্র কার্য্যে নিযুক্ত করার ন্যায় বর্ত্তমান কৃষকদিগের প্রতি কৃষিকর্ম্মের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র উৎসাহ দানে সকল স্থলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। পঙ্গু ব্যক্তিকে ভ্রমণের উপদেশ ও উৎসাহ দানে কোন ফলোদয় হয় না। যাহাকে উৎসাহ দান করা হইবে, উৎসাহ দানের অগ্রে দেখা উচিত তাহা দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না। যে যে কারণে কৃষকদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্যে প্রতিবন্ধকতা আছে, অগ্রে তদ্‌সমুদায় মোচন করা আবশ্যক। ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা বিমোচন করিয়া উৎসাহ দান করিলে সমধিক উপকার হইতে পারে।

দেশীয় কৃষকগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে। তাহারা রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতে ভূতের মত খাটিতে পারে। কালদেশ পাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল মাত্র পরিশ্রম করিলে সফল মনোরথ হইতে পারা যায় না। বিশেষতঃ সভ্যাবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম তত আবশ্যক হয় না। দেশমধ্যে বিদ্যার জ্যোতি বিকীর্ণ হইলে বিজ্ঞান ও রসায়ণ জ্ঞান দ্বারা নানাবিধ সহজ সহজ উপায় প্রকাশিত হয় তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তির পরিশ্রম জনক কার্য্য অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব যে কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষার উপর একান্ত

নির্ভর করে। পৃথিবীর চারিদিকে দেখ যে সকল দেশে শিক্ষিত-শ্রেণী যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই দিন দিন উন্নতি-পথে ধাবিত হইতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা যে কৃষিকার্য্যে শীর্ষ স্থান হইয়াছে আর পৃথিবীর মধ্যে উর্ব্বরক্ষেত্র ভারতভূমি যে দিন দিন কৃষিকার্য্যে পশ্চাৎবর্ত্তী হইতেছে ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ সকল দেশে সুশিক্ষিতজনগণ মহা আদর ও শ্রদ্ধার কার্য্য জ্ঞান করিয়া কৃষিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আর অভিমানী ভারত উক্ত পবিত্র স্বাধীন কার্য্য মানহানিজনক ভদ্রলোকের পরিত্যজ্য জ্ঞান করিয়া পালিত পশুর ন্যায় উদরান্নের জন্য বিজাতীয় দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ফলতঃ যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণের কৃষির প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা ও অযত্ন থাকিবে ততদিন কোন ক্রমে উহার আভ্যন্তরিক দোষ সংশোধিত হইবে না। মেলা কর্তৃক এই দোষ সমূহ বিমোচনের কোন উপায় অবধারিত হয় না। যে সকল ব্যক্তিদিগকে লইয়া মেলা সংস্থাপিত হইয়া থাকে, যাঁহারা কৃষকদিগকে পুরস্কার দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত কৃষিকার্য্যের কোন ধারই ধারেন না। সুতরাং কৃষি সম্বন্ধীয় দোষ সংশোধনে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী নহেন। যে সকল ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের কিছু না কিছু সংশ্রব রাখিয়া থাকেন এরূপ লোক লইয়া মেলার মেম্বর বা সভ্যগঠিত হওয়া উচিত।

দেশীয় কৃষির উন্নতি বিধান জমীদারবর্গের উপর সমধিক নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যদি স্ব স্ব জমীদারির মধ্যে নানাবিধ কৃষির উপায় বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও আয় বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখী প্রজাবর্গেরও অবস্থা ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ জমীদারগণ কৃষিকার্য্যের যে পরিমাণে অনুসন্ধান লইতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা সুকঠিন। জমীদার মহোদয়গণ যদি আপন আপন জমীদারী মধ্যে কৃষি প্রদর্শিনী মেলা স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের উৎসাহ দান করেন তাহা হইলে প্রচুর ফললাভ হয়। দেশমধ্যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা স্থাপিত হইলে কৃষকগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পারে এবং মেলার উদ্দেশ্য বুঝিয়া কৃষিকার্য্যে সমধিক যত্নবান হয়। এক্ষণে যে সকল মেলা জেলায় অথবা সবডিবিজনে হইয়া থাকে, সাধারণ কৃষকদিগের ভাগ্যে তাহা দর্শন ঘটিয়া উঠে না।

যাহাদিগের জন্য মেলা স্থাপিত তাহাদিগের দেখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেশমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা স্থাপিত হইলে সাধারণের পক্ষে দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে। দূরে স্থাপিত হইলে কার্য্যবন্ধ এবং পথের খরচ করিয়া অধিকাংশ কৃষক মেলায় যাইতে পারে না। তবে জেলায় বা অন্য কোন স্থানে বড় আকারে মেলা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলাগুলি লইয়া দুই এক বৎসর অন্তর স্থাপন করিলে চলিতে পারে। দেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলাগুলি ঐ মেলার শাখা স্বরূপ গণ্য করা উচিত।

আজ কাল মফঃস্বলে অনেক ভদ্র ভদ্র গ্রামে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়া পথ ঘাট প্রভৃতি দেশের হিতকর বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। কেবল মাত্র পথ ঘাটের সৌষ্টব সম্পাদন করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল করা হয় না। দেশীয় লোকের খাদ্যের উপায় অবধারণ করা সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য; নতুবা পেটে ভাত নাই, শত শত পরিবার অন্নের জন্য দিবানিশি হাহাকার করিতেছে, অস্বচ্ছলতা সমাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, দুর্ভিক্ষ পিশাচ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া অসংখ্য মানব জীবন নষ্ট করিতেছে, ভারতের চারিদিকে দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, সে পক্ষে আদৌ দৃষ্টি নাই, ঐ সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য কেহই এক-বিন্দুও চিন্তা করে না। কিন্তু গ্রামে গ্রামে মিউনিসিপেলিটীর মহাধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। সভ্যতা বল, উন্নতি বল, দেশের উপকার বল, পেটে ভাত না থাকিলে কিছুই হয় না। অতএব দেশের, স্বজাতির, বংশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অন্নের সংস্থান করা আবশ্যক। যে জাতি উদরান্নের জন্য মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হইতেছে, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন নিমিত্ত শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বিজাতীয় পদতলে দলিত হইতেছে, ভারবাহী পশুর ন্যায় অহোরাত্র দাসত্বের ভার বহন করিতে জীবন ক্ষয়, মান ক্ষয় করিতেছে, তাহাদিগের দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার বা উন্নতি প্রত্যাশা করা বাতুলের কার্য্য। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর অধীন এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে করা আবশ্যক। এই আদর্শ ক্ষেত্রে নানাবিধ ফুল, ফল ও শস্যাদির চাসের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে বৈজ্ঞা-নিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিলে দেশের যথার্থ হিতসাধন করা হয়।

এইরূপে জেলায় জেলায়, সবডিবিজনে সবডিবিজনে, প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে কৃষির উৎসাহ, কৃষির অনুষ্ঠান, কৃষির অনুশীলন হইলে ভারতের আবার অপূর্ব্ব শ্রী হয়, ভারতের দুঃখের অমানিশা দূরে চলিয়া যায়, ভারতের প্রত্যেক গৃহে অন্নের স্বচ্ছলতা সঞ্চারিত হয়, ভারত আবার নব জীবন পাইয়া নূতন উৎসাহে উত্থিত হয়, ভারতের লক্ষ্মী আবার ভারত ধামে শোভিতা হয়েন।

দেশীয় কৃষির উন্নতি গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাজপুরুষদিগের কটাক্ষ পাত ভিন্ন কোন মতেই উহা উন্নতি-পথে গমন করিবে না। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই সময়ে সময়ে কৃষিকার্য্য করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল মাত্র প্রস্তাবে কোন ফল দর্শে না। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে কৃষিপ্রদর্শিনী মেলা ভিন্ন রাজপুরুষদিগের আর কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এক্ষণে কৃষির যে রূপ দুরবস্থা তাহাতে মেলা স্থাপন অপেক্ষা মফস্বলে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র করিয়া সাধারণের পক্ষে শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। দেশমধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন লাভ জনক কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে কেবল যে কৃষি জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা বাণিজ্যের অঙ্গ বিস্তার হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি দেশ বিদেশে আমদানী রপ্তানীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিলে শুল্ক বাবদ গবর্ণমেণ্টেরও বিস্তর লাভ হইতে পারে। ফলতঃ দেশমধ্যে কৃষিকার্য্য বিস্তার হইলে কি প্রজা কি আপামর সাধরণ লোক সমূহ কি গবর্ণমেণ্ট সকলেরই লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপায় অবধারিত হয় নাই।

বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে পাইকপাড়া নর্শারি হইতে বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। এখান হইতে বৎসর বৎসর ফুল ফলের গাছ দেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার শাক শবজী ও তুলা তামাক প্রভৃতি বহুবিধ বীজ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এবৎসর আবার দরিদ্র কৃষক দিগকে বিনামূল্যে প্যাকিং খরচ পর্য্যন্ত দিয়া, নর্শরি হইতে কপি প্রভৃতি

সবজীর বীজ বিতরিত হইয়াছে। যে প্রণালীতে দুঃখী কৃষক-দিগকে বীজ রোপণের নিয়মাবলী উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষি প্রদর্শিনী মেলা অপেক্ষা নর্শরি দ্বারা যথেষ্ট উপকার করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই নর্শরিটীর উন্নতি বিধানে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে দেশের যে কতদূর উপকার হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রবর।

——000——

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই রবর দেখিয়াছেন এবং নিত্য ব্যবহারও করিয়া থাকেন, কিন্তু কি প্রকারে উহা উৎপন্ন হয়, কোন্ দেশের রবর উৎকৃষ্ট এবং উহার চাস প্রণালী ও লাভালাভের বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। দিন দিন রবরের যেরূপ ব্যবহার হইতেছে এবং ইংলণ্ডের বাজারে উহার দর যে নিয়মে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দর্শন করিলে অনায়াসেই জানিতে পারা যায় রবরের চাস একটী প্রধান আয়জনক ব্যবসা।

পেন্‌সিলের দাগ তোলা, জুতা, পাপোস, টুপি, কোট, রেলের গাড়ীর স্প্রিং প্রভৃতি উহা দ্বারা বহুবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। চামড়ার ন্যায় আজ কাল রবর অনেক কার্য্যে লাগিতেছে, সুতার ও পাটের কলে যে যে অংশে চামড়া ব্যবহার হইয়া থাক, তাহাতেও এক্ষণে রবর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফলতঃ রবর একটি প্রধান পণ্যের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে।

রবর এই নাম শুনিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, উহা এদেশে উৎপন্ন হয় না বিলাত হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বাস্তবিক রবর প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় এবং তথায় উহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়া অন্যান্য দেশে তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে বিলাতে নীত হইলে তদ্দেশীয় লোকেরা উহা দ্বারা সীসের পেন্‌সিলের দাগ উঠাইয়া

ছিলেন, তদবধি উহার নাম ইণ্ডিয়া রবর হইয়াছে। রবর ইংরাজী নাম। ভারতবর্ষের ন্যায় আমেরিকার নানা স্থানেও উহা প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকায় উহাকে কোচৌকা (Caoutchouc) কহে।

প্রতি বৎসর কি পরিমাণে রবর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে, পাঠক-বর্গের গোচরার্থে নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদর্শিত হইল। ১৮৭১ সালের জুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে বিলাতে ভারতবর্ষ হইতে ৩৬,৩৬৯ মণ, আমেরিকা হইতে ৬৯,৪৬৭ মণ রবর প্রেরিত হইয়াছিল, এই সকল রবরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা তাহার প্রত্যেক সের নিম্নলিখিত দরে বিক্রীত হইয়াছিল। *

লণ্ডনে এক সেরের মূল্য। *

দেশের নাম।		সর্ব্বোচ্চ। মূল্য		সর্ব্বনীচ মূল্য		সমুদায় বৎসরের গড় মূল্য
ব্রাজিল	...	৩/০	...	২৸০	...	২৸৵০
সিঙ্গাপুর	...	২।০	...	১৸৵০	...	২৲
পিনাং	...	১৸৵০	...	১৸০	..	১৸/০
বোর্ণিও	...	১৸৵০	...	১৸৵০	..	১৸০
আসাম	.	১।/০		১।৵০		১॥/৫
পশ্চিম ইণ্ডিয়া	...	২।/০	...	১৸৶১০	..	২৲
গুয়াকিন (আমেরিকা)	...	২।০	...	১॥৵০		২/০
কর্থেজিনা (আফ্রিকা)	...	২।০	...	১৸৶০	...	২/১০
মাডাগাস্কর ঐ	...	২।৵০	...	২/১০	...	২।০

এই তালিকা দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে ব্রাজিল দেশজাত রবর সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আসাম দেশজাত রবর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। গাছের দোষ অথবা রবর সংগ্রহের অনিয়ম বশতঃ যে এইরূপ উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকদিগের কৃষিবিষয়ে অনুরাগ থাকিলে এই দোষ সহজেই

---

* ১২৮৩ সালের প্রথম খণ্ড ২য় সংখ্যা "ব্যবসায়ী" দেখ।

প্রতীকার করিবার উপায় প্রকাশিত হইয়া রবরের চাসে অনেকেই ধনশালী হইতে পারিতেন। রত্নগর্ভা ভারতে কোন পদার্থেরই অভাব নাই। বন জঙ্গলেও যে জগদীশ্বর কত প্রকার লাভের পদার্থ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতবাসীবা এমনি অলস, এরূপ কাপুরুষ যে জীবনোপায়ের সহস্র সহস্র দ্বার উন্মুক্ত থাকিতেও হীন দাসত্ব বৃত্তির জন্ম একান্ত লালায়িত।

এদেশে জঙ্গল সমূহে নানা প্রকার বৃক্ষ ও লতা হইতে রবর জন্মিয়া থাকে। আসাম প্রদেশে যে সকল গাছ হইতে ববর উৎপন্ন হয় সেই সকল গাছের ইংরাজী নাম Ficuselastica জয়ন্তীপুর অঞ্চলে উহাদিগকে কাশ্মীর গাছ কহে। এদেশে জিয়লী, বাবলা, সজিনা প্রভৃতি গাছ সমুহ হইতে যেরূপ আঠা নির্গত হয়, সেইরূপ কাশ্মীর বা বট জাতীয় বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস হইতে রবব জন্মিয়া থাকে, ঐ সকল বৃক্ষের গায়ে ক্ষত করিলে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার আঠা বস নির্গত হয় এবং তাহা শুষ্ক বা গরম করিলে যে আকারে পরিণত হয় তাহাকেই রবর কহে। রবর সংগ্রহের দোষে অনেক গাছ অকালে মরিয়া থাকে। গাছ অধিক গভীর করিয়া ক্ষত করিলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অপকার নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আসাম প্রদেশের যাবতীয় রবর গাছ নিজ হস্তে রাখিয়াছেন। অন্য কেহ সে সকল গাছ লইতে পারে না। তবে ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র রববের বাগান কবিতে পারেন।

রবরেব এক একটী গাছ অন্যূন ৪০।৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর গাছ ক্ষত করিলে উহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া অচিরে মরিবার সম্ভব, এজন্য এক বৎসর অন্তর ক্ষত করা উচিত। বাগানে যে পরিমাণে গাছ থাকে প্রথম বৎসর অর্দ্ধেক এবং দ্বিতীয় বৎসর অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ক্ষত করিলে গাছের কোন অনিষ্ট হয় না, উহা স্বাভাবিক ক্রমানুসারে বাড়িতে থাকে এবং যে পরিমাণে রবর পাওয়া যায় তদ্দারা বিলক্ষণ আয়ও হইতে পারে। প্রত্যোক বৎসর গাছ ক্ষত করিলে কেবল যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট হয় এরূপ নহে, গাছ নিস্তেজ হইলে প্রচুর পরিমাণে রববও নির্গত হয় না। এক বৎসর অন্তর ক্ষত করিলে প্রত্যেক গাছ হইতে ন্যূনাধিক।৫ সের রবর

পাওয়া যায়। আমাদের দেশে লোকে আম কাঁঠালের যেরূপ বাগান করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি এক একটী রবর গাছের বাগান করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অনায়াসেই সুখে স্বাধীনতার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। রবরের গাছ করিতে অধিক ব্যয় কিম্বা অধিক পাইট্ করিতে হয় না। বীজ রোপণ করিলে সহজেই চারা হইতে পারে। তবে কথা হইতেছে যে আম কাঁঠালের বাগান করিলে যেমন ৭।৮ বৎসরের মধ্যে লাভের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় রবরের বাগান করিলে অন্ততঃ কুড়ি বৎসর লাভের অপেক্ষা করিতে হয়। গাছ একটু পুষ্ট না হইলে উহা ক্ষত করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার আবাদে অধিক সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়, তদ্বারা লাভও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। শিশু, সেগুণ প্রভৃতি গাছ যেমন অধিক দিন বিলম্বে সারবান হয়, সেইরূপ এক একটী সারবান গাছও আবার প্রচুর মূল্যে বিক্রীত হইয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। দেশীয় ধনী মহোদয়গণ পুত্র পৌত্রদিগের জন্য যেমন প্রচুর ধন অল্প সুদে কোম্পানির কাগজ করিবা রাখিয়া থাকেন, সেইরূপ যদি কিয়ৎপরিমাণ অর্থ দ্বারা এই সকল লাভজনক কৃষিকার্য্যে মন দেন, তাহা হইলে শতগুণ অধিক লাভ দেখিতে পান এবং সেই অর্থ দ্বারা দেশীয় কতশত দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইতে পারে। স্বাধীনভাবে ধন বৃদ্ধির উপায় ভারতে যেরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, অত্রত্য লোক সকল যদি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে ভারতক্ষেত্রে অন্নের জন্য এত হাহাকারধ্বনি হইত না।

রবর জাতীয় বৃক্ষ হইতেই যে কেবল রবর উৎপন্ন হয় এরূপ নহে। বট ও কাঁঠাল প্রভৃতি কএক প্রকার গাছ হইতেও উহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল রবর তত উৎকৃষ্ট নহে। কএক প্রকার লতার রস হইতেও উৎকৃষ্ট রবর উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট, খসিয়া পাহাড প্রভৃতি স্থান সমূহে লতী আম নামে এক জাতীয় লতা জন্মে, ঐ সকল লতার রসে রবর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল লতার চাস করিতে হয় না স্বভাবতঃই তত্রত্য জঙ্গলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এই সকল লতাকে ইংরাজীতে Willughbeia কহে। গাটাপুসু নামে এক প্রকার লতা বর্ণিয়ো, সিঙ্গাপুর,

সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে জন্মিয়া থাকে, উহাদিগকে ইংরাজীতে Vrcesla-elastica কহে। লিক ও আবা নামে আফ্রিকা দেশে অন্য এক প্রকার লতা উৎপন্ন হয় উহাকে ইংরাজীতে Landolphia কহে। অন্যূন তিন চারি বৎসরে ঐ সকল লতা হইতে রবর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রবরের গাছে এই সকল লতা তুলিয়া দিলে চলিতে পারে। রবর গাছ হইতে রবর সংগ্রহ করিতে যেমন অধিক সময় অপেক্ষা করিতে হয়, লতা রোপণ করিলে সে রূপ দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এই সকল লতার মধ্যে কোন কোন জাতীয় অত্যন্ত দীর্ঘাকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি গাটাপর্চ্চা নামক লতা অন্যূন দুই শত হাত লম্বা হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট বাসীরা তদ্দেশীয় লতা আমের রসে নৌকার জোড় ও ধামা প্রভৃতিতে মাখাইয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া থাকে।

এতদ্দেশের ন্যায় আমেরিকাতে প্রচুর রবরের গাছ হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় কোচে বা সেরিঙ্গা নামক বৃক্ষ বিশেষ হইতে যে রবর উৎপন্ন হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মেক্সিকো ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে কাষ্টিলোয়া ইলিষ্টিকা Costelloa নামক বট জাতীয় এক প্রকার গাছ হইতে প্রচুর রবর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। কাষ্টিলোয়া ইলিষ্টিকার এক একটী গাছ ক্ষত করিলে অর্দ্ধমণ পর্য্যন্ত রবর পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিলে তদ্দারা যে আয় হয় তাহাতে অনায়াসে সুখসচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। ভারতের জলবায়ু কৃষিকার্য্যের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, তাহাতে প্রায় সকল দেশীয় বৃক্ষ লতা এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু দেশীয় লোকের কৃষি-বিষয়ে কেমন অনুৎসাহ এই সকল প্রত্যক্ষ লাভ জনক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।

কর্পূর।

বিবিধার্থ সংগ্র হইতে এই প্রবন্ধের অনেক আবশ্যকীয় অংশ গৃহীত হইল।

কর্পূর সকলেরই পরিচিত, এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার চলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কি উপায়ে কর্পূর প্রস্তুত করিতে হয় উহার গাঁছের আকার কি প্রকার তদ্বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ।

কর্পূর অত্যন্ত উপকারী; অনেক ঔষধে উহা ব্যবহার হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ কর্পূরের গুণ জ্ঞাত হইয়া নানাবিধ ঔষধে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ধন্বন্তরীর শিষ্য সুশ্রুত কর্পূরের উপকারিতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর অতীত হইল অমরসিংহ তাঁহার অভিধানে কর্পূরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন * এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও কর্পূরের † নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভ নামক চিকিৎসা গ্রন্থে ইহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কর্পূর এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ও ভারত সাগরের কোন কোন দ্বীপে এবং যাপান ও চীনদেশে এই বৃক্ষ অনেক জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে অনেক লোকের বাগানে কর্পূর বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তেজপাত গাছের ন্যায় এই গাছ দেখিতে সুশ্রী। এক একটী গাছ ২০। ২৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে, দেখিতে হরি-

* কর্পূর, ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুকা।

† শীতাভ, ঘনসারক, শীতকব, শীত, শশাঙ্ক, শিলা, শীতাংশু, হিমবালক, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কাবমিহিকা, তাবাভ্র, চন্দ্রাভ্রক, লোক তুসার, গৌর, কুমুদ ইত্যাদি।

দ্রাক্ষ। কর্পূরের ফুল শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট এবং ইহার ফলের পরিমাণ মটরের তুল্য। এই গাছের সকল অংশেই কর্পূর বর্ত্তমান থাকে, কি পত্র, কি ত্বক, কি শাখা, কি ফল পুষ্প কোন স্থানেই কর্পূর-গন্ধের অভাব বোধ হয় না। প্রাচীন বৃক্ষের কাষ্ঠাভ্যন্তরেও অনেক কর্পূর পাওয়া যায়। কিন্তু কর্পূর উৎপাদনের পক্ষে ইহার মূলই প্রধান; তাহাতে যত অধিক পরিমাণে কর্পূর থাকে, অন্য অংশে তাদৃশ দেখা যায় না।

কর্পূর বৃক্ষে কর্পূর দুই অবস্থায় দেখা যায়; এক পরিশুদ্ধ স্থূল পিণ্ডাবয়বে, দ্বিতীয় বৃক্ষরসের সহিত মিশ্রিত তরলাকারে। পরিশুদ্ধ স্থূল কর্পূর বৃক্ষকাণ্ডে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অধিক নহে। বাণিজ্যার্থে যে সকল কর্পূর আসিয়া থাকে, তদ্‌সমুদায় প্রায়ই বৃক্ষরস হইতে নিঃসৃত।

কর্পূর প্রস্তুত করিবার নিয়ম।—কর্পূর বৃক্ষ চ্ছেদন করত তাহার কাষ্ঠ ও মূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া লৌহপাত্রে সিদ্ধ করিতে হয়। ঐ সিদ্ধকরণ সময়ে কর্পূর ধূমাকারে উত্থিত হইয়া লৌহপাত্রের উপবিস্থিত তৃণপূর্ণ এক মৃতপাত্রে জমিয়া যায। কিন্তু ঐ জমা কর্পূর পরিশুদ্ধ নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ মলা থাকে। তাহার শোধন নিমিত্ত ঐ কর্পূরের সহিত কিঞ্চিৎ চূণ মিশ্রিত করিয়া এক মৃৎপাত্রে (হাঁড়িতে) স্থাপন করিতে হয়। পরে ঐ পাত্রোপরি তৃণ পূর্ণ অপর এক পাত্র (হাঁড়ি) উল্টাইয়া রাখিয়া উভয় পাত্রের মুখ ময়দা লেপ দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। তদনন্তর কর্পূর পূর্ণপাত্রে উত্তপ্ত বালুকা কি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিলে কর্পূর পরিশুদ্ধ হইয়া উপরের পাত্রে জমিয়া যায়।

কর্পূরের সংস্কৃত নামেই তাহার বর্ণের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার গন্ধ পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহা নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ ইহাকে কঠিন তৈল বলিয়া বর্ণন করেন। কারণ আতর প্রভৃতি সুগন্ধ তৈলের ধর্ম্মের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়ই সর্ব্বদা ধূমরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে। পরন্তু ঐ বিষয়ে কর্পূর যাদৃশ প্রসিদ্ধ অন্য কিছুই তাদৃশ নহে। অনাবৃত রাখিলে অপর্য্যাপ্ত কর্পূর অতি অল্প দিনের মধ্যে ধূম হইয়া যায়। ফলতঃ উপযুক্ত কাল অনাবৃত রাখিলে যত ইচ্ছা তত কর্পূর ধূমাকারে পরিণত হইতে পারে। বাষ্পের

ন্যায় কর্পূরের ধূম শীতল দ্রব্যের স্পর্শে পুনরায় কর্পূররূপে পরিণত হয়। এই নিয়ম জ্ঞাত হইয়া অনেকে কর্পূরের বাটি ও জলপাত্র প্রস্তুত করে। ফলতঃ কর্পূর রাখিয়া তদুপরি যেরূপ ছাঁচ দেওয়া যায় সেইরূপ পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

কর্পূর জলে দ্রব হয় না, পরন্তু সুরানির্য্যাস তারপিণ তৈল এবং সুগন্ধ তৈল মাত্রে দ্রব হয়, ইহা অত্যন্ত লঘু এবং জলে ভাসিয়া থাকে এবং ঐ ভাসমান অবস্থায় জ্বলিতে পারে। বিলাতে কোন কোন রসায়ণিক পণ্ডিত তারপিণতৈলে লবণ দ্রাবকের ধূম স্পর্শ করাইয়া এক প্রকার কর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা অদ্যাপি তাহার ব্যবহার করেন নাই।

অতি সহজে কর্পূরের গাছ হইয়া থাকে। গাছের পাতায় কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যায়। গুলকলমে চারা প্রস্তুত করিলে শীঘ্র গাছ হইয়া থাকে। অনেকে পানের মধ্যে কর্পূরের পাতা খাইয়া থাকে।

দাড়িম্ব।

ডালিম অতি উৎকৃষ্ট ফল ; উহার আস্বাদন সকলেই অবগত আছেন। কি সুস্থ শরীরে কি পীড়িতাবস্থায় সকল সময়ে এই ফল খাইতে পারা যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষায় পাটনাই ডালিম অতি সুখাদ্য ; কিন্তু ডালিমের মধ্যে বেদনার ন্যায় উপাদেয় ফল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা যেমন মধুরাস্বাদবিশিষ্ট, সেইরূপ উপকারী এবং অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বৈদ্যশাস্ত্রে মধুরাম্ল রসবিশিষ্ট ডালিমের বিশেষ গুণ ব্যাখ্যা আছে ; উহা বলকারক, লঘুপাক, শুক্র বৃদ্ধিকারক এবং রুচিকর প্রভৃতি বহু গুণ বিশিষ্ট। সকল প্রকার রোগেই ডালিম সুপথ্য। ডালিমের শিকড়, ফুল এবং ফলের খোসা নানা প্রকার রোগে ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে।

ডালিম নানা জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতি অতি মধুর রসবিশিষ্ট, কোন কোন জাতি মধুরাম্ল রসযুক্ত, এবং কোন কোন জাতি কেবল অম্লাক্ত।

কাবুল, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহে যে ডালিম হয় তাহাকে বেদনা ও মস্কট কহে। মস্কট অম্লরসযুক্ত। অনেকে উহা চিনিতে না পারিয়া বেদনা ভ্রমে খরিদ করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন। বেদনার ন্যায় অবিকল গুণপ্রাপ্তি ডালিম এদেশে উৎপন্ন হয় না। সিলটের কমলালেবু ও বেদনা এই দুই জাতীয় ফল বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কেহ এদেশে তত্তুল্য আস্বাদনে ফলাইতে পারেন নাই। জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণে যে এরূপ প্রভেদ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

দেশীয় ডালিমের মধ্যে কোন কোন জাতি অতি উৎকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ডালিমের প্রধান শত্রু কীট। পোকা লাগিয়া অনেক ফল নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য গাছে ফল হইবামাত্র উহা কাপড় দিয়া বাঁধা আবশ্যক। ফল কসিয়া না বাঁধিয়া শিথিল অর্থাৎ ঢিল করিয়া বাঁধিতে হয়। কসিয়া বাঁধিলে ফল বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। গাছের যে সকল ডাল শুষ্ক বা নিস্তেজ তাহা কাটিয়া দেওয়া উচিত। অধিক রসযুক্ত মৃত্তিকায় ডালিম গাছ রোপণ করিলে ফল ভাল হয় না। এজন্য নীরস এটেল মাটিতে গাছ পুঁতিতে হয়।

দুই উপায়ে ডালিমের চারা হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীজ রোপণ দ্বারা ও কলম করিয়া বাগানের নিয়মিত স্থানে অথবা অন্য কোন পাত্রে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। পাতো দিতে হইলে গামলায় অথবা কোন স্থানে বীজ রোপণ করিতে হয়, অধিক রৌদ্র হইলে মধ্যে মধ্যে উহাতে জল দিলে ভাল হয়, এবং চারা এক কিম্বা দেড়হাত বড় হইলে উহা তুলিয়া বাগানে রোপণ করা আবশ্যক। ডালিমের শিকড় অধিক নিম্নে গমন করে না সুতরাং গর্ত্ত অধিক গভীর করিয়া রোপণ না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। গাছের গোড়ায় বৎসরান্তর এক এক বার অল্প পরিমাণে সার দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মৃত্তিকা আর্দ্র হইলে গাছের মূল দেশ খুঁড়িয়া রৌদ্র লাগান আবশ্যক। রৌদ্রে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে আর্দ্রজনিত

অপকাব নিবারিত হইতে পারে। মৃত্তিকা অত্যন্ত রসাল হইলে ডালিম ফাটিয়া পচিয়া যায়।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ডালিমের গাছ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানের ফল সমান সুখাদ্য হয় না। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের গাছে ফল ভাল হয়। যেরূপ গাছে কলম বাঁধা যায় ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় ডালিম গাছে কলম বাঁধা উচিত। বীজের চারায় ঠিক মূল গাছের অনুরূপ ফল হয় না। কিন্তু কলমেব গাছে মূল গাছের তুল্য ফল হইয়া থাকে। সুপক্ব ফলের দানা টাট্‌কা অবস্থায় চারার জন্য রোপণ করা আবশ্যক। বীজ শুষ্ক হইলে তাহাতে অঙ্কুর বাহির হয না।

ক্লোবর ঘাস।

মনুষ্যদিগের খাদ্যেব ন্যায গো অশ্বাদি পশুগণের খাদ্য ঘাসের [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে পশ্বাদির জন্য ঘাস প্র[illegible] ও সুবিধা হইত না। এক্ষণে আবশ্যকীয ঘাসের অভাবে অনে[illegible] [illegible]াঘমাসে প্রায় দিন দিন দুর্ব্বল হইযা পড়িতেছে। বিশেষতঃ গবাদি [illegible] কৃষিকার্য্যের পক্ষে যারপব নাই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এদেশে কৃষিকার্য্যের পক্ষে গো-জাতি অত্যন্ত উপকারী। অতএব সর্ব্বাগ্রে ঐ নিরীহ পশুদিগেব পুষ্টিকর খাদ্যেব ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহে অশ্বদ্বাবা হল চালিত হইয়া থাকে। এখানে তাহার পরিবর্ত্তে গোরুর দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। কৃষি ভিন্ন দুগ্ধাদি দান দ্বারা গো জাতি আমাদের প্রচুর উপকার করিয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের জীবন ধারণের প্রধান প্রধান উপায় গোরুর উপর নির্ভর হইয়া রহিয়াছে। যে প্রাণী দেহের শোণিত আমাদের শোণিত বৃদ্ধি করিতে অকাতরে ব্যয় করিতেছে, আমাদের খাদ্যের জন্য অহোরাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে, মৃত্যুর পরও চর্ম্মাদি দ্বারা সমাজের নানা প্রকার কল্যাণকর

কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, সেই পশুর দেহ রক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

এদেশে যত প্রকার গৃহপালিত পশু আছে, তন্মধ্যে গো ও অশ্ব দ্বারা সমাজের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উক্ত উপকারী পশুদিগের খাদ্যের জন্য কোন প্রকার পুষ্টিকর ঘাস উৎপাদন করার নিয়ম নাই। এদেশে স্বভাবতঃ যে সকল ঘাস জন্মিয়া থাকে, তাহাই পশুগণ আহার করে। তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার চেষ্টা দেখা যায় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্য বিবিধ প্রকার পুষ্টিকর ঘাস উৎপাদিত হইয়া থাকে। দেশমধ্যে ঐ সকল ঘাসের চাস আরম্ভ হইলে, এক পক্ষে যেমন পশুদিগের কল্যাণ সাধন করা হয়, অপর পক্ষে উহা বিক্রয় দ্বারা আয় বৃদ্ধিরও পথ পরিস্কৃত হইয়া আইসে।

বিদেশীয় যে সকল ঘাসের বীজ এদেশে আনীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গিনি, লুসারন, ক্লোভার প্রভৃতিই প্রধান। এই সকল ঘাস গো অশ্বাদি মধ্যে মধ্যে পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এজন্য এদেশে অনেক ইংরাজ ঐ ইহার চাস আর আবাদ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ঘাস রোপণ করিয়া থাকেন। বাড়ীতে পালং, পিড়িং প্রভৃতি শাক যেমন সহজে জন্মিয়া থাকে, এই সকল ঘাসও সেইরূপ নিয়মে বুনিতে হয়। আমরা পাইকপাড়া নর্শরিতে যে নিয়মে এই সকল ঘাস বুনিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠকবর্গের গোচরার্থে তাহার সবিস্তার বিবরণ ঐই প্রস্তাবে লিখিত হইল।

ক্লোবর দুই জাতীয় এক প্রকার লাল তাহাকে রেড ক্লোবর অন্য প্রকার সাদা তাহাকে হোয়াইট ক্লোবর কহে। ক্লোবর সম্পূর্ণ লাল নহে, এই ঘাস দেখিতে ঈষৎ লালের আভাযুক্ত। লাল ও সাদা উভয় ঘাসই এক নিয়মে রোপণ করিতে হয়। ক্লোলবরের বীজ দেখিতে অনেকাংশে পিড়িং শাকের বীজের ন্যায়। পাইকপাড়া নর্শরিতে এই সকল বীজ বিক্রীত হইয়া থাকে।

দোঁ-আশ মৃত্তিকায় উৎকৃষ্টরূপ ক্লোবর জন্মিযা থাকে। অন্যান্য মাটিতে

রোপণ করিলেও ঘাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রচুর ও সতেজ জন্মে না। যে স্থানের মৃত্তিকায় সর্ব্বদা রৌদ্র লাগে এরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্লোবরের চাস করিতে হয়। ছায়াযুক্ত বা স্যাঁতা স্থানে ঘাস রোপণ করিলে উহা ভাল হয় না। ঘাস বুনার পূর্ব্বে জমির পাইট করিতে হয়। দেশীয় শাক বুনিতে হইলে যেমন মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে হয়, ইহার চাসেও সেইরূপ মৃত্তিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক। মাটির সহিত গোবর কিম্বা খৈলের সার দিলে ঘাসের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। মৃত্তিকায় সার দিয়া তাহা উত্তমরূপ খনিত হইলে ক্ষেত্রে এক একটী পটি ধরাইতে হয়। প্রত্যেক পটি প্রস্থে চারি হাত বিস্তার রাখা আবশ্যক। পটির দুই পার্শ্বে এমন স্থান রাখিতে হইবে, যে তাহাতে একটী মানুষ অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পারে। পটি চারি হাত বিস্তার করিবার কারণ এই যে তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের অধিক স্থান আবাদ হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটি ধরাইলে পটির উভয় পার্শ্বের অনেকস্থান অনাবাদী থাকিয়া যায়। আর চারিহাত পরিমাণে পটি হইলে তাহার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জলসেচন করিতে কোন ব্যাঘাত জন্মে না এবং ঘাস কাটিবারও সুবিধা হইয়া থাকে। পটি কিঞ্চিৎ ঢালু করা উচিত; কারণ মঘমাসে প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঢালু পটি থাকিলে বৃষ্টির জল ঘাসের গোড়ায় সঞ্চিত হইয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ক্লোবরের পক্ষে বৃষ্টি অত্যন্ত অপকারী। এমন কি বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ক্ষেত্রস্থ সমুদায় ঘাস মরিয়া যায়। বৃষ্টির জল নির্গত করা পটির প্রধান উদ্দেশ্য। নতুবা পটি না বাঁধিয়া সমতল ক্ষেত্রেও ক্লোবর হইতে পারে।

কার্ত্তিকমাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ক্লোবর রোপণের প্রশস্ত সময়। অত্যন্ত শীতের সময় বীজ বুনিলে চারা বাহির হইতে অধিকদিন বিলম্ব হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করিলে আট দশ দিনের মধ্যে অঙ্কুর নির্গত হয়। ক্ষেত্রে বীজ ঘন করিয়া বপণ করিলে ঘাসের ঝাড় বড় হইতে পারে না। এজন্য পাতলা করিয়া বুনা উচিত। এক কাঠা জমিতে দুই ভরি বীজ বুনিলে চলিতে পারে। ক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হয় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় জলসেচন করা আবশ্যক।

বোমা অথবা কলসীর মুখে হাত দিয়া ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিলে কোন অপকার হয় না। মোটা ধারে জলসেচন করিলে বীজ ভাসিয়া একস্থানে জমা হইতে কিম্বা মাটির অধিক নীচে বসিয়া যাইতে পারে। চারা বাহির হইলে প্রতিদিন জল না দিলে ঘাসের কোন অনিষ্ট হয় না। ঘাস সকল তিন বা চারি ইঞ্চ বড় হইলে গোড়ায় দেড় ইঞ্চ রাখিয়া কাটিতে হয়। যেদিন ঘাস কাটা হইবে, সেইদিন ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জলসেচন করা উচিত। ক্লোবরের গাছ আমরুল শাকের ন্যায় অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ঘাস লতাইয়া থাকে। তবে তিন চারি বার কাটিবার পরে অর্থাৎ গাছের গোড়া শক্ত হইলে তখন শিশ বা ঘাসের ডগা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। মাসে তিনবার ঘাস কাটিয়া লইতে পারা যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতেই ক্ষেত্রস্থ ঘাসের অবস্থা মন্দ হইতে থাকে, বর্ষা উপস্থিত হইলে সমুদায় ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। প্রতি বৎসর এই ঘাসের আবাদ করিতে হয়।

ক্লোবর চাসে বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। পাইটের মধ্যে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত খুসিয়া জল দিতে হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ইহার চাস আরম্ভ হইলে গৃহপালিত গো অশ্বাদির খাদ্যের জন্য বিব্রত হইতে হয় না। প্রাণীমাত্রেরই জীবন ও সামর্থ খাদ্যের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বাপেক্ষা গো-জাতি যে দিন্ দিন দুর্ব্বল ও দুগ্ধদানে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, খাদ্যের অভাব তাহার একটী প্রধান কারণ। পূর্ব্বে যেমন তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া যথেচ্ছ আহার দ্বারা জীবন রক্ষা করিত, এক্ষণে তাহার বিস্তর প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা যতদিন না বিমোচিত হইবে ততদিন তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না।

ক্লোবরের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা শুষ্ক করিয়া রাখিলে বারমাসেই পশুদিগের ব্যবহারযোগ্য থাকে। শুষ্ক ক্লোবর আহারে পশ্বাদির কোন অনিষ্ট হয় না। যে সকল পশু একবার এই ঘাসের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহারা আর কখন তাহা ভুলিতে পারে না।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় আহারের দোষে অনেক পশু অকালে

মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এদেশে যে সকল ঘাস উৎপন্ন হয়, তদ্‌সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন জাতীয় ঘাস পশুদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর পৃথক্ পৃথক্ খাদ্য উপকারী। কোন্ প্রকার খাদ্য কোন্ পশুর উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া সর্ব্বোতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

নিম্ন প্রদেশ সমূহে এরূপও দেখা যায়, যে বৎসর অধিক পরিমাণে বন্যা হয়, বন্যার জলে সমুদায় স্থান ডুবিয়া যায়, সেই বৎসর গো-জাতির খাদ্যের অত্যন্ত অভাব হইয়া থাকে। মাঠ সকল জলপ্লাবিত থাকাতে পশুগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না। গৃহে এক প্রকার বদ্ধ থাকে, এবং গৃহস্থগণও তাহাদিগকে আবশ্যকীয় খাদ্য প্রদানে অসমর্থ হয়। এজন্য ঐ সময় বিস্তর পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনন্তর বন্যার জল শুষ্ক হইলে, সেই জল নিমগ্ন স্থানের ঘাস খাইয়া কত শত পশু যে মরিয়া থাকে তাহা বলা যায় না। এই সকল অত্যাচার হইতে নিরীহ পশুদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হইলে দেশের যারপর নাই উপকার সাধন করা হয়। আমাদের বিবেচনায় দেশমধ্যে ক্লোবর ঘাসের চাস আরম্ভ হইলে গো অশ্বাদির পক্ষে বিস্তর মঙ্গল সাধিত হয়। এই
যে নিয়মে ক্লোবর চাসের বিষয় লিখিত হইল, তাহা অতি
মাত্রেই অনায়াসেই তাহা করিতে পারেন। পশুদিগের জীব
স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের এমন সহজ উপায় থাকিতে তাহাতে উদাসীন থাব
দুঃখের বিষয়।

সিনকোনা জাতীয় গাছ। *

কুইনাইন এক প্রকার ঔষধ, ইহার নাম ও গুণ সকলই অবগত আছেন। এই ঔষধ দ্বারা জ্বর ও পুরাতন জ্বর ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ভূরি ভূরি ব্যক্তির রোগ শান্তি হইয়া মহা মহা উপকার হইয়া থাকে, এজন্য এই ঔষধ অতিশয় গুণকর ও অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। পরন্তু আরও কতকগুলি গাছ প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্‌সমুদায়ের ঐ গুণ দেখা গিয়াছে। এই সকল গাছ হইতে কুইনাইরের ন্যায় ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে।

যে সকল গাছের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, উদ্ভিদ্বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা সেই সকল গাছকে সিনকোনা নামক বৃক্ষজাতি বলিয়া থাকেন। ঐ সকল বৃক্ষ আমেরিকা মহাদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের যে যে স্থানে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সীমা, তথায় স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। যদিও উল্লিখিত বৃক্ষজাতির মধ্যে ২৫।৩০ প্রকার গাছ উদ্ভিদ্বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিদিগের জ্ঞাত আছে, তথাচ তাঁহারা আট বা দশ প্রকারের অধিক হইতে কুইমাইন প্রস্তুত করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। যে সকল হইতে কুইনাইনের নিমিত্ত ছাল লওয়া যায় সে সমস্ত গাছ ছয় সহস্র ধি দশহাজার ফিট উচ্চ স্থানে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের গড়ে ৯ অবধি ৬২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উষ্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ ভাল ভাল ছালের গাছ সকল প্রায় শীত প্রধান দেশে ও পাহাড়িয়া শুষ্ক ভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

যদিও উল্লিখিত গাছ সকল স্বভাবতঃ শীত প্রধান দেশে উৎপন্ন হয়, তত্রাচ গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে সে সকল গাছ আনিয়া রোপণ করা এখনকার লোকদিগের অত্যন্ত আবশ্যক; কারণ এদেশে জ্বর প্রভৃতি রোগ অত্যন্ত প্রবল, তাহাতে বৎসর বৎসর অসংখ্য মানবের জীবন বিনাশ হয়। উপযুক্ত ঔষধের অভাবেই ঐ ঘটনা হইয়া থাকে। কুইনাইন ও তত্তুল্য অন্য কতকগুলি গাছই জ্বরাদি রোগের উপযুক্ত ঔষধ, তাহা প্রচুর পরিমাণে

* ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ ১ম খণ্ড হইতে সংগৃহীত।

এদেশে পাওয়া গেলে ঐ অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। যদিও গবর্ণমেণ্ট কুইনাইনের জন্য অল্প ব্যয় করিতেছেন না, ইংরাজী ১৮৪৯ সাল অবধি ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এই তিন প্রদেশে ৫৪০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫৪০০০০ পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তথাচ ঐ ঔষধের অনাটন নিবারণ হয় নাই, বরং বৎসর বৎসর অপ্রতুলতা বৃদ্ধি হইতেছে। আবার শুনা যাইতেছে দক্ষিণ আমেরিকায় সিনকোনা নামে যে বৃক্ষ জাতির ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয় সেই জাতীয় বৃক্ষ ও তাহা হইতে উৎপন্ন কুইনাইন এদেশে আর অধিক আমদানী হইবে না। অতএব ঐ জাতীয় গাছ ভারতবর্ষে আনাইয়া প্রচররূপে চাস করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

এতদ্দেশে সিনকোনা নামক বৃক্ষজাতি দেশান্তর হইতে আনিয়া অধিক পরিমাণে চাস করা যেমন আবশ্যক, তত্তুল্য গুণশালী ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার হইবার যোগ্য কোন বৃক্ষ এদেশের উদ্ভিদ জাতির মধ্যে আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করাও তদ্রূপ আবশ্যক। পুরাতন গবর্ণর জেনরল লর্ড অকলণ্ড বাহাদুর এখানকার কৃষিকার্য্যের বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার আদেশে এক কমিটী নিযুক্ত হইয়া ছিল। সেই কমিটীর প্রতি এই ভার অর্পিত হয় এ[illegible] লতাদি আছে তন্মধ্যে কাহা হইলেকি ঔষধ প্রস্তুত হইতে[illegible] রীয় যে সকল বৃক্ষলতাদির ঔষধ এদেশে ব্যবহৃত হই[illegible] পরিবর্ত্তে এখানে কোন কোন বৃক্ষলতা আছে ও পাওয়া যাইতে পারে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করেন। উক্ত কমিটীর অধ্যক্ষগণ ঐ সময়ে এদেশের যে সকল গাছ দেশান্তরীয় সিনকোনার তুল্য গুণ ধারণ করে ও তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য হইতে পারে অনুসন্ধান পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ইংরাজী ১৮৩৮ সালে আপনাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখা যায় যে বঙ্গদেশীয় উইলো গাছ আফিন, গোলমরিচ, কুচিলার গাছ এবং বারবেরি প্রভৃতি গাছের ছাল হইতে কুইনাইনের তুল্য গুণকর এক প্রকার ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। বারবেরি গাছের ছাল তিক্ত ও কষা, কিন্তু তাহাতে ভাল জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপের

উত্তরভাগে ঐ বৃক্ষের ছালজাত ঔষধ ব্যবহৃত আছে। তথাকার লোকেরা উহাকে উত্তম জ্বরঘ্ন বলিয়া প্রশংসা করে। ঐ গাছের ছালই ভারতবর্ষে রেসিটা নামে বিখ্যাত ঔষধের মূল।

বারবেরি গাছের ছালের ঔষধ এক্ষণে ভারতবর্ষেও সচরাচর ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কুইনাইন সেবনে মস্তকে এক প্রকার বেদনা জন্মে, যে সকল রোগী তাহা সহ্য করিতে না পারে তাহারা প্রায়ই বারবেরির ছালের ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশে রোহণ, গোলঞ্চ এবং চিরতা প্রভৃতি আরও কএক রকম গাছড়া আছে, সে সকলের গুণ ইংরাজী ও বাঙ্গালী উভয় প্রকার চিকিৎসকেরা অবগত আছেন কিন্তু ঐ সকল ছালে যে ঔষধ প্রস্তুত হয তাহাতে কেবল লঘু কম্পজ্বর নিবারণ হইতে পারে, যে যে জ্বর গুরুতর সে সকল শান্তি করিতে তাহাদিগের শক্তি নাই।

আতিস নামক আর এক প্রকার ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার গুণ কুইনাইনের তুল্য। অনেকে জ্ঞাত হইয়াছেন যে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ঐ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐ ঔষধ আলু গাছের শিকড়ের ন্যায়; হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ বিদ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ ঔষধের নাম "একোনি টরণ হিটর ফিলয়" রাখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেনিং সাহেব, যিনি সোসাইটীতে ঐ ঔষধের বিষয় জ্ঞাত করেন, তিনি বলিয়াছেন ঐ ঔষধ কুইনাইনের ন্যায় জ্বর ইত্যাদি রোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা দুই বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকার পরীক্ষা করা গিয়াছিল তাহাতে ঐ ঔষধের কুইনাইনের তুল্য গুণ প্রকাশ হইয়াছে এবং বিবেচনা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ঐ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে! উক্ত সাহেব স্বয়ং ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী অনেক দেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশে ভূরি ভূরি রোগীর কম্পজ্বর ও অন্যান্য প্রকার জ্বর রোগ আরোগ্য করিয়াছেন।

উক্ত ঔষধ এই প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়, শিকড় গুঁড়া করিয়া দুই ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা অন্তরে বিশ অথবা ত্রিশ গ্রেণ অথবা আন্দাজি পঁয়ত্রিশ রতি করিয়া রোগীকে দিতে হইবে। যদি অবিচ্ছেদে ক্রমাগত

জ্বর থাকে তাহা হইলে ঐ গুঁড়ার প্রতি দশ গ্রেণে চারি গ্রেণ শোধিত পারা মিশ্রিত করিয়া জ্বরের ভাব পরিবর্ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দুই দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। ঐ ঔষধ কুইনাইন অপেক্ষা ভাল। কুইনাইন সেবন করিলে মাথা ব্যথা হয়, ইহাতে শিরঃপীড়ার কোন চিহ্ন বোধ না।

ডাক্তার হেনিং সাহেব বলিয়াছেন যে, চারি শত প্রকার রোগ যাহা কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, উক্ত শিকড়ের গুঁড়া দ্বারা সে সকলের প্রতীকার হইয়াছে। তিনি ঐ ঔষধের যেরূপ গুণ ব্যাখ্যা করেন অন্যান্য ডাক্তারেরা তাঁহার সহিত এক বাক্য হইয়া তাহাতে পোষকতা করিয়াছেন। একজন ডাক্তার বলিযাছেন "আমি ঐ শিকড়ের গুঁড়া দিয়া এক শত আট জন জ্বর রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে পঁচিশ জন সম্পূর্ণ আবোগ্য হইয়াছে, তেতাল্লিশ জনের কোন উপকাব দর্শে নাই" কিন্তু তিনি উহার কাবণ আপনিই ব্যক্ত করিযাছেন, অর্থাৎ ঐ তেতাল্লিশ ব্যক্তির জ্বর গুরুতর হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি কোন ঔষধই কার্য্যকব হইতে পারিত না। অতএব যদিও তত সংখ্যক লোকের কোন উপকার হয় নাই, তথাচ ঐ ঔষধের প্রতি দোষার্পণ কবা যাইতে পারে না। উক্ত সাহেব আপনার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে উল্লিখিত শিকড়ের গুঁড়ার ঔষধ কুইনাইন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় জ্বরঘ্ন, যে সব [illegible] নের দ্বারা আরোগ্য না হয ঐ ঔষধে সে সকলও আরোগ্য [illegible] অতএব এ প্রকার গুণকর মহৌষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া [illegible] করা সকল লোকেব আবশ্যক।

"না ক্লিয়া ওবেনিফোলিয়া" নামক আর এক প্রকার উদ্ভিজ্জের বৃত্তান্তও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ঐ গাছ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। উহা কাচার দেশে পাওয়া যায়। লেপ্টনেণ্ট ইষ্টুয়ার্ট সাহেব কহেন ঐ বৃক্ষের ছালে জ্বর রোগ ও উদরাময় আরাম হইয়া থাকে। এই সকল রোগের চিকিৎসার্থ ঐ দেশের লোকেরা সচরাচব উহার ছাল ব্যবহার করে। ঐ দ্রব্য কুইনাইনের ন্যায় তিক্ত, কিন্তু উহা যে ঐরূপ জ্বরঘ্ন ঔষধ, কোন পুস্তকে এবিষয়ে কিছুই লেখা নাই। যাহা হউক যে জাতীয় গাছ হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, ঐ গাছকে সেই জাতির মধ্যে গণ্য করা উচিত।

এতদ্দেশে যে সকল উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কত বৃক্ষ লতা হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; জগদীশ্বর অকারণে একটি তৃণও সৃজন করেন নাই। মানব মন যত অনুসন্ধান করিবে ততই নূতন নূতন উদ্ভিদের আশ্চর্য্য গুণ অবগত হইয়া বিমোহিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে উদ্ভিদ্বিদ্যায় দেশীয় জনগণের আস্থা না থাকায় কতশত মহোপকারী ঔষধ আমাদের চক্ষের সম্মুখে লুকায়িত রহিয়াছে। দেশীয় কৃষি-বিদ্যার অনুশীলন বিস্তার না হইলে ঐ সকল উপকারী বৃক্ষাদির প্রতি কাহার যত্ন হইবে না।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে এদেশে সিনকোনা বৃক্ষের চাস আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এগ্রিকলচার সোসাইটি কয়েকটী সিনকোনার চারা আনাইয়া এদেশে রোপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ চারা অল্পপরিমাণে আনীত হওয়ায় তাহা মরিয়া যায়। কএক বৎসর হইল হিমালয় প্রদেশে সিনকোনার চাস হইয়া এক প্রকার কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই কুইনাইন দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। যে নিয়মে সিনকোনা বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে হয় তাহা অবসর ক্রমে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

ইক্ষু।

——000——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্গে সঙ্গে রোপণ করিলেই চলিতে পারে। ডালগুলিকে রোপণ করিবার ১০। ১২ দিন পূর্ব্বে স্থাপোর হইতে উত্তোলন করিয়া, ডালগুলির উপরকার ছাল খুলিয়া ফেলিয়া, কোন সমতল স্থান কিঞ্চিৎ খনন করিয়া, সেই খনিত স্থানে বালি, গোবর, ও জল দিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিতে হয়। সেই কর্দ্দমিত স্থানে ইক্ষুর ডালগুলিকে পুনরায় লম্ব ভাবে রাখিয়া, বিচালী কি অন্য দ্রব্যের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয়। একদিন অন্তর জলসিঞ্চন করিলে ৭। ৮ দিন মধ্যে ইক্ষুর গাঁইট অর্থাৎ চোক

হইতে চারা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকেই আমাদের এখানে "বালি হাপর" কহে। ৮। ১০ দিন পরেই বালি হাপর হইতে ইক্ষুর ডাল উত্তোলন করিয়া, পূর্ব্ব লিখিত মতে রোপণ করিতে হইবে। বালি হাপরে যদি সমস্ত ডাল হইতে চারা বাহির না হয়, তাহা হইলে রোপণ করিবার ৫। ৭ দিন পরে চারা বাহির হইয়া থাকে। সামসাড়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার ইক্ষু কাটিয়া লইলে, তাহার গোড়া হইতে ২। ৩ বৎসর উপর্য্যুপরি চারা বাহির হইয়া থাকে। যে জমি হইতে ইক্ষু কাটিয়া লওয়া হয়, তাহাতে আর ডগা রোপণ করিবার আবশ্যক হয় না, গোড়া হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে। ইক্ষু কাটার পর জমিতে পঙ্ক, সার, খৈল ইত্যাদি দিয়া পাইট ও জলসিঞ্চন করিতে হয়।

ভালরূপ ইক্ষু জন্মিলে, কাঠায় ৪/০ মনের হিসাবে বিঘায় ৮০/ মণ গুড় হইতে পারে। অভাব পক্ষে গুড়ের মণ ৩৲ টাকা হিসাবে ধরিলেও বিঘায় ২৪০৲ টাকার গুড ও ডগা বিক্রয় ৪০৲ টাকার হইতে পারে। প্রত্যেক বিঘায় প্রায় ৩০০৲ টাকা আয় হইতে পারে, তাহা হইতে আবাদ খরচ ১০০৲ বাদ দিলেও কিঞ্চিদুন ২০০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। পাঠকগণের বিদিতার্থ আবাদ খরচের জায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১০০৲ টাকাব যায়।

লাঙ্গল	......	
সাব ইত্যাদি	......	
খৈল	......	২০৲
জলসিঞ্চন	......	২০৲
খনন ও নিড়ান	......	১২৲
ডগা	......	১০৲
ইক্ষুব রস বাহিব করণ	......	১৫৲
গুড প্রস্তুতকরণ	......	৫৲
অন্যান্য	......	১১৲
		১০০৲

আমরা পাঠকগণকে যে আবাদ খরচ দেখাইলাম, তাহা অপেক্ষা বরং অনেক কম খরচে এক বিঘা জমির ইক্ষু চাস সুচারুরূপে হইতে পারে। আমরা সমস্ত খরচই অধিক করিয়া ধরিয়াছি। খরচ বাদে যে ২০০, টাকা লাভ হয়, এরূপ ফসল আমাদের এখানে কিছুই নাই। অন্যান্য ফসলের অধিক চাস না করিয়া, যদি কিছু অধিক জমিতে ইক্ষু চাস করা হয়, তাহা হইলে অনেক লাভ হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে সঙ্গতি সত্ত্বেও অধিক পরিমাণে ইক্ষু চাস করেন না। এখানে কাঠা দরে ইক্ষুর চাস করিয়া থাকে, প্রায় কেহই ১০।১৫ কাঠার অধিক জমিতে ইক্ষু চাস করে না। বরং তাহা অপেক্ষা অনেক কম জমিতে ইক্ষুর চাস করা হইয়া থাকে। যদি অধিক জমিতে ইক্ষুর চাস করা হয়, তবে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

লঙ্কা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এ অঞ্চলে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিতে কোন উপায় অবলম্বিত হয় না, মৃত্তিকা দয়া করিয়া যাহা প্রদান করে তাহাতেই সন্তুষ্ট। অনেকে আবার সাধ্যাতীত জমিতে চাস করিয়া এত বিব্রত হইয়া উঠে যে কোন আবাদেই সম্যক পাইট করিতে সমর্থ হয় না। অধিক জমিতে চাস করিলেই যে অধিক ফললাভ হয় এরূপ নহে, সুচারুরূপে চাস করিলে অল্প ভূমির চাসেই যথেষ্ট শস্য লাভ করিতে পারা যায়। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয় তদ্‌পক্ষে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া চাস আরম্ভ করা আবশ্যক। জমি উঠিত পতিত রাখিয়া চাস করিলে ফসল অধিক হয় এবং গবাদি পশুর কষ্ট দূর হইয়া থাকে। ভূমির

তেজ অব্যাহত থাকিলে সুন্দররূপ শস্য জন্মে এবং ডেনা ভাঙ্গা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে না। যেরূপ শরীর দুর্ব্বল হইলে নানাবিধ রোগ আসিয়া আক্রমণ করে, তদ্রূপ ভূমি নিস্তেজ হইলে ডেনাভাঙ্গা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া শস্যের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ফলতঃ ভূমির দুর্ব্বলতাই যে এই রোগের কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্বেত শর্ষপ ও নাল্‌কো এই দুই দ্রব্য গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উক্ত রোগ নিবারিত হইতে পারে। এদেশে জয়লা নামে এক প্রকার লঙ্কা উৎপন্ন হয় উহার আকার কিছু ছোট ও ঝাল অল্প; একটী গাছে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ফল প্রসব করে। এই জাতীয় লঙ্কার ডেনাভাঙ্গা রোগ হয় না।

গোলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সম্‌ব্রিয়েল——সাদাবর্ণের গোলাপের মধ্যে [illegible] উত্তমরূপ পাইট্ এবং নিয়মিত সার দিয়া গাছ করিতে পারিলে এক একটী পুষ্প অতি বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। সম্‌ব্রিয়েলের দল সকল সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট, এক একটী পুষ্পে অধিক পরিমাণে দল সজ্জিত থাকে। এই ঘন শুভ্রবর্ণের দল সমূহ বিকসিত হইলে উদ্যানের অত্যন্ত শোভা হয়। এই জাতীয় গোলাপ দেখিতে যে পরিমাণে সুন্দর কিন্তু তাদৃশ গন্ধ নাই। বিলাতী যে সকল গোলাপ এদেশে আনীত হইয়াছে, এবং চোক ও জোড় কলম দ্বারা যে সকল উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপ প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ সকল গাছের মধ্যে অধিকাংশ গোলাপ দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহাদিগের গন্ধ তত উৎকৃষ্ট নহে। ঐ সকল গোলাপের মধ্যে কোন কোন জাতীয় গোলাপে আদৌ গন্ধ নাই, কোন কোন জাতীয় গোলাপে অল্পপরিমাণে

গন্ধ আছে। ফলতঃ এই সকল গোলাপ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু গন্ধ তত মনোরম্য নহে।

চোক ও জোড়কলম দুই উপায়েই সমৃব্রিয়েলের গাছ হইতে পারে। ইহার গাছ টবে অথবা ভুমিতে উভয় স্থানেই রোপিত হইতে পারে। অন্যান্য গোলাপের যে নিয়মে কলম বাঁধিতে হয়, সমৃব্রিয়েল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। সাধারণতঃ গোলাপ গাছ কিছু বড় টবে রোপণ করা উচিত। বোধহয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন গোলাপ গাছের প্রথমাবস্থায় যেরূপ বৃহৎ ও প্রচুর ফুল হইয়া থাকে, গাছের বয়স বৃদ্ধি হইলে এবং সার দিতে অযত্ন এবং পাইট্ করিতে অমনোযোগ করিলে ফুলের আকার ছোট হয়। গাছ অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহা তুলিয়া সেইস্থানে নূতন চারা রোপণ করা ভাল। গোবরের সার গোলাপের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর ইহা পুনঃ পুনঃ কৃষিতন্ত্রে উল্লিখিত হওয়ায় অনেকের মনে এরূপ ভ্রম জন্মিয়া গিয়াছে যে গোবর সার ভিন্ন আর কোন সার উপকারী নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মনুষ্য-দিগের পক্ষে মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য বলিলে কখনই এরূপ বুঝায় না যে মাংস ভিন্ন আর কিছু পুষ্টিকর পদার্থ নাই। সেইরূপ গোবর সার ভিন্ন গোলাপ গাছের পক্ষে আর কোন প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য নাই এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। খৈল সার, বিষ্ঠাসার এবং মৎস্য সার দ্বারাও যথেষ্ট উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। সকল মৎস্যসার সকল উদ্ভিদের পক্ষে সমান পুষ্টিকর নহে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, পুঁটি মাছ দ্বারা গোলাপের বিস্তর উপকার হইয়াছে। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথ-মতঃ পুঁটিমাচ মাটিতে পুঁতিয়া অথবা মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল মৎস্য সকল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকিলে তাহা রূপান্তরিত হইয়া মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। এই সার গোলাপ গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি, পুষ্পের আকার বৃহৎ এবং এক একটী গাছে প্রচুর ফুল ফুটিয়া উদ্যান আলো করিয়া থাকে। অন্যান্য গোলাপ গাছের যেরূপ পাইট্ করিতে হয় সমৃব্রিয়েলের পক্ষেও সেই নিয়ম।

নর্সিংরোজ——ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে রাজা নর্সিং গোলাপ বলিয়া থাকে। এদেশে রাজা নৃসিংহ এই গোলাপ প্রথমে তাঁহার বাগানে আন-

ন করেন। এজন্য তাঁহার নামানুসারে অনেকেই উহাকে রাজা ও কহিয়া থাকে। ইংরাজীতে এই গোলাপ সল্‌ফেটিয়া নামে অভি রাজা নর্সিং বা সল্‌ফেটয়া গোলাপ সাদা বর্ণের। ফুল দেখিতে অ সুশ্রী ; সম্‌ব্রিয়েলের ন্যায় ইহারও বর্ণ উজ্জ্বল সাদা। দল নিতান্ত বিরল ফুলের আয়াতন মধ্যম আকারের। পুষ্পের যেরূপ সৌন্দর্য্য গন্ধ তত না ইহার দল গুলঞ্চ ফুলের দলের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, আ গুলঞ্চফুলের দল যেমন সাদা এবং দলের গোড়া হইতে ঈষৎ হরিদ্রাভা বি হয়, ইহারও দল সমূহ হইতে সেইরূপ হরিদ্রবর্ণের আভা বাহির হইয়া থা সর্ব্বনিম্নস্থ দল সমূহ যেরূপ আয়তনে বৃহৎ তাহার উপরিকার দল সে বড় নহে উপরিস্থিত দল সকল ক্রমেই ছোট আকারের হইয়া থাকে।

নর্সিং গোলাপের গাছ বড হইয়া থাকে। মার্সেল নীলের ন্যায় গাছের জাফরী করিয়া দিতে হয়, কারণ ইহার ডাল অত্যন্ত লম্বা হই থাকে। জাফরীতে শাখা তুলিয়া দিলে গাছের অবস্থা ভাল থাকে এবং জাফরীর গায়ে শাখা প্রশাখা জড়িত হইয়া তদ্‌সমুদায় হইতে ফল ফুটি দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী হয়। টবে রোপণের পক্ষে রাজা নর্সিং তত সুবি জনক নহে, এজন্য ভূমিতেই রোপিত হইয় — ... র

নিস্তেজ ডাল সমুদায় কাটিয়া দিতে হয়।

সম্বন্ধে যে নিয়ম রাজা নর্সিং সম্বন্ধে

জোড় দুই প্রকার কলমেই চারা তৈয়ার করিতে হয়। ...

ফুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে যে সুন্দররূপ পাইট করিতে হয় তাহা বলা বাহুল্য। অন্যান্য ফুল অপেক্ষা গোলাপের বিশেষ গুণ এই যে উহা প্রায় বৎসরের সকল সময় প্রস্ফুটিত হয়।

(ক্রমশঃ)